ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা

ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ

ইফতেখার সিফাত
অনূদিত

সূচিপত্র

পেশ আরজ ⁞ ১১
ভূমিকা ⁞ ১৩

প্রথম খণ্ড : ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার-২১

প্রথম অধ্যায় : ইহুদি ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার ⁞ ২৩

বনি ইসরাইলের (ইহুদিদের) পুরাতন ইতিহাস ⁞ ২৬
  বনি ইসরাইল কেন গোমরাহ হয়েছিল? ⁞ ৩৯
ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসসমূহ ⁞ ৪৪
  দানিয়েল ﷺ-এর দুআ ও মহান লক্ষ্য ⁞ ৪৯
  ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদের শুরু ⁞ ৫০
ইহুদিদের নতুন ইতিহাস ⁞ ৫১
  ফরাসি বিপ্লব থেকে আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ⁞ ৫৭
ইহুদিদের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা ⁞ ৬৪
  ইহুদিদের বৃহৎ লক্ষ্য ও তা বাস্তবায়নে বাধাসমূহ ⁞ ৬৪
  মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহুদিদের কার্যপদ্ধতি ⁞ ৬৭
  ইহুদিদের গোপন এজেন্ডা ⁞ ৭০
  ইহুদিদের প্রকাশ্য চক্রান্ত ⁞ ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার ও পশ্চিমাদের ইতিহাস ⁞ ৭৫

খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস ⁞ ৭৮
খ্রিষ্টবাদের বিশ্বাস ⁞ ৮৬
ইউরোপের ইতিহাস ⁞ ৮৮
  ইউরোপের অন্ধকার যুগ (৫৯০-৮০০ খ্রি.)⁞ ৮৯
  মধ্যযুগ (৮০০-১৪৫৩ খ্রি.) ⁞ ৯১
  ইউরোপের রেনেসাঁ (১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রি.) ⁞ ১১০
পশ্চিমাদের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা ⁞ ১৪১

দ্বিতীয় খণ্ড : নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার–১৪৭

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম যুগ ¦ ১৫২

ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (১৭৮৯-১৯২৪ খ্রি.)

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দ্বিতীয় যুগ ¦ ২৪৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত (১৯১৯-১৯৪৫ খ্রি.)

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের তৃতীয় যুগ ¦ ২৫১

রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ (১৯৪৫-১৯৯১ খ্রি.)

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চতুর্থ যুগ ¦ ২৮৪

বৈশ্বিক যুদ্ধ ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (১৯৯১-২০১১ খ্রি.)

পরিশিষ্ট : নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : সমাধান কী?–২৯৩

পেশ আরজ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর।

পশ্চিমারা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন থেকে সরিয়ে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্য যে সমস্ত মাধ্যম ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে একটি মৌলিক মাধ্যম ছিল উম্মাহকে তার আলোকোজ্জ্বল ও সোনালি অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামি ইতিহাসের একটি বিকৃত ছবি তাদের সামনে পেশ করা; যাতে মুসলিমরা নিজেদের ইতিহাসকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ফলে তারা নিজেদের পূর্বসূরিদের আলোচনা করতে লজ্জা পাবে এবং এমন নৌকার মতো হয়ে যাবে, যার কোনো নোঙর থাকবে না; ফলে পশ্চিমারা তাদেরকে যেদিকে হাঁকিয়ে নেবে, তারাও কোনো বাধা ছাড়া সেদিকেই চলতে শুরু করবে।

এ ছাড়াও পশ্চিমারা আরেকটি বিষয়ে পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছে। তা হলো, তথ্যগত ছলচাতুরি ও বিচ্যুতি ঘটিয়ে নিজেদের আসল ইতিহাসের ওপর পর্দা ফেলে দেওয়া। যাতে তাদের ইতিহাসের ভয়ানক বাস্তবতাগুলো দুনিয়ার সামনে গোপন থাকে। তারা তাদের মূর্খতা, জুলুম, বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনি গোপন করে নিজেদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য, বিজ্ঞানমনস্ক ও উন্নত জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে এবং মানবসভ্যতার ওপর নিজের সফলতার মিথ্যা ঢোল বাজায়।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম-বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কব্জা করে নেওয়ার পর আমাদের শিক্ষা-সিলেবাসে (স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত) ইতিহাসের এই বিকৃত পাঠই পড়ানো হয়েছে এবং এখনো তা পড়ানো হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ মুসলিমদের ঘরে আজ এমন নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের পূর্বসূরি, নিজেদের অতীত এমনকি নিজেদের দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারেও অজ্ঞ রয়ে গেছে। আর নিজেদের ব্যাপারে যদি কিছু জানা থাকে, তাহলে সেগুলোও সেই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে, যা তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে এই নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমাদের ইতিহাস, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে এমন সব চমৎকার অবাস্তব বুলি মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়; যাতে সে পশ্চিমা থেকে আসা সকল সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে, ভুল থেকে মুক্ত ও শুরু-শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুকরণীয় মনে করতে থাকে। ফলে সমাজের অবস্থা এমন হয়ে গেছে, যেখানে আল্লাহ তাআলার অকাট্য বিধান পরিবর্তনকারীকে কোনো দোষারোপ করা হয় না। অথচ যখনই গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন, জাতিসংঘের সংবিধান বা মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর কোনো প্রশ্ন ওঠানো হয়, তখন সবাই তার বিরোধিতা করতে থাকে এবং তার 'অজ্ঞতা'র ওপর আফসোস করতে শুরু করে।

তাই আজ আবার এই বিকৃত ইতিহাসের জায়গায় উম্মাহর সামনে তাদের ও পশ্চিমাদের আসল ইতিহাস গোছানো ও সহজভাবে পেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যাতে ইতিহাস সঠিকভাবে বোঝার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে যায়, ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায় এবং বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই বইটি সেই ধারাবাহিকতারই একটা প্রচেষ্টামাত্র। আল্লাহ তাআলা আমাদের মুহতারাম ভাই হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, কারণ তিনি এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। ইতিহাসের বিস্তৃত এবং গভীর জ্ঞান থাকার কারণে এই বিষয়ে কলম ধরার জন্য তিনিই উপযুক্ত ছিলেন। এই কিতাবে তিনি অনেক সহজভাবে মুসলিমদের এবং তাদের মূল শত্রুদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, অনেক লম্বা আলোচনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত, তবে সামগ্রিক ধাঁচে তুলে ধরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম লেখক কোনো প্রকার বাকপটুতা ও কপটতা এবং ইতিহাসের বাস্তবতাগুলোকে হ্রাস বা বৃদ্ধি ব্যতীত যেটা যেভাবে আছে, সেভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। এই স্পষ্টতা ও সহজতা উনার লেখার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে।

কিতাবটি তার স্বাভাবিক গতিতে পাঠককে নিজের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং অনেক সহজভাবে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তার মস্তিষ্কে বসিয়ে দেবে। কিতাব পাঠ শেষ হওয়ার পর পাঠক নিজ থেকেই এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে যাবে : বর্তমান সময়ে মুসলিমদের কোন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত? তাদের দাওয়াতের মূল ভিত্তি কী হওয়া জরুরি? তাদের মূল শত্রু কারা? কী তাদের এজেন্ডা ও কর্মপদ্ধতি?

লেখক ইতিহাস লেখার মধ্য দিয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং সেক্যুলারদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারাগুলো অনেক সহজভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সাথে সহজ ভাষায় এগুলোর জবাবও লিখেছেন। নিশ্চিতভাবে পশ্চিমাদের ইতিহাস জানা ছাড়াও পশ্চিমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বোঝার জন্য এই কিতাবটি অধ্যয়ন অনেক উপকারী হবে। যদি বলা হয়, পশ্চিমাদের নতুন চিন্তাগত ভ্রষ্টতা মোকাবিলার জন্য মুসলিম-বিশ্বে যে প্রচেষ্টা কাম্য ছিল, তা পূরণে এই কিতাব অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, আশা করি, এই কথাটি ভুল হবে না।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যাতে লেখকের ইলম, বয়স ও বুঝের মধ্যে আরও বারাকাহ দেন এবং তার এই কিতাবকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী করেন, হিদায়াতের পথে টিকে থাকার মাধ্যম বানিয়ে দেন এবং এই কিতাবকে লেখকের মাগফিরাতের অসিলা বানিয়ে দেন, আমিন।

ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দুটি বড় অংশে ভাগ করা যায়, প্রথম প্রকার হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ওপর (কোনো না কোনোভাবে) বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর কাছে প্রতিদানের আশা রাখে। এই ধরনের মানুষদের তিনটি বড় শাখা রয়েছে : মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান। এ ছাড়া সেই সমস্ত মুশরিকও এই প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখে; কিন্তু নিজেদের দেবদেবীকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর কাছে প্রতিদানের কোনো আশাও করে না। এই প্রকারে সেই সমস্ত মূর্তিপূজারি অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেদের বানানো মূর্তিগুলোকে খালিক, মালিক ও রিজিকদাতা মনে করে এবং তাদের থেকেই প্রতিদানের আশা করে। এই প্রকারের মধ্যে অপর আরেকটি দল হচ্ছে, সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা দাবি করে, তারা শুধু মানবতার জন্যই কাজ করে। এই স্লোগানের অধীনে তারা মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। তবে তারা এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বা অতি প্রাকৃতিক কোনো সত্তা থেকে প্রতিদানের আশা করে না। পুরো মানব ইতিহাস এই শ্রেণির মানুষদের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বেরই নাম। মুসলিম উম্মাহর জন্য আবশ্যক হচ্ছে, এই বাতিল মতবাদগুলোর মোকাবিলা করা ও দুনিয়াতে সত্য দ্বীন মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা এবং আসমানি হিদায়াত প্রচার-প্রসার করা।

আজ আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি এবং যে বিশ্বে বসবাস করছি, তা গঠনের পেছনে মানব ইতিহাসের চারটি ঘটনা মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।[১] সেগুলো হলো :

- প্রথম ঘটনা, খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ সালে গ্রিক দর্শনের উৎপত্তি।
- দ্বিতীয় ঘটনা, খ্রিষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইসা ﷺ-কে হত্যার চেষ্টা এবং তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া।

---

১. বর্তমানে পুরো দুনিয়ার মধ্যে যে বিশেষ আদর্শিক, ভৌগলিক ও সামাজিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হুকুমতব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে—লেখক এই গঠনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে যেন এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, তিনি হয়তো মানব ইতিহাসের সর্বদিক বিবেচনায় এই চারটি ঘটনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। ইতিহাসে শুধু একটি ঘটনা এমন রয়েছে, যা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতিসহ দুনিয়ার সব শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং শুধু প্রভাব ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সেগুলোকে আসমানি হিদায়াত অনুযায়ী পরিশুদ্ধ করেছে। আর সেই মহান ঘটনা হলো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত।

- তৃতীয় ঘটনা, উসমান ﷺ-এর শাহাদাত, যা উম্মতের মধ্যে ফিতনা প্রবেশের দরজা হিসেবে গণ্য হয়।[২]
- চতুর্থ ঘটনা, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব। যার পর থেকে পুরো ইউরোপ গির্জার প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর শাসন ও মানুষের শাসনের ব্যবস্থাকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করে তার স্থানে ধর্মহীনতার বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

প্রথম ঘটনা : খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ সালে গ্রিক দর্শনের উৎপত্তি

ইসা ﷺ-এর জন্মের তিনশ সাল পূর্বে ইউরোপের ইউনান বা গ্রিক অঞ্চলে এমন একটি মতাদর্শ প্রচারিত হয়, যা ইলমে ওহি ও মানুষের বুদ্ধির মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলার ভাবনা ও ইলমে ওহির দিক-নির্দেশনা ব্যতীত শুধু মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্ম দেয়, যাদের মধ্যে এরিস্টটল ও প্লেটো অনেক প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। সেখানে এমন সব আলোচনা ও কার্যক্রম শুরু হয়, যেখানে মানুষ ইলমে ওহি থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান শুধুই বুদ্ধি দ্বারা করা শুরু করে। এই দার্শনিকদের বিশ্বাসগুলো ছিল আসমানি কিতাবগুলোর আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক, বিশেষ করে তাকদিরের আকিদার বিপরীত।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কেউ অসুস্থতার কারণে মারা গেলে ধর্মের দেওয়া বক্তব্য 'সব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হয়েছে' তা ভুল। কারণ, তার কাছে যদি টাকা থাকত এবং সে চিকিৎসা করাতো, তাহলে সে বেঁচে যেত। তারা বলে, ধর্ম মানুষকে আফিমের মতো নেশাগ্রস্ত করে রাখে। মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু ধর্মের শিকল মানুষকে এই কাজের অনুমতি দেয় না; তাই মানুষকে ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে।

---

২. এখানে একটি মৌলিক বিষয় জেনে রাখা উচিত, উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের পর সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, অধিকাংশ সালাফ আলিমগণ এগুলোকে আল্লাহ তাআলার প্রতি সোপর্দ করে দিয়েছেন। কারণ তাঁরা সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখতেন যে, কোনো সন্দেহ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন, যার ফলে তাঁরা উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন। আমরা সাহাবিদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখি এবং তাঁদেরকে এই সবের কারণে দোষারোপ করি না; বরং আল্লাহ তাআলার কাছে পুরস্কারপ্রাপ্ত মনে করি। এখানে লেখক উসমান ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করে সেই ফিতনাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, যা এই ঘটনার পর জন্ম নিয়েছে এবং সেগুলো আকিদা ও রাজনীতির অধ্যায়ে কী প্রভাব ফেলেছে। এখানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। তাই এই ক্ষেত্রে পাঠকদের নিকট অনুরোধ, তারাও যেন সাহাবিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অধ্যায়ে কোনো প্রাচ্যবিদ বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত কোনো ব্যক্তির আলোচনা ও তাদের বর্ণিত ইতিহাসের দিকে কোনোভাবেই দৃষ্টি না দেন, কেননা এগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং বিশেষ করে যখন এই অধ্যায়ের ভিত্তি শিয়া রাফিজিদের মনগড়া কাহিনি।

মোটকথা, এই সমস্ত দার্শনিক প্রকাশ্যে আসমানি ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে। যার ফলে মানুষ নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধানে আল্লাহ-প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীতে নতুন শিক্ষা ও দর্শন গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে বিষ ঢালা শুরু করে এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করার দিকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মনগড়া পথে পরিচালিত করতে থাকে। আর এখান থেকেই মানুষের সব সমস্যা শুধু বুদ্ধি দ্বারা সমাধানের এক নতুন চিন্তাধারা ও দর্শনের জন্ম নেয়।

শুরুতে এই দার্শনিকদের গোমরাহ মতাদর্শ কোনো সমাজেই স্থান পায়নি; চাই তা ইহুদি সমাজ হোক বা হিন্দু সমাজ। বরং তাদেরকে ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে খুব কঠোরতার সাথে দমিয়ে রাখা হয়। খলিফা মামুনুর রশিদের দারুল হুকুমত যখন গ্রিক দর্শনের বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করানো শুরু করে, তখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই সমস্ত দর্শনের প্রচার শুরু হয়। এই অনুবাদগুলোর মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মুতাজিলা ফিতনার উৎপত্তি হয়। শুধু মানুষের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আকায়িদ ও ইলমে কালামের নতুন নতুন আলোচনা সামনে আসতে শুরু করে। যা উম্মতের মধ্যে নতুন সব ফিতনার দরজা খুলে দিতে থাকে। হকপন্থী আলিমগণ এই সমস্ত ফিতনা খুব ভালোভাবে মোকাবিলা করেন এবং দলিলের মাধ্যমে এগুলো বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। কিন্তু অপরদিকে কয়েক যুগ পর পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের মাঝে এই সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফরাসি বিপ্লব ছিল এই সমস্ত চিন্তারই ফসল। আজ এই ধর্মহীনতার দর্শনই পুরো দুনিয়াতে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া

গ্রিক দার্শনিকদের সম্পর্ক সেই সব দলের মানুষের সাথে ছিল, যারা আল্লাহ তাআলা থেকে কোনো প্রতিদানের আশা করত না। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলা থেকে প্রতিদানের আশা রেখে আমল করত, তাদের চিন্তা-চেতনা নষ্ট হওয়া শুরু হয় বনি ইসরাইলের মাধ্যমে। যারা ইসা ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করে; যার ফলে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে হত্যার ব্যাপারে ইহুদিদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেন। ইয়াকুব ﷺ থেকে ইসা ﷺ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সত্য দ্বীনের প্রচারের জন্য বনি ইসরাইলকে নির্বাচন করেছিলেন। তাদেরকে হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসার জন্য ধারাবাহিকভাবে নবিগণকে প্রেরণ করেছেন। ইসা ﷺ ছিলেন এই ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ ইসরাইলি নবি।

বনি ইসরাইলের অধিকাংশই কঠিন গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রথমে ইয়াহইয়া ﷺ-কে শহিদ করে, তারপর তাঁর পিতা জাকারিয়া ﷺ-কে শহিদ করে। তাদের সর্বশেষ লক্ষ্য ছিল ইসা ﷺ-কে শহিদ করা। ইসা ﷺ-কে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য বনি

ইসরাইলের উলামায়ে সু'রা রোমান বাদশাহর কাছে তাঁকে শূলিতে চড়ানোর দাবি পেশ করে। রোমানরা যখন ইসা ﷺ-কে শূলিতে চড়ানোর ফয়সালা করে, তখন আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন। কিন্তু ইহুদিরা ভাবতে থাকে ইসা ﷺ-কে হত্যা করে ফেলা হয়েছে, কারণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানরাও সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয়।[৩]

এই ঘটনার ফলে বনি ইসরাইল—যারা এতদিন পর্যন্ত সত্য দ্বীনের ধারক ও প্রচারক হিসেবে আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত জাতি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের উত্তরাধিকারী ছিল—তারা কাফির এবং আল্লাহ তাআলার ক্রোধপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়। অতঃপর এই দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব ইসা ﷺ-এর বারোজন সহকারীর ওপর অর্পিত হয়, যারা দ্বীন প্রসারের কাজ শুরু করে। কিছু বছর পর ইহুদি আলিম সেন্ট পৌল সত্য দ্বীন গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং ইসা ﷺ-এর সহকারীদের সাথে মিলে দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করে। কিন্তু আস্তে আস্তে সে দ্বীনি বিশ্বাসের সাথে নিজের পক্ষ থেকে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস মিশিয়ে প্রচার শুরু করে এবং একসময় খ্রিষ্টানরাও সেন্ট পৌলের বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে গোমরাহ হয়ে যায়। সর্বশেষ ইসলামের আত্মপ্রকাশের পূর্বে পুরো মানবজাতি গোমরাহির অন্ধকারে ডুবে ছিল। তাই আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদি ও নাসারাদের গোমরাহি খতম করে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনকে ছড়িয়ে দেওয়া।[৪]

ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কারণ, এই ঘটনা ছিল আল্লাহ তাআলা থেকে প্রতিদানের আশাকারী তিন দল অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা ও মুসলিমদের মাঝে চিন্তা ও আদর্শগত বিরোধের সূচনা, পাশাপাশি তা রাজনৈতিক দিক থেকেও পুরো বিশ্ব পরিচালনা-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল; চাই তা (Old World Order) হোক বা (New World Order)। অর্থাৎ পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা হোক বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা।

---

৩. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا - بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

'আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম-পুত্র ইসা মাসিহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলিতে চড়িয়েছে; বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয় তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৫৭-১৫৮)

৪. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে; যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৩)

ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রেখে জীবনযাপনকারী মানুষদের দুটা বড় দলের পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা; যেখানে মুসলিম ও রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলমান ছিল। আর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এই দলগুলোরই নতুন বিশ্বব্যবস্থার নাম, যেখানে রোমান ক্যাথলিকদের জায়গায় প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান, ধর্মহীন খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা অনেক বেশি স্পষ্ট শত্রুতার সাথে সামনে এগিয়ে এসেছে। মূলত তারা সকলেই মুসলিম উম্মাহর শত্রু; কিন্তু নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে সেই পুরাতন শিকারির নতুন ফাঁদ, যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় ঘটনা : উসমান ﷺ-এর শাহাদাত

উসমান ﷺ-এর শাহাদাত হয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন সাবার তৈরি রাফিজি ফিতনার হাতে। এই ভয়ানক সাবায়ি ফিতনা তার পরবর্তীকালে জন্ম হওয়া অসংখ্য ফিতনার দরজা এমনভাবে খুলে দিয়েছিল, যা উসমান ﷺ-এর শাহাদাত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। অপরদিকে উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের বদলা নেওয়ার দাবিতে আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে জঙ্গে সিফফিন সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে কিছু লোক অন্যায়ভাবে ফয়সালা করার অভিযোগ তোলে; যার ফলে সেখান থেকে খারিজি ফিতনার উৎপত্তি হয়। আর এই খারিজি ফিতনা পরবর্তী সময়ে মুতাজিলা ও মুরজিয়া ফিতনার উৎপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এভাবেই উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিন্তাগত ও রাজনৈতিক ফিতনার এক বিশাল দরজা হিসেবে পরিগণিত হয়।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই ফিতনাগুলো নতুন আকৃতি ধারণ করে মুসলিম উম্মাহর অনেক ক্ষতি সাধন করতে থাকে। সত্যপন্থী উলামায়ে কিরাম এসব ফিতনাই অনেক কঠোরভাবে মোকাবিলা করেন এবং মুসলিমদের মাঝে অকাট্য দলিলের দ্বারা সুন্নাহ-বিদআত ও দ্বীন-দ্বীনহীনতার মাঝে পার্থক্য আলোচনা করে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সীমা স্পষ্ট করে দেন, যারা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' নামে পরিচিত। তাদের প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো বাতিল ও গোমরাহ আকিদা-আদর্শ কখনো ইসলামের মধ্যে স্থান করতে পারেনি এবং ইসলাম ধর্ম সকল ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থেকে যায়। পাশাপাশি সত্যপন্থী উলামায়ে কিরাম সেই সমস্ত আকিদা ও কাজগুলো স্পষ্ট করে দেন, যা বিশ্বাস ও করার মাধ্যমে কোনো মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হয়।

চতুর্থ ঘটনা : ফরাসি বিপ্লব (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার)

ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের পর থেকে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের মাঝে বিরোধ চলমান ছিল। অতঃপর সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আত্মপ্রকাশের পর ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মাঝে ধারাবাহিক যুদ্ধ শুরু হয়। সেই সময়টাকে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা ওল্ড

ওয়ার্ল্ড অর্ডার (Old World Order) নামকরণ করেছে। সর্বশেষ ফরাসি বিপ্লবের পর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ্যভাবে আরেকটি নতুন যুগে প্রবেশ করে, যা ছিল মূলত সেই গ্রিক দর্শনের ধর্মহীন মতাদর্শের ফসল। এই সময়টাকে ইতিহাসে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' (New World Order) হিসেবে নামকরণ করা হয়। বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা মানুষের জীবনে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতার দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে পূর্বের কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। কারণ এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব রয়েছে ইহুদি ও তাদের মিত্র প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের হাতে। ফলে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম উম্মাহর মোকাবিলা ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সাথে আর এখন মোকাবিলা হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকেই তৈরি হওয়া এক নতুন জোটের সাথে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত ইহুদিদের সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির নাম, যেখানে তারা ফিলিস্তিন দখল করা থেকে নিয়ে মাসজিদুল আকসা ধ্বংস ও সেখানে হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করা এবং নিজেদের মিথ্যা মাসিহের সাহায্যে পুরো বিশ্বে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত পুরাতন শিকারির নতুন জাল। কারণ এই নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা তাদের সেই পুরাতন শিরক, সুদি অর্থনীতি ও অশ্লীলতা-বেহায়াপনাগুলোই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, পুরাতন নাম ও পরিভাষাগুলোর জায়গায় নতুন নাম, পরিভাষা ও সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তারা এই সব নতুন নাম, পরিভাষা ও ব্যবস্থার ফাঁদে ফেলে অসংখ্য মুসলিমকে শিকার করে নিয়েছে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের সময় থেকে এই অবস্থা একটি মহামারির মতো মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তবে নতুন এসব ভ্রান্ত চিন্তার প্রসার ও ইরতিদাদের সময়েও আল্লাহ তাআলা সত্যপন্থী আলিমগণ ও মুজাহিদদেরকে এই সমস্ত ফিতনার মোকাবিলার জন্য প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, যারা সর্বদাই মুসলিম উম্মাহর সামনে সেই পুরাতন শিকারির নতুন জালের পর্দা উন্মোচন করে দিচ্ছেন।

আমাদের এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য ইহুদি, নাসারা বা মুসলিমদের ইতিহাস বর্ণনা করা নয়। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর প্রতি দরদ রাখে, এমন অসংখ্য যুবকের সামনে সঠিক চিন্তার দ্বার উন্মোচিত করে দেওয়া, যারা বর্তমান সময়ের পশ্চিমা সভ্যতা ও জিহাদের চিন্তাধারার ভিত্তি সম্পর্কে অবগত নন, অথবা যারা অল্প যা কিছু জানেন, তা স্বল্প কিছু ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তারা এতটুকু সক্ষমতা রাখে না, যা দ্বারা সেই ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা বুঝতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে সেই সব ঘটনাকে একত্রিত করা, যা বর্তমান সময়ের পশ্চিমা সভ্যতার চিন্তাধারা ও জিহাদি আন্দোলনকে বোঝার জন্য জরুরি ও আবশ্যক। অতঃপর সেই ঘটনাগুলো সহজ ও ধারাবাহিকতার সাথে আলোচনা করা; যাতে মূল বিষয়গুলো

সহজে বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে সফলতা দান করুন এবং নিজের পক্ষ থেকে এই কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন।

কিতাবটিকে আমরা দুটি অংশ ও একটি উপসংহারে ভাগ করেছি :

- প্রথম খণ্ড : ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা
- দ্বিতীয় খণ্ড : নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা

কিতাবের প্রথম অংশ ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারে দুটি অধ্যায় রয়েছে :

- প্রথম অধ্যায় : ইহুদি জাতি ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার
- দ্বিতীয় অধ্যায় : পশ্চিমা বিশ্ব ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার

প্রথম অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করব, ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাসের কী কী বিশ্বাস ও ঘটনা রয়েছে, যার দ্বারা তারা প্রথমে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা ও পরে নতুন বিশ্বব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে? সেই কারণগুলো কী, যার ভিত্তিতে বনি ইসরাইল মুসলিম থেকে ইহুদিতে পরিণত হয়েছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইসা ﷺ-এর পর সত্য দ্বীনের মধ্যে খ্রিষ্টানরা কোন ধরনের পরিবর্তন করেছিল? অতঃপর ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের উত্থান ও তাতে যে সমস্ত বিকৃতি করা হয়েছিল, তা নিয়ে। সর্বশেষ ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা ইউরোপের পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের কারণ ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব।

কিতাবের দ্বিতীয় অংশ 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে :

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম যুগ : ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দ্বিতীয় যুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের তৃতীয় যুগ : রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চতুর্থ যুগ : স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত

এই অংশে আমরা ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবসভ্যতা যে সমস্ত মতাদর্শ ও ভৌগলিক পরিবর্তনের ধাপ পাড়ি দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার অর্থাৎ নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যা বর্তমানে অনেক আলোচিত হচ্ছে, এটা মূলত কী? এর চিন্তাগত ভিত্তি কী? এটা কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে? তার উদ্দেশ্য কী? ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে গ্রহণের ফলে মুসলিমদের কী ক্ষতি হয়েছে? নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মুসলিম উম্মাহকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

উপসংহারের মধ্যে পুরো ইতিহাস মন্থন করে নতুন বিশ্বব্যবস্থার যত ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা স্পষ্ট করা হবে এবং বর্তমান আধুনিক শক্তিগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সর্বশেষ এই পুরো দৃশ্য দেখানোর পর মুসলিম উম্মাহর সামনে এই সমস্যার সমাধান পেশ করা হবে। সেখানে এমন সব কার্যক্রম নির্ধারণ করব, যেগুলো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পরিচালিত বিশ্বব্যবস্থাকে পরাজিত করা, উম্মাহকে স্বাধীন করা ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহকে ফিরিয়ে আনার জন্য জরুরি ও আবশ্যক।

এই কিতাব লিখা হয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে, যেখানে তাদের সামনে বর্তমান সময়ের ঘটনাগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ ও সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ সন্দেহাতীতভাবে সকল চিন্তাশীল মুসলিম জানে, 'ইহুদিদের গোলাম' মিডিয়াগুলো বিশ্বের বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে গোপন করে রাখে আর এর পেছনে তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিমরা যাতে বাস্তবতা থেকে দূরে সন্দেহ ও সংশয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহ যেন 'এক জাতি' হিসেবে কোথাও জেগে না ওঠে এবং তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে না যায় এবং সেই খিলাফাহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হয়, যা সহস্র বছর ধরে দুনিয়াকে পরাশক্তি হিসেবে শাসন করেছে।

আমরা আমাদের প্রিয় মুসলিম উম্মাহর সামনে এই কথা স্পষ্ট করতে চাই যে, আমাদের জন্য জরুরি হলো, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে বুঝে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া। নিজেদের সোনালি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে ইনসাফের সমাজ কায়েম করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং বইটিকে মুসলিম উম্মাহর উত্থানের কারণ হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন, আমিন।

হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ

প্রথম খণ্ড
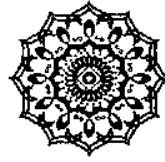
ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার

প্রথম অধ্যায়

ইহুদি ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার

যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি, ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে নতুন যুগের শুরু হয়। নতুন যুগের ইতিহাস দুই অংশে বিভক্ত। একটা হচ্ছে দুনিয়ার পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা, যাকে ইংরেজরা 'ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বলে থাকে। এই অংশটি ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ৭০ বছর পর থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। অতঃপর দুনিয়ার নতুন ও দ্বিতীয় বিশ্বব্যবস্থা ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান রয়েছে। যা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার হোক বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, এই দুইটার ইতিহাসের সূচনাই হয়েছে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে।

ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ৭০ বছর পর রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) ইহুদিদেরকে জেরুজালেম থেকে বের করে দেয়। ৭০ খ্রি. থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৮৮০ বছর ইহুদিরা ইউরোপ ও মুসলিম-বিশ্বে ঘুরে ফিরে নিঃশেষ হতে থাকে। ১৯১৭ সালের ১৭ অক্টোবর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের জেনারেল এলেনবি (General Edmund Allenbe) মুসলিমদের থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে নেয়। জেনারেল এলেনবির বাহিনীর মধ্যে হিন্দুস্থান থেকে ভর্তি হওয়া সেনারাও ছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল নামধারী মুসলিম।

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেলফোর (Lord James Balfour) কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) করে, যেখানে ইহুদিদের জায়োনিস্ট মুভমেন্ট (Zionist Movement)-কে ইসরাইলের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রিটেনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা ও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় এবং ইহুদিদেরকে ইসরাইলে আবাদ করার জন্য সে অঞ্চলটি ব্রিটেনের কব্জায় দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ (United Nations) তার এক ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটেনের দখল বিলুপ্ত করে ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাতে তাদের রাষ্ট্র হিসেবে তুলে দেয়।

ইহুদিদের সম্পূর্ণ ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে বোঝা যায়, তারা মুসলিমদের শাসনের অধীনে জিম্মি হিসেবে খুব নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারত। কিন্তু ইউরোপের খ্রিষ্টান-দুনিয়াতে রোমান ক্যাথলিকরা তাদেরকে ইসা ﷺ-এর হত্যাকারী মনে করত। যার

ফলে খ্রিষ্টান-বিশ্বে ইহুদিদেরকে তৃতীয় স্তরের নাগরিক থেকেও নীচু গণ্য করা হতো। তাদের জন্য প্রশাসন ও বাহিনীর সাথে যেকোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ ছিল। ইহুদিরা ইউরোপে শুধু ব্যবসা করতে পারত, যা ইউরোপে তৃতীয় স্তরের পেশা হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু ১৮৮২ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে ইহুদিরা তাদের সবচেয়ে বড় দুশমন খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তারপর তাদের সাহায্যে শুধু ফিলিস্তিনেই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং দুনিয়ার সব শাসন-ক্ষমতার মধ্যেই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এখানে আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ইহুদিরা ইসা ﷺ-এর দুশমন কেন হয়েছিল? কী কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বাছাইকৃত জাতি বনি ইসরাইলকে মুসলিম থেকে ইহুদি বানিয়ে দিয়েছেন? মুসলিম থেকে ইহুদি হয়ে যাওয়ার পর এই জাতি ৭০ খ্রি. থেকে ১৯৪৮ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ১৮৮০ বছর কী লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে গেছে এবং সেই লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করেছে? ইউরোপের খ্রিষ্টান-দুনিয়া পূর্বে যেখানে ইহুদিদের চরম দুশমন ছিল; কিন্তু আজকে তাদের মাঝে এত গভীর বন্ধুত্ব কীভাবে তৈরি হয়েছে, যার ফলে তারা নিজস্ব বাহিনী পাঠিয়েও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছে? ইউরোপের খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের বন্ধু কীভাবে হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য ইহুদিদের পুরাতন ও নতুন ইতিহাসের পাতাগুলো উলটানো আবশ্যক। ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস ইয়াকুব ﷺ থেকে নিয়ে ইসা ﷺ পর্যন্ত আনুমানিক দুই থেকে আড়াই হাজার বছর পরিব্যাপ্ত ছিল। অতঃপর তাদের নতুন ইতিহাস ইসা ﷺ থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই হাজার বছর পরিব্যাপ্ত।

ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস মূলত বনি ইসরাইলের সেই ইতিহাস, যা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই ইতিহাস ইউসুফ ﷺ-এর মিশর আগমন থেকে শুরু হয়ে ইসা ﷺ-এর আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার পর ৭০ খ্রি. পর্যন্ত অর্থাৎ রোমানদের পক্ষ থেকে জেরুজালেমের ওপর কব্জা করা এবং ইহুদিদেরকে সেখান থেকে বের করা পর্যন্ত চলমান ছিল। এই সময়টার দৈর্ঘ্য আনুমানিক আড়াই হাজার বছর। এই বিশাল সময়ের মধ্যে বনি ইসরাইলের ওপর অনেক পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবি পাঠিয়েছেন। তাওরাত, জাবুর, ইনজিল নাজিল করেছেন। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সুলাইমান ﷺ-এর পর বনি ইসরাইলরা তাদের নবিদের কথার পরিবর্তে অসৎ আলিমদের কথা বেশি গুরুত্বের সাথে মানা শুরু করে। আল্লাহ তাআলার কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন বিকৃতি ঘটায় ও নবিদের ব্যাপারে বিভিন্ন মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করে জনগণের দৃষ্টিতে তাঁদেরকে খারাপ বানিয়ে দিতে থাকে।

তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের সংশোধনের জন্য একের পর এক নবি পাঠাতে থাকেন। যারা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবে তাহরিফ করা থেকে বাধা দেয় এবং সঠিক দ্বীনের দিকে

পথ প্রদর্শন করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা নবিদের মাধ্যমে বনি ইসরাইলকে সতর্ক করে দেন এবং আল্লাহর নাফরমানির ফলে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আজাব নাজিল হওয়া ও জেরুজালেম থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখান। তারপরেও তারা পাপ কাজ থেকে বিরত না হওয়ায় বোখতে নসরের হাতে তাদেরকে জেরুজালেম থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে একজন নবির দুআর বদৌলতে বনি ইসরাইল আবার জেরুজালেমে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা ফিরে এসে আবারও আল্লাহ তাআলার নাফরমানি শুরু করে দেয়। তারা ইসা ﷺ-কে মিথ্যাবাদী মনে করার পাশাপাশি তাদের ধারণামতে তাঁকে হত্যা করে (নাউজুবিল্লাহ)। অতঃপর এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাদেরকে দ্বিতীয়বার রোমানদের হাতে ৭০ খ্রি.-এর দিকে জেরুজালেম থেকে বের করে দেওয়া হয়।

৭০ খ্রি.-এর পর তখন থেকে বনি ইসরাইলের নতুন ইতিহাস শুরু হয়। বনি ইসরাইলকে জেরুজালেম থেকে বের করে দেওয়া ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি; যাতে তারা পুনরায় আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসে। এবং ইসা ﷺ-এর ধর্মের অনুসরণ করে এবং তাঁর পরে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের অনুসরণ করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে পুনরায় জেরুজালেমে ফিরিয়ে নেবেন এবং তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। কিন্তু জেরুজালেম থেকে বের করে দেওয়ার পর বনি ইসরাইল পূর্ণ অহংকারের সাথে শুধু আল্লাহ তাআলার নাফরমানিই করেনি; বরং নিজেদের জন্য মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস মিশ্রিত এক নতুন ধর্ম তৈরি করে নেয়, যার সাথে নবিদের শিক্ষার দূরতম সম্পর্ক ছিল না।

সেই ধর্মের মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে, ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জন্য 'প্রতিশ্রুত ভূমি' মনে করা, ইসা ﷺ-এর পরিবর্তে অন্য আরেক মিথ্যা মাসিহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার একমাত্র বাছাইকৃত জাতি হিসেবে বিশ্বাস করা এবং মাসজিদুল আকসার জায়গায় হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণের আকিদাসহ এমন আরও অনেক ভুল বিশ্বাস সেখানে সংযোজন করে, যার সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এই সমস্ত মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে পুনরায় দখল ও পুরো বিশ্বের ওপর নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা এবং তার জন্য নতুনভাবে চেষ্টা করা শুরু করে।

তাই যদি এমনটা বলা হয় যে, ইহুদিদের নতুন ইতিহাস তাদের পুরাতন ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার নাম, তাহলে তা মিথ্যা হবে না। ইহুদিদের এই সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' যাকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বলা হয়, তার খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই সমস্ত মুসলিমকে এগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা অনেক জরুরি। কেননা, বিষয়টি বর্তমান সময়ের জিহাদি চিন্তাধারার একটি আবশ্যকীয় অংশ। তবে তাদের ইতিহাস অনেক লম্বা, যা পূর্ণ অধ্যয়ন বা আয়ত্ত করা আমাদের ইচ্ছা নয়। আমরা এখানে শুধু সেই সব অংশই আলোচনা করব, যেগুলোর সাথে বর্তমানের সম্পর্ক রয়েছে এবং যেগুলো জানা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক।

বনি ইসরাইলের (ইহুদিদের) পুরাতন ইতিহাস

'বনি ইসরাইল বা ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস' এটি বর্তমানের নতুন পরিভাষা। বাস্তবে তা শুধু ইহুদিদের ইতিহাস নয়; বরং নবিদের ইতিহাসও এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে বনি ইসরাইলের সেই সমস্ত ইমানদার সম্প্রদায়ের ইতিহাসও রয়েছে, যারা নবিদের অনুসরণ করত এবং সেই সমস্ত ব্যক্তির ইতিহাসও রয়েছে, যারা নবিদের নাফরমানি করত এবং যারা পরবর্তীকালে ইহুদি হয়ে গেছে।

বনি ইসরাইলের ইতিহাসকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

প্রথম যুগ : কিনান থেকে মিশরে আগমন পর্যন্ত (খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১২০০)

দ্বিতীয় যুগ : মিশর থেকে পুনরায় ফিলিস্তিনে আবাদি পর্যন্ত (খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৫৮৬)

তৃতীয় যুগ : বোখতে নসরের হামলা ও বাবেলে দেশান্তর (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে ৫৩৯)

চতুর্থ যুগ : বাবেল থেকে ফিরে এসে আবার দেশান্তর পর্যন্ত (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ থেকে ৭০ খ্রি.)

প্রথম যুগ : বনি ইসরাইলের কিনান থেকে মিশরে যাওয়া পর্যন্ত

(খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১২০০)

ইয়াকুব ﷺ ছিলেন ইসহাক ﷺ-এর ছেলে এবং সকল নবির দাদা ইবরাহিম ﷺ-এর নাতি। ইয়াকুব ﷺ-এর এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের কিনান অঞ্চলে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবি বানিয়ে ইসরাইল উপাধি দিয়েছেন, যার অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। ইহুদিদের বাতিল বিশ্বাসের একটি হচ্ছে, ইয়াকুব ﷺ-এর এই উপাধি আল্লাহ তাআলার আকৃতিতে আসা একটি ফেরেশতাকে নৌকার মধ্যে বন্দী করার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল (নাউজুবিল্লাহ)। ইয়াকুব ﷺ-এর ১২ জন সন্তান ছিল। তাঁর সন্তানদের বংশ এতটাই বিস্তৃতি লাভ করেছিল, যা ১২ গোত্র ধারণ করে। তাদেরকেই কুরআনে বনি ইসরাইল বলা হয়েছে।

আখিরি নবি মুহাম্মাদ ﷺ যখন মক্কাতে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন, তখন কুরাইশরা একদল লোককে খাইবারের ইহুদিদের কাছে রাসুলের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করে। খাইবারের ইহুদিরা তাদের বলে, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করো, "বনি ইসরাইল তাদের আসল ভূমি কিনান থেকে মিশর কীভাবে গিয়েছিল?" যদি তিনি সত্য নবি হয়ে থাকেন, তাহলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।' যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এই প্রশ্ন করা হয়,

তখন তাঁর কাছে এর জবাব ছিল না। ফলে আল্লাহ তাআলা ইউসুফ ﷺ-এর পুরো ঘটনা সুরা ইউসুফের মধ্যে একসাথে বর্ণনা করে জবাব দিয়ে দেন।[৫]

যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ইউসুফ ﷺ-এর ভাইয়েরা হিংসাবশত তাঁকে বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এক কূপে নিক্ষেপ করে। যেখান থেকে একটি কাফেলা তাঁকে উদ্ধার করে গোলাম হিসেবে মিশরের মন্ত্রীর কাছে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু মন্ত্রীর স্ত্রীর চক্রান্তের ফলে তাঁকে জেলে যেতে হয়। তখন মিশরে কিবতি বংশের বাদশাহর শাসন চলমান ছিল। একদিন বাদশাহ এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখে, যার সঠিক ব্যাখ্যা ইউসুফ ﷺ ছাড়া কেউ বর্ণনা করতে সক্ষম ছিল না। আর এভাবেই তিনি জেল থেকে বের হয়ে বাদশাহর নিকটতম হয়ে যান এবং পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁকে খাদ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়। সর্বশেষ ইউসুফ ﷺ নিজের উত্তম কাজের মাধ্যমে মিশরের বাদশাহ হয়ে যান। অতঃপর ইউসুফ ﷺ তাঁর পিতা ইয়াকুব ﷺ-সহ ১১ ভাইকে মিশরে ডেকে আনেন; যার ফলে বনি ইসরাইল মিশরে আবাদ হয়ে যায়।

ইউসুফ ﷺ-এর অফাতের পর বনি ইসরাইল সাত-আটশ বছর পর্যন্ত মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এই সময় তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল ছিল। কিন্তু একসময় আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে খারাপ কাজ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যার ফলে তাদের থেকে মিশরের বাদশাহি ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানে ফিরআওনদের বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যার ফলে বনি ইসরাইল দীর্ঘ সময় মিশরের বাদশাহ থাকার পর এখন তারাই প্রজা ও গোলামে পরিণত হয়। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে বনি ইসরাইলের এই গোলামি আনুমানিক তিন থেকে চারশ বছর পর্যন্ত চলমান ছিল। এটা ছিল তাদের সবচেয়ে খারাপ সময়। তখন ফিরআওনরা তাদেরকে জুলুম করত এবং গোলাম হিসেবে ব্যবহার করত।

সর্বশেষ ফিরআওন 'রামসিস ২য়'-এর সময় গণকরা তাকে বলে, 'বনি ইসরাইলের মধ্যে এমন এক শিশু জন্মাবে, যিনি তার ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবেন।' 'রামসিস ২য়' ছিল সেই ফিরআওন, যে মুসা ﷺ-এর সময়ের বাদশাহ এবং তার আলোচনাই কুরআনে এসেছে। সে নিজের বাদশাহি বাঁচানোর জন্য বনি ইসরাইলের সকল শিশুকে হত্যা করার হুকুম দেয়। কিছু বছর একচেটিয়া সমস্ত শিশু হত্যার পর তার সহকারীরা তাকে পরামর্শ দেয় যে, এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকলে কিছু দিন পর বনি ইসরাইল থেকে তাদের গোলামের সংখ্যা

---

৫. সুরা ইউসুফের শানে নুজুলের অধীনে মুফাসসিরগণ ইহুদিদের প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। অনেক মুফাসসির লিখেছেন, ইহুদিরা ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনা জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লামা বাগাবি ﷺ যে প্রশ্নের কথা বলেছেন, এখানে লেখক সেটা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বাগাবি ﷺ বলেন, 'ইহুদিরা আল্লাহর রাসুলকে ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনা কিংবা বলা হয়, ইয়াকুবের ছেলেরা কিনান থেকে মিশরে গমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; তাই আল্লাহ তাদের জন্য ইউসুফ ﷺ-এর কাহিনি বর্ণনা করেন।' (মাআলিমুত তানজিল)

অনেক কমে যাবে। তখন ফিরআওন আদেশ দেয় এক বছর সমস্ত বাচ্চাকে হত্যা করা হবে এবং দ্বিতীয় বছরের সকল বাচ্চাকে জীবিত রাখা হবে। সুরা বাকারাতে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার বর্ণনাতে এই সময়টাকে বনি ইসরাইলের ওপর বিশাল আজাব বলেছেন অর্থাৎ এটা ছিল বনি ইসরাইলের ওপর এক বিশাল বিপদ।[৬]

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় মুসা ﷺ সেই বছর জন্মগ্রহণ করেন, যে বছর সকল সন্তানকে হত্যার আদেশ জারি ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় মুসা ﷺ-এর মা তাঁকে একটি বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দেন। এই বাক্স যখন ফিরআওনের মহলের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল, তখন ফিরআওনের বিবি আসিয়া সেটাকে উঠিয়ে আনেন। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে মুসা ﷺ-এর প্রতি মহব্বত ঢেলে দেন এবং ফিরআওনের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসা ﷺ-কে নিজের সন্তান বানিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় মুসা ﷺ ফিরআওনের মহলেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন।[৭] এখানে মুসা ﷺ-এর সিরাতের দীর্ঘ আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। এখান থেকে আমাদের এতটুকুই জানা জরুরি যে, মুসা ﷺ-এর নবুওয়াত পাওয়া ও তাঁর দাওয়াত বনি ইসরাইলের ইতিহাসে কতটা প্রভাবশীল ছিল।

আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-কে নবুওয়াত দেন এবং তাঁকে ফিরআওন ও বনি ইসরাইলের কাছে হিদায়াতের বাণী পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেন। ফিরআওন যখন মুসা ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বনি ইসরাইলকে গোলামি থেকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করে, তখন মুসা ﷺ আল্লাহ তাআলার হুকুমে বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে সিনাই মরুভূমিতে চলে যান। সিনাই মরুভূমি মিশর ও ফিলিস্তিনের মাঝে শত মাইল লম্বা একটি

---

৬. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

'আর (স্মরণ করো) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের মুক্তি দান করেছি ফিরআওনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদের জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদের অব্যাহতি দিত। বস্তুত, তাতে ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা। (সুরা আল-বাকারা, ২ : ৪৯)

৭. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ - فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ - وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

'আমি মুসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, "তাকে স্তন্য দান করতে থাকো। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করো, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব।" অতঃপর ফিরআওন-পরিবার মুসাকে কুড়িয়ে নিল; যাতে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যায়। নিশ্চয় ফিরআওন, হামান, ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। ফিরআওনের স্ত্রী বলল, "এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি।" প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোনো খবর ছিল না।' (সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭-৯)

অঞ্চল। যখন মুসা ﷺ বনি ইসরাইলকে নিয়ে লোহিত সাগরের (Red Sea) পাড়ে সেই জায়গায় পৌছান, যাকে আজ সুয়েজ গালফ (Gulf of Suez) বলা হয়, তখন ফিরআওনও তার বাহিনী নিয়ে মুসা ﷺ-এর পিছু ধাওয়া করে সেখানে পৌছে যায়। মুসা ﷺ আল্লাহ তাআলার হুকুমে আপন লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন; ফলে সেখানে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়, যা দিয়ে বনি ইসরাইল সমুদ্র পার হয়ে সিনাই মরুতে পৌছে যায়। কিন্তু ফিরআওন যখন পার হতে চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ডুবিয়ে দেন। আর এভাবেই বনি ইসরাইল ফিরআওনের গোলামির জীবন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বনি ইসরাইলকে নিজের এই ইহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[৮]

আজকের ইহুদিদের ইতিহাসেও যেদিন তারা মুসা ﷺ-এর নেতৃত্বে মিশর থেকে বের হয়ে আসে এবং ফিরআওনের গোলামি থেকে মুক্তি লাভ করে, এই পুরো সফরকে তারা অসম্ভব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করে। ইহুদিরা আজও সেই দিনকে 'ইয়াউমে কিপুর' (Yom Kippur) ডাকে, যা থেকে তাদের নতুন বছর শুরু হয়। তাদের ইতিহাসে ইয়াকুব ﷺ-এর কিনান (ফিলিস্তিন) থেকে বের হয়ে মিশর আসা এবং পুনরায় মুসা ﷺ-এর নেতৃত্বে মিশর থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিনের সফর শুরু করা ধর্মীয় তাৎপর্য রাখে। যার কারণে বর্তমান যুগের ইহুদিরা মিশর ও ফিলিস্তিনকে নিজেদের 'প্রতিশ্রুত ভূমি'র অন্তর্ভুক্ত মনে করে, যার আলোচনা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় যুগ : মিশর থেকে দেশান্তর হওয়ার পর থেকে ফিলিস্তিনে আবাদি পর্যন্ত

(খ্রি.পূ. ১২০০ থেকে ৫৮৬)

মুসা ﷺ থেকে নিয়ে সুলাইমান ﷺ পর্যন্ত সময়টা ইহুদিদের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শুধু ফিরআওনের গোলামি থেকেই নাজাত দেননি; বরং তাওরাতের মতো একটি পূর্ণ শরিয়াহ দান করেন। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং জমিনে পুনরায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে যুগে তারা সিনাই মরু থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিনে শাসন প্রতিষ্ঠা করে, সেই যুগকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ সিনাই মরুতে ঘুরতে থাকা, দ্বিতীয় অংশ জেরুজালেম বিজয়, তৃতীয় অংশ বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হওয়া। আমরা সামনের আলোচনায় উল্লেখিত ঘটনাসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করব।

---

৮. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

'আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফিরআওনের লোকদের; অথচ তোমরা দেখছিলে।' (সুরা আল-বাকারা, ২ : ৫০)

পূর্বে যেমনটা বর্ণনা করেছি, বনি ইসরাইল মুসা عليه السلام-এর নেতৃত্বে ফিরআওনের গোলামি থেকে বের হয়ে সিনাই মরুতে পৌঁছায়। সিনাই মরুতে আসার পর আল্লাহ তাআলা মুসা عليه السلام-কে তুর পাহাড়ে ৪০ দিন রোজা রাখার হুকুম দেন। ৪০ দিন পর আল্লাহ তাআলা মুসা عليه السلام-এর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর ওপর তাওরাত নাজিল করেন, যা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ। আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথনের ফলে মুসা عليه السلام-এর উপাধি হয়ে যায় কালিমুল্লাহ। কিন্তু একদিকে যখন মুসা عليه السلام-এর সাথে আল্লাহ তাআলার কথা হচ্ছিল, তখন অন্যদিকে সামিরি বনি ইসরাইলকে গোমরাহ করে ফেলে এবং তারা বাছুরপূজা করা শুরু করে।[৯] মুসা عليه السلام ফিরে এসে এই ফিতনা খতম করেন।

সিনাই মরুতে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ১২টি ঝরনা প্রবাহিত করেন এবং আসমান থেকে মান্না-সালওয়া নাজিল করেন। কিন্তু বনি ইসরাইল এই প্রস্তুতকৃত খাবারের ওপর সন্তুষ্ট না হয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবকিছুই দান করেন। সিনাই মরুতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে হামলা করা ও সেখানের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম দেন। উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন, বনি ইসরাইল ফিরআওনের গোলামিতে থেকে মানসিকভাবে এতটা দুর্বল ও পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে যায় যে, তারা মুসা عليه السلام-এর সামনে বাহানা পেশ করা শুরু করে। তারা বলতে থাকে, 'হে মুসা, সেখানে এক অত্যাচারী জাতি রয়েছে, যাদের সাথে আমাদের লড়াই করার শক্তি নেই।' ফলে তখন পুরো বনি ইসরাইল থেকে শুধু দুজন আল্লাহর হুকুমে লাব্বাইক বলে।[১০] তাফসিরে এই দুই ব্যক্তির নাম এসেছে ইউশা বিন নুন ও কালিব বিন ইউফনা عليهما السلام।[১১] এই দুজন বনি ইসরাইলের বারোজন নির্বাচিত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে ইউশা বিন নুন عليه السلام মুসা عليه السلام-এর পরে নবি হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা ভীরুতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে সিনাই মরুতে ৪০ বছর ঘূর্ণয়নে ফেলে রাখেন।[১২] আর এই সময়ের মধ্যে এমন নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়, যারা ছিল ফিরআওনের গোলামি থেকে মুক্ত। সিনাই মরুতেই মুসা ও হারুন عليهما السلام-এর অফাত হয়।

---

৯. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

'আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির, অতঃপর তোমরা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে তার অনুপস্থিতিতে। বস্তুত, তোমরা ছিলে জালিম। (সুরা আল-বাকারা, ২ : ৫১)

১০. এই ঘটনার আলোচনা সুরা আল-মায়িদার ২০-২৩ নং আয়াতে এসেছে।

১১. তাফসিরুত তাবারি, জাদুল মাসির, তাফসিরু ইবনি কাসির-সহ অন্যান্য তাফসিরের গ্রন্থ দেখা যেতে পারে। তবে কিছু রিওয়ায়াতে কালিবের নাম কালব ও কালুবও এসেছে।

১২. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

'তিনি বললেন, "এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।"' (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ২৬)

এই দুজন নবির অফাতের পর আল্লাহ তাআলা ইউশা বিন নুন ﷺ-কে নবুওয়াত দান করেন এবং ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে জিহাদের আদেশ দেন। ইউশা বিন নুন ﷺ আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন করে পুরো ফিলিস্তিন বিজয় করে নেন। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। ইউশা বিন নুন ﷺ-এর পর কিছু বছর বনি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের আমালেকা সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ চলমান থাকে। সেই সময় স্যামুয়েল ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা নবি হিসেবে পাঠান। সেই সময় জেরুজালেমের বাদশাহ ছিল জালুত, যে বনি ইসরাইলের এলাকাগুলো দখল করে হত্যা-ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। স্যামুয়েল ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে জালুতের জুলুমের ব্যাপারে অভিযোগ করেন এবং তাদের জন্য একজন নেতা পাঠানোর দুআ করেন, যিনি তাদেরকে নিয়ে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

এই দুআর ফলে আল্লাহ তাআলা তালুতকে বাদশাহ নির্ধারণ করেন এবং তার নেতৃত্বে জেরুজালেম বিজয়ের জন্য জিহাদের আদেশ দেন। তালুত যেহেতু অপরিচিত ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই বনি ইসরাইলের সর্দাররা তাঁর নেতৃত্বের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে। আল্লাহ তাআলা নবির মাধ্যমে বনি ইসরাইলের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, তালুতকে নেতা নির্ধারণের কারণ হলো, সে নিজ জাতির মধ্যে ইলম ও শারীরিক শক্তিতে সবচেয়ে অগ্রগামী। কিন্তু তারপরও বনি ইসরাইল আশ্বস্ত হতে পারেনি; যার ফলে তারা নিজেদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য স্যামুয়েল ﷺ-এর কাছে উনার নেতৃত্বের সত্যতার ব্যাপারে প্রমাণ চাওয়া শুরু করে। স্যামুয়েল ﷺ আবার দুআ করেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া 'তাবুতে সাকিনা' আপন ইচ্ছায় ফিরিয়ে দেন। যেখানে তাওরাত ও মুসা ﷺ-এর ব্যবহৃত কিছু জিনিস ছিল, যাকে বনি ইসরাইল অনেক সম্মানিত মনে করত। আর এভাবে বনি ইসরাইল তালুতের নেতৃত্বে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়। এই ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা সুরা বাকারার দ্বিতীয় পারার শেষ দিকে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন।[১৩]

তালুতের নেতৃত্বে মুসলিমদের এই বাহিনী যখন জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা সেই বাহিনীকে এক আশ্চর্যজনক পরীক্ষায় ফেলে দেন। আল্লাহ তাআলা স্যামুয়েল ﷺ-কে ওহির মাধ্যমে আদেশ দেন, যেন এই বাহিনীর পথে যে নদী আসবে, সেখান থেকে কেউ পানি পান না করে। যদি পান করতেই হয়, তাহলে শুধু এক কোষ পান করবে। কিন্তু যখন বাহিনী নদীর কিনারে পৌঁছায়, তখন ৩১৩ জন ব্যতীত সবাই এক কোষ থেকে বেশি পান করে নেয়। ফলে যারাই অতিরিক্ত পান করেছিল, তাদের জিহাদের হিম্মত নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা পেছনে থেকে যায়। বারা বিন আজিব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'শুধু আসহাবে বদর যতজন অর্থাৎ ৩১৩ জন টিকে থাকেন।'[১৪] আল্লাহ তাআলা

---

১৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৬-২৫২।

১৪. সহিহুল বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, বদরের সদস্য সংখ্যার অধ্যায়।

এই অবিচল মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করেন এবং জালুতের বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। সেই মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে ছিলেন দাউদ عليه السلام, যিনি জালুতকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তালুতের পর তাঁকে বাদশাহির সাথে সাথে নবুওয়াতও দান করেছিলেন। অতঃপর দাউদ عليه السلام-এর পর তাঁর ছেলে সুলাইমান عليه السلام-কে বিশাল হুকুমত ও বাদশাহি দান করেছিলেন। সুলাইমান عليه السلام-এর বাদশাহির কথা কল্পনা করে ইহুদিরা আজও এক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে।

বনি ইসরাইল ইউসুফ عليه السلام-এর জমানায় কিনান থেকে মিশর গিয়ে সেখানে বাদশাহ হয়ে যায়, পরে ফিরআওনের হাতে গোলামে পরিণত হয়। মুসা عليه السلام-এর যুগে ফিরআওনের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে সিনাই মরুতে আসে। ইউশা عليه السلام-এর নেতৃত্বে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন বিজয় করে এবং তালুতের নেতৃত্বে জেরুজালেম বিজয় করে। দাউদ عليه السلام-এর নেতৃত্বে পুরো ফিলিস্তিনের বাদশাহে পরিণত হয় এবং সুলাইমান عليه السلام-এর সময় এমন বৈশ্বিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, যা পূর্বে ও পরে কাউকে দেওয়া হয়নি। সুলাইমান عليه السلام-এর সময় মাসজিদুল আকসাকে পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। আজকের নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ইহুদিরা সুলাইমান عليه السلام-এর যুগের বাদশাহির মতো পুনরায় বিশ্বের বুকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। সেই যুগে যেই মাসজিদুল আকসাকে নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটাকে আজকে ইহুদিরা হাইকালে সুলাইমানির জায়গায় নির্মিত মনে করে। এই বিষয়ে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় যুগ : বোখতে নসরের হামলা ও বাবেলে প্রথম দেশান্তর

(খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে ৫৩৯)

দাউদ عليه السلام-এর পর আল্লাহ তাআলা তাঁর ছেলে সুলাইমান عليه السلام-কে বাদশাহির সাথে নবুওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুলাইমান عليه السلام-কে এমন রাজত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা পূর্বে ও পরে কাউকে দেওয়া হয়নি। বনি ইসরাইলের বর্ণনা মুতাবিক তাঁর হুকুমতের সময় জেরুজালেমে একটি বিশাল ইবাদতগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই ইবাদতগৃহ নির্মাণ নিয়ে মুসলিম ও ইহুদিদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মুসলিমদের বিশ্বাস হচ্ছে সুলাইমান عليه السلام মাসজিদুল আকসাকেই পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেছিলেন। মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আকসা আল্লাহ তাআলার আদেশে ফেরেশতারা নির্মাণ করেছিল। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম যেই গৃহ নির্মিত হয়েছিল, তা ছিল মাসজিদুল হারাম বা কাবা। তাই কুরআনে তাকে বাইতুল আতিক বা পুরাতন গৃহ বলা হয়েছে। দুনিয়ার দ্বিতীয় মসজিদ ছিল মাসজিদুল আকসা, যা মাসজিদুল হারামের ৪০ বছর পর নির্মিত হয়।

এই দুই মসজিদ আদম ﷺ-এর যুগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলো আল্লাহর দ্বীনের শিআর বা নিদর্শন। পরবর্তীকালে এই দুই মসজিদ নুহ ﷺ-এর যুগে প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর মাসজিদুল হারামকে ইবরাহিম ও ইসমাইল ﷺ দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন। অন্যদিকে মাসজিদুল আকসাকে ইয়াকুব ﷺ নির্মাণ করেন এবং দাউদ ﷺ সম্প্রসারণ করেন। সর্বশেষ সবচেয়ে বড় সম্প্রসারণ হয়েছিল সুলাইমান ﷺ-এর যুগে জিনদের সাহায্যে।

ইহুদিদের দাবি অনুযায়ী সুলাইমান ﷺ মাসজিদুল আকসা নয়; বরং তার জায়গায় একটি ইবাদতগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, যাকে হাইকালে সুলাইমানি বলা হয়। সেখানে ইহুদিদের জন্য একটি কুরবানিগৃহ ছিল, যেখানে তারা নিজেদের কুরবানি আল্লাহর সামনে পেশ করত। ইহুদিদের দাবি অনুযায়ী হাইকালে সুলাইমানি দুবার ধ্বংস হয়। সর্বপ্রথম বাবেলের বাদশাহর হাতে ও দ্বিতীয়বার রোমান-সম্রাট টাইটাসের সময় পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়। তাই তাদের দাবি হচ্ছে, মাসজিদুল আকসা ধ্বংস করে তার জায়গায় হাইকালে সুলাইমানি পুনর্নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু মুসলিমদের দাবি হচ্ছে, ওই সমস্ত হামলায় হাইকাল নয়; বরং মাসজিদুল আকসা ধ্বংস হয়েছিল। যাকে পরবর্তীকালে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। আজও মাসজিদুল আকসা সেই জায়গায় নির্মিত, যেখানে সুলাইমান ﷺ নির্মাণ করেছেন।

সুলাইমান ﷺ বনি ইসরাইলের বনি ইয়াহুদা কবিলার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পরে তাঁর কবিলা বনি ইয়াহুদা হুকুমত শুরু করে; কিন্তু অন্য কবিলাগুলো তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ফলে ফিলিস্তিনের ভূমি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, একটি অংশের নাম ছিল উক্ত কবিলার দিকে সম্পৃক্ত করে ইয়াহুদা (Judah), যা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং অপর অংশের নাম ছিল 'সামারিয়া' বা 'ইসরাইল' (Israel) যা পূর্ব দিকে লেবাননে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে বনি ইয়াহুদা সামারিয়া হুকুমতকে দখল করে পুরো ফিলিস্তিনে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যার পর থেকে বনি ইসরাইলের নাম ইহুদি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য ধারাবাহিকভাবে নবি পাঠাতে থাকেন। আর তাদের বাদশাহরা নবিগণের নির্দেশনা মুতাবিক তাদের শাসন পরিচালনা করতে থাকে।

আস্তে আস্তে বনি ইসরাইলের মধ্যে গোমরাহি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, এমনকি ধর্মীয় অঙ্গনেও উলামায়ে সু তৈরি হতে থাকে। লোকেরা সেই গোমরাহ আলিমদের অনুসরণ করে নবিদের বিরোধিতা করা শুরু করে, যেমনটা কুরআনে কারিমে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে যায় যে, তারা নবিদের হত্যা করে কিতাবুল্লাহর মধ্যে বিকৃতি করা শুরু করে। সেই সময়ে আল্লাহ তাআলা একজন নবি পাঠান, যিনি ছিলেন আরমিয়া ﷺ। তিনি বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলার শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং তারা যদি ভ্রষ্টতা বন্ধ না করে, তাহলে তাদের ওপর এমন জালিম বাদশাহ

চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখান, যে তাদের ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে গোলাম বানিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বনি ইসরাইল তাদের এই নবির কথায় সতর্ক হয়নি। ফলে আল্লাহ তাআলা বাবেলে (বর্তমানের ইরাক) বসবাসকারী (Asszrians) আসিরিয়ানদের বাদশাহ 'বোখতে নসর' (Nebuchadnezzar II)-কে তাদের ওপর চাপিয়ে দেন। বোখতে নসর লক্ষ লক্ষ ইসরাইলিকে হত্যা করে এবং বাকিদেরকে গোলাম বানিয়ে নিজের সাথে ইরাক নিয়ে যায় এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রত্যেকটা ইট ধ্বংস করে দেয়। সুরা বনি ইসরাইলের শুরুর আয়াতগুলোতে তাদের ওপর আপতিত যে দুটি ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অধিকাংশ মুফাসসির এই ঘটনাকে তার প্রথম ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[১৫]

চতুর্থ যুগ : বাবেল থেকে এসে দ্বিতীয় দেশান্তর পর্যন্ত

(খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ থেকে ৭০ খ্রি.)

বনি ইসরাইলের পুরাতন ইতিহাসে আরমিয়া ﷺ-এর সময় থেকে ইসা ﷺ-এর সময় পর্যন্ত যুগকে খুব গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়। এবং সেই সময়ের প্রভাব আজকের নতুন বিশ্বেও অনুভূত হয়। এই যুগ শুরু হয়েছে খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। যখন ব্যবিলনের (বাবেলের) বাদশাহ বোখতে নসর জেরুজালেমে প্রবেশ করে তা ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইহুদিদের বর্ণনা মুতাবিক বোখতে নসর হাইকালে সুলাইমানি ধ্বংস করে বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যায়। ইহুদিদের ইতিহাসে সেই যুগকে 'বাবেলের বন্দিত্ব' (Babzlonian Captivitz)-এর যুগ বলা হয়। বোখতে নসরের গোলামির সময় কিছু গোত্র তখনকার ইরানের আবাদ হয়ে যায়। কিছু গোত্র মদিনা ও খাইবারের দিকে পলায়ন করে চলে আসে। আর বাকি অধিকাংশরাই ইরাকে থেকে যেতে বাধ্য হয়।

বাবেলের সেই গোলামির সময় বনি ইসরাইলের মধ্যে অনেক গোমরাহি জন্ম নেয়, যা পরবর্তীকালে বনি ইসরাইলকে মুসলিম থেকে ইহুদিতে পরিণত করে। ইহুদিদের ইতিহাস মুতাবিক জেরুজালেম ধ্বংসের সময় তাওরাতের সকল কপি নষ্ট হয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালে উজাইর ﷺ তাওরাতকে দ্বিতীয়বার জমা করার চেষ্টা শুরু করেন এবং পুরো তাওরাত নতুন করে একত্রিত করে ফেলেন। যার ফলে কিছু ইহুদি বাড়াবাড়ি করে তাঁকে

---

১৫. কুরআনে সুরা বনি ইসরাইলের ৪-৭ নং আয়াতে এই দুই ফিতনার আলোচনা এসেছে। কিন্তু কুরআন কিংবা হাদিসে এই দুই ফিতনার বিস্তারিত আলোচনা নেই। সাহাবিদের আলোচনায় এসেছে; কিন্তু সেখানেও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ জালুতের হামলাকে প্রথম ফিতনা বলেছেন আবার কেউ কেউ বাবেলের বাদশাহ 'সানহারিব'-এর আলোচনা এনেছেন। কতক বোখতে নসরের কথা বলেছেন, যাদের মধ্যে ইবনে ইসহাক রয়েছেন। লেখক এখানে ইবনে ইসহাকের মতটি গ্রহণ করেছেন। অনেকে বোখতে নসরের হামলাকে দ্বিতীয় বলেছেন। (বিস্তারিত তাফসিরে তাবারি)। সারকথা হচ্ছে, নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবে না। তবে মুফাসসিরদের বর্ণনা, ইসরাইলি রিওয়ায়াত ও ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা বোঝা যায়, প্রথম ফিতনা দ্বারা বোখতে নসরের হামলা উদ্দেশ্য নেওয়াটাই প্রধান্যপ্রাপ্ত মত।

'আল্লাহর সন্তান' মনে করে। সেই যুগে শুরু হওয়া আরেকটি ফিতনা ছিল, বনি ইসরাইলের ভ্রান্ত আলিমদের মনগড়া বর্ণনার ভিত্তিতে 'তালমুদ' (Talmud) রচিত হওয়া। উলামায়ে সু'রা তালমুদকে তাদের ভাষায় ইলমে ওহি ও দ্বীনের উৎস হিসেবে ঘোষণা দেয়। তাদের দাবি ছিল, এই ওহি আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের দশজন বুজুর্গের ওপর সেই সময় দান করেন, যখন তারা মুসা ﷺ-এর সাথে তুর পাহাড়ে গিয়েছিল। এই ওহি সিনা-ব-সিনা সেই বুজুর্গদের বংশের মধ্যেই সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু বাবেলের বন্দিত্বের যুগে তা লিপিবদ্ধ করা জরুরি ছিল; যাতে তা হারিয়ে না যায়। তালমুদ রচনাকারী ও এটাকে ইলমে ওহি গণ্যকারী আলিমদেরকে ফারিসি (Pharisee) বলা হয়। এরা বনি ইসরাইলের মধ্যে নতুন একটি দল তৈরি করে, যাদেরকে 'ফারিসিয়্যিন' (Pharisees) বলা হয়। এই দলই ইসা ﷺ-এর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিল।[১৬]

ব্যবিলনে বন্দী থাকার সময় আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের মাঝে একজন নবি প্রেরণ করেন, যিনি দানিয়েল ﷺ নামে পরিচিত। বনি ইসরাইল এই নবির কাছে আবেদন করে, যেন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে বোখতে নসরের গোলামি থেকে মুক্তি ও পুনরায় জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার জন্য দুআ করেন। যাতে সেখানে গিয়ে তারা হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারে এবং তারা সুলাইমান ﷺ-এর সময়ের মতো ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

দানিয়েল ﷺ তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেন, ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ দেন। সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল, আল্লাহ তাআলা একজন বাদশাহর মাধ্যমে বনি ইসরাইলকে গোলামি থেকে মুক্তি দেবেন। যিনি তাদের পুনরায় পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যাবেন এবং পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুত মাসিহের হাতে তাদের বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই সুসংবাদ ছিল আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও মাসিহুল্লাহর অনুসরণের সাথে শর্তযুক্ত। ইহুদিদের ইতিহাসমতে, পারস্যের বাদশাহ দ্বিতীয় খসরু (Czrus) বাবেলের ওপর হামলা করে আশিরিয়্যুনদের হুকুমত খতম করে বনি ইসরাইলকে মুক্ত করে এবং পুনরায় তাদের পবিত্র ভূমিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়। সেই সাথে যেসব সম্পদ বোখতে নসর জেরুজালেম থেকে নিয়ে এসেছিল, তা তাদের ফিরিয়ে দেয় এবং হাইকাল নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার আদেশ দেয়। কিছু মুহাক্কিকিন সেই বাদশাহকে কুরআনে বর্ণিত বাদশাহ জুলকারনাইন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] এভাবেই

---

১৬. এই কারণেই নিউ টেস্টামেন্টে ইসা ﷺ-এর কথা ফারিসিদের বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের খ্রিষ্টানরা—যাদের অধিকাংশ প্রটেস্টান্ট—এই ফারিসিদেরকেও দুই ভাগ করে। এক ভাগ ভালো, অপর ভাগ খারাপ; যাতে ইহুদিদের রক্ষা করা যায়।

১৭. কুরআন মাজিদে জুলকারনাইনের শুধু ভালো কাজ ও যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাদিস শরিফেও বিস্তারিত কোনো আলোচনা আসেনি। এই কারণেই তার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, শুধু ধারণা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই কথা বলতে হবে। ইতিহাস ও ইসরাইলি বর্ণনা সম্পর্কে জ্ঞাত সাহাবিদের মাঝেও তাকে নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ বলেছেন, সে ছিল আব্দুল্লাহ বিন দাহহাক বিন মাদ। মুআজ বিন জাবাল ؓ বলেছেন, 'তার নাম ছিল ইস্কান্দার রুমি।' ইবনে ইসহাক বলেছেন, 'তার

দানিয়েল ﷺ-এর দুআর মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বপ্নের প্রথম অংশ বাস্তবায়িত হয়। তবে দ্বিতীয় অংশ এখনো বাকি, তা হচ্ছে একজন মাসিহ আগমন করে সুলাইমান ﷺ-এর মতো বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের কাছে ইসা ﷺ-কে নবি ও মাসিহুল্লাহ হিসেবে প্রেরণ করেন; কিন্তু বনি ইসরাইল তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে ফারিসি আলিমরাই সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। ইসা ﷺ-এর জন্ম ও নবুওয়াতের ঘটনা কুরআনে আল্লাহ তাআলা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করব।

ইসা ﷺ-এর মাতা ছিলেন মারইয়াম ﷺ। মারইয়াম ﷺ-এর পিতার নাম কুরআন মাজিদে ইমরান বলা হয়েছে। ইমরানের স্ত্রী অর্থাৎ মারইয়াম ﷺ-এর মাতা মান্নত করেছিলেন, যদি তার ছেলে-সন্তান জন্ম হয়, তাহলে তাকে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেবেন (যা ছিল তখনকার সময়ের নীতি)। কিন্তু তার গর্ভে মারইয়াম অর্থাৎ মেয়ে-সন্তান জন্ম নেয়। মারইয়াম ﷺ-এর মা তার মান্নত পূরণের জন্য আপন মেয়ে মারইয়ামকেই রাহিবা বানানোর জন্য জাকারিয়া ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন, যিনি সেই সময় বনি ইসরাইলের নবি ছিলেন। একবার জাকারিয়া ﷺ মারইয়াম ﷺ-এর ঘরে গিয়ে অ-মৌসুমী ফল দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এগুলো কোত্থেকে এসেছে?' তখন মারইয়াম ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে।' এই নিদর্শন দেখে জাকারিয়া ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে সন্তানের জন্য দুআ করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইয়াহইয়া ﷺ-এর জন্মের সুসংবাদ দেন।

ইয়াহইয়া ﷺ-এর জন্মের কিছু দিন পরে ইসা ﷺ-এর জন্ম হয়েছিল। ইসা ﷺ ছিলেন আল্লাহ তাআলার কুদরতের কারিশমা। আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-এর জন্মকে আদম ﷺ-এর জন্মের সাথে তুলনা করেছেন।[১৮] আল্লাহ তাআলা যেমনভাবে আদম ﷺ-কে মাটি থেকে 'কুন' বলার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই ইসা ﷺ-এর সৃষ্টিও 'কুন' শব্দের মাধ্যমে

নাম মারজাবান বিন মারদাবাহ ইউনানি ছিল।' ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও ইবনে হিশাম বলেন, 'তার নাম ছিল ইস্কান্দার মাকদুনি। পরবর্তী অধিকাংশরাই তাকে ইস্কান্দারে মাকদুনি (মহান ইস্কান্দার) মনে করত।' (এই মত গ্রহণে সমস্যা রয়েছে; কেননা, ইস্কান্দার মাকদুনির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, সে মুশরিক ছিল। তবে আল্লামা আলুসি স্বীয় তাফসির-গ্রন্থে এই কথা অস্বীকার করেছেন)। বর্তমানে নতুন গবেষণা সামনে এসেছে, যেখানে বাদশাহ জুলকারনাইনকে পারস্য-রোমের শাসক দ্বিতীয় খসরু (Czrus the Great) বলা হয়েছে। তার ভালো কাজগুলো অনেক প্রসিদ্ধ ছিল এবং সে রোম ও পারস্য দুই বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছে। সে দানিয়েল ﷺ-এর সুহবত লাভ করেছে এবং তাঁর পরামর্শে বনি ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই তাহকিক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ﷺ স্বীয় তাফসির-গ্রন্থ 'তারজুমানে কুরআন'-এর মাঝে এনেছেন। লেখক এখানে এই তাহকিককে গ্রহণ করেছেন।

১৮. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ
'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন, "হয়ে যাও," সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।' (সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৫৯)

হয়েছিল। তাই ইসা ﷺ-কে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়, এ ছাড়াও তাঁকে রুহুল্লাহ এবং মাসিহুল্লাহও বলা হয়। ইসা ﷺ পিতাহীন জন্মলাভ করেছেন এবং শিশুকালেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। বড় হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে মৃতকে জীবিত করা ও জন্মান্ধকে সুস্থ করার মুজিজা দান করেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইসা ﷺ ও ইয়াহইয়া ﷺ নিজ নিজ এলাকায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন।

ইসা ﷺ যখন বনি ইসরাইলকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন তারা মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে প্রথম দল ছিল 'ফারিসি ফিরকা', যারা তালমুদকে ইলমে ওহি ও আলিমদের কথাকে নবিদের বাণীর সমপর্যায়ের দলিল ও হুজ্জত মনে করত। ফারিসিদের আকিদা ছিল বোখতে নসরের হামলার পূর্বে আগমনকারী নবিদের কথা শরিয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তার পরের নবিদের কথা হুজ্জত নয়। তাদের এমন আকিদাও ছিল যে, নবিরা জীবিত থাকা সত্ত্বেও আলিমদের অনুসরণ করা সর্বাবস্থায় আবশ্যক। কোনো আলিম যদি ডান হাতকে বাম হাত বলে, তাহলে তার কথা চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে এবং তাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, তার সাথে তর্কও করা যাবে না।[১৯]

এই ফিরকার উত্থানের মূল কারণ ছিল, তারা শাসকদের বিরোধিতা করত না এবং এই আলিমরা সর্বদা শাসকদের পক্ষেই ফতোয়া দিত। ফারিসি ফিরকার লোকেরা যদিও মাসিহুল্লাহর অপেক্ষায় ছিল; কিন্তু যখন ইসা ﷺ নিজেকে নবি ও মাসিহ ঘোষণা করেন, তখন এই ফিরকার অনুসারীগণই ইসা ﷺ-এর সবচেয়ে কঠিন বিরোধিতা শুরু করে। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রতীক্ষিত মাসিহ দাউদ ﷺ-এর বংশ থেকে আসবে। ইসা ﷺ-এর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র এই ফিরকার লোকেরাই করেছিল। এদের বিরোধিতার মূল কারণ হলো, ইসা ﷺ-এর দাওয়াতের ভিত্তিই ছিল তালমুদের বিরোধিতা ও ফারিসি আলিমদের রদ করা।

দ্বিতীয় দল ছিল 'সাদুকি ফিরকা' (Sadducees)। তারা ছিল অনেকটা ধর্মহীনদের মতো, যারা প্রতিদান ও সাজা এই দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করত। তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষ ভালো-খারাপ যেই কাজই করুক, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই দুনিয়াতেই সব প্রতিদান দিয়ে দেবেন। এই দল তালমুদকে ইলমে ওহি হিসেবে গণ্য করত না এবং এটাকে সম্মান করত না। এই দল মাসিহের আকিদাকেও বিশ্বাস করত না। শুরুতে তালমুদের বিরোধিতার কারণে তারা ইসা ﷺ-এর দাওয়াতের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের অন্যান্য বিশ্বাসের কারণে ইসা ﷺ-এর বিরোধিতা শুরু করে।

---

১৯. এরা সেই সমস্ত ভ্রান্ত আলিম ছিল, যাদের অনুসরণে বনি ইসরাইল নবিদের মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হত্যাও করেছে। এখানে সাধারণ পাঠক যেন উম্মতে মুহাম্মাদির আলিমদের এদের সাথে তুলনা না করে। কেননা, আল্লাহর নবি ﷺ-এর অফাতের পর আলিমরাই নববি উত্তরাধিকার সামলিয়ে রেখেছেন এবং তাদের মেহনতের ফলেই আজ দ্বীন সংরক্ষিত। তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক। অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যেও কিছু আলিম গোমরাহি ছড়াচ্ছে, যারা মূলত বনি ইসরাইলের আলিমদেরই অনুকরণ করছে।

তৃতীয় দল 'কাতিবিন ফিরকা'। তাদের কাজ ছিল তাওরাত ও তালমুদ লিপিবদ্ধ করা। এই লোকদেরকে বনি ইসরাইলে অনেক সম্মানিত মনে করা হতো; যার ফলে তখনকার সময়ে বাদশাহরাও তাদের অনেক বেশি সম্মান করত। তারা ছিল বনি ইসরাইলের লেখাপড়া জানা শিক্ষিত স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তারাও ইসা ﷺ-এর সাথি হয়নি।

চতুর্থ দল ছিল 'জিয়ালুটস' (Zealots)। তারা ছিল কিছুটা উগ্রপন্থী দল। ফারিসিদের সাথে তাদের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা, তিনি ব্যতীত কারও হুকুমত গ্রহণযোগ্য নয়। তারা মাসিহের অপেক্ষায় তো অবশ্যই ছিল; কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল মাসিহের অপেক্ষায় বসে থাকা যাবে না। বরং আল্লাহ তাআলার হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। এই দল ২২ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, যার ফলশ্রুতিতে রোমানরা জেরুজালেমের ওপর হামলা করে তা ধ্বংস করে দেয়। তারা সেখান থেকে ইহুদিদের এমনভাবে বহিষ্কার করে, যার ফলে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত তারা আর সেখানে ফিরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই দলটিও ইসা ﷺ-এর বিরোধিতা করত; কারণ তাদের দাবি অনুযায়ী তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে নরম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চম দল ছিল 'ইসেনি ফিরকা' (Essenes)। এরা সুফিদের মতো জীবনযাপন করত। তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনেক সুসংহত ছিল। তারা ছিল ইবাদতগুজার ও সৃষ্টির সেবায় অনেক সচেষ্ট। তারা ছিল খুবই আতিথেয়তাপরায়ণ। তাদের জীবনযাপন ছিল অনেকটাই সাদাসিধা। এই দলের লোকেরা ইসা ﷺ-এর দাওয়াত সবচেয়ে বেশি কবুল করেছিল এবং তাঁর সাথি হয়েছিল।

যখন ইসা ﷺ বনি ইসরাইলের মাঝে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তখন প্রায় পুরো বিশ্ব রোমান মুশরিকদের কব্জায় ছিল। ফিলিস্তিনও তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। যেখানের বাদশাহ বাহ্যিকভাবে ইহুদি হলেও বাস্তবে রোম প্রশাসনের অনুগত ছিল। ফারিসি ফিরকার আলিমদের পরামর্শে ও রাজনৈতিক বিরোধিতার ভয়ে রোমান প্রশাসন ইসা ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। আল্লাহ তাআলা তখন ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেন। রোমান সেনারা যখন তাঁর গৃহের নিকটে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-এর এক সহকারীকে তাঁর মতো বানিয়ে দেন, যাকে রোমানরা গ্রেফতার করে শূলিতে চড়ায়। এক বর্ণনামতে, এই ব্যক্তি ছিল সেই হাওয়ারি, যিনি আখিরাতের বিনিময়ে ইসা ﷺ-এর জন্য কুরবান হতে প্রস্তুত ছিলেন। আরেক বর্ণনামতে, সে ছিল সেই হাওয়ারি, যে দুনিয়ার সম্পদের লোভে ইসা ﷺ-এর খবর রোমানদের কাছে পৌঁছিয়েছিল। ইসা ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠিয়ে নেন এবং তাঁর পরিবর্তে রোমানরা তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিকে শূলিতে চড়িয়ে দেয়। সেই সময় থেকে এখনো ইহুদিদের দাবি হচ্ছে, ইসা ﷺ ছিলেন মিথ্যা নবুওয়াত ও মিথ্যা মাসিহের দাবিদার, যাকে হত্যা করা আবশ্যক।

ইহুদিদের এই সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয়বার আরেক বাদশাহ চাপিয়ে দেন, যে ছিল রোমান-সম্রাট টাইটাস। সে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিদের রোমানবিরোধী আন্দোলন দমানোর জন্য নিজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয়বার জেরুজালেম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এইবার দেশান্তর হওয়ার পর ইহুদিরা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আর উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। মুফাসসিরদের রায় মুতাবিক এটা ছিল তাদের ওপর আপতিত দুই ফাসাদের দ্বিতীয় ফাসাদ, যার আলোচনা সুরা বনি ইসরাইলের শুরুর আয়াতগুলোতে করা হয়েছে।[২০] ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিন থেকে বনি ইসরাইলকে বের করে দেওয়ার ঘটনার মাধ্যমে ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস শেষ হয়ে নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়।

বনি ইসরাইল কেন গোমরাহ হয়েছিল?

বনি ইসরাইলের নতুন ইতিহাসের দিকে যাওয়ার পূর্বে আমাদের জানা উচিত বনি ইসরাইলের গোমরাহির মূল কারণগুলো কী ছিল। আলিমদের মত অনুযায়ী বনি ইসরাইলের গোমরাহির মূল উৎস ছিল নবিদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং গাইরুল্লাহর কথাকে ওহির নির্দেশনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। সুলাইমান ﷺ-এর পর ইসরাইলি সমাজে শিরক, বিদআতসহ বিভিন্ন চারিত্রিক অধঃপতন ও সমস্যা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তাদের সংশোধনের জন্য একের পর এক নবি প্রেরণ করেন। যদি আমরা নবিদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, সেই নবিদের দাওয়াত চারটি মূল বিষয় নিয়ে ছিল। এক. আল্লাহ তাআলার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা। দুই. উলামায়ে সু'দের আনুগত্য থেকে বিরত থাকা। তিন. বনি ইসরাইলের শিরক-বিদআতের বিরোধিতা। চার. বনি ইসরাইলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া চারিত্রিক সমস্যা; যেমন : মিথ্যা, হিংসা, ঘৃণা, জিনা, সুদ ও জুলুম থেকে বাধা দেওয়া।

প্রথম কারণ : আল্লাহর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা

বনি ইসরাইলের ইতিহাসে আল্লাহ তাআলার সাথে চুক্তি ভঙ্গের অনেক ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিরআওনের কবল থেকে নাজাত দিয়ে তাদের জন্য তাওরাত নাজিল করেছেন, তা সত্ত্বেও তারা বাছুরের পূজা শুরু করে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মান্না-সালওয়া পাঠিয়েছেন; কিন্তু তারা অন্যান্য খাবারের লোভ করে। পরবর্তী সময়ে

২০. মুফাসসিরদের মধ্যে আল্লামা আবুল লাইস সমরকন্দি, আল্লামা বাগাবি, আল্লামা ইবনে আদিল, আল্লামা আলুসি, ইবনে আশুর এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এর উৎস হচ্ছে কালবির রিওয়ায়াত, যেমনটা সমরকন্দি ﷺ তাফসিরে বাহরুল উলুমে আলোচনা করেছেন। আরবিতে টাইটাসকে তাইতুস অথবা তাতবুস বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শহর দখল করার জন্য ইসতিগফার পড়তে পড়তে শহরে প্রবেশের আদেশ দেন; কিন্তু তারা ইসতিগফারের শব্দ পরিবর্তন করে অহংকারের সাথে প্রবেশ করে। যখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর জিহাদ আবশ্যক করেন এবং ফিলিস্তিন বিজয়ের আদেশ দেন, তখন তারা এই কথা বলে অস্বীকার করে যে, সেখানে অত্যাচারী গোত্র রয়েছে এবং আমরা তাদের সাথে লড়াইয়ের ক্ষমতা রাখি না। যখন তালুতকে সিপাহসালার নির্ধারণ করে বলা হলো, তাকে মান্য করো, তখন তারা তাকে অপছন্দ করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া শুরু করে। যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক কোষ পানি পানের অনুমতি দেন, তখন তারা পেটভরে পান করে।

সুলাইমান ﷺ-এর পর যখন বনি ইসরাইলের মধ্যে অনেক নাফরমানি ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের জন্য ধারাবাহিক নবি পাঠাতে থাকেন, যাঁরা তাদের ইসলাহের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বনি ইসরাইল সেই নবিদের কথা মানার পরিবর্তে উলামায়ে সু'দের কথা মান্য করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে শাস্তিস্বরূপ খ্রি.পূ. ৪শ বছর পূর্বে বোখতে নসরকে বনি ইসরাইলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যে তাদেরকে গোলামে পরিণত করে। বনি ইসরাইল নবির কাছে আবারও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ওয়াদা করে, তখন আল্লাহ তাআলা জুলকারনাইনের মাধ্যমে তাদেরকে বাবেল থেকে নাজাত দেন। কিন্তু ফিলিস্তিনে ফিরে আসার পর তারা পুনরায় আল্লাহ তাআলার নাফরমানি শুরু করে। এমনকি ইসা ﷺ-এর চরম বিরোধিতা করে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তারা করে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে (مَغْضُوب) বা গজবগ্রস্ত ঘোষণা দেন।

দ্বিতীয় কারণ : নবিদের পরিবর্তে উলামায়ে সু'দের আনুগত্য

বনি ইসরাইলের গোমরাহির একটি বড় কারণ ছিল নবিদের অনুসরণের পরিবর্তে খাহিশাতপূজারি ভ্রষ্ট আলিমদের আনুগত্য করা। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সুরা তাওবার তাফসিরে লিখেছেন, বনি ইসরাইল তাদের আলিমদের আনুগত্য করে তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছিল এবং তাদের সমস্ত কথাকে ওহির সমপর্যায়ের গণ্য করে অনুসরণ করত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে সেই ভ্রান্ত আলিমরা তাদের কাছে নবিদের থেকেও উঁচু মর্যাদা অর্জন করেছিল? এর কারণ দুটো, প্রথম কারণ দ্বীনের মূল উৎস পরিবর্তন করে দেওয়া। এবং দ্বিতীয় কারণ উলামায়ে সু'দের পক্ষ থেকে নবিদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটানো।

বনি ইসরাইলের কাছে আল্লাহর কিতাব ছিল তাওরাত, যা একটি পরিপূর্ণ শরিয়াহ। বনি ইসরাইলের দ্বীনের দ্বিতীয় উৎস ছিল নবিগণ এবং তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সহিফা ও কিতাবসমূহ। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় সেগুলো তাঁদের ওপর নাজিল করেছেন, যার মধ্যে জাবুর ও ইনজিল অর্ন্তভুক্ত। তখন এগুলো ব্যতীত দ্বীনের

আর কোনো উৎস ছিল না। বনি ইসরাইল থেকে আল্লাহ তাআলার কাম্য এটাই ছিল যে, তারা সেই কিতাব ও সহিফাগুলোর শিক্ষার ওপর আমল করবে। বোখতে নসরের গোলামির সময় বনি ইসরাইল তাওরাতকে হিফাজত করতে পারেনি। ইহুদিদের বর্ণনা অনুযায়ী বোখতে নসর তাওরাতের সমস্ত কপি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ফলে বাবেলে গোলামির জীবন অতিবাহিত করার সময় কিতাবুল্লাহ তাদের সামনে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে উজাইর ﷺ আবার তাওরাতকে একত্রিত করেন। তাঁর এই কাজের ফলে কিছু ইহুদি তাঁকে আল্লাহর সন্তান ডাকা শুরু করে।

যখন তাওরাত তাদের সামনে অনুপস্থিত ছিল, তখন দ্বীনের উৎসের মধ্যে আরও একবার পরিবর্তন সাধন হয়। ভ্রান্ত আলিমরা সুযোগ পেয়ে যায় এবং তারা মানুষকে ওহির মূল শিক্ষার পরিবর্তে নিজেদের পক্ষ থেকে বানানো কথা শিক্ষা দেওয়া শুরু করে। দ্বীনের উৎস ছিল তাওরাত, যা আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-কে তুর পাহাড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাওরাত না থাকায় দ্বীনের এই উৎসের আলোচনার পরিবর্তে আলিমরা নিজেদের বানানো কাহিনি বর্ণনা করতে শুরু করে। তাদের তালমুদকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে কাহিনি বর্ণনা করে, তা ছিল এমন, 'মুসা ﷺ যখন আল্লাহ তাআলার আহ্বানে তুর পাহাড়ে যান, তখন বনি ইসরাইলের বড় বুজুর্গরাও আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎলাভের ইচ্ছা পোষণ করেন। ফলে মুসা ﷺ তাদের দশজনকে তুর পাহাড়ে নিয়ে যান। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও হিদায়াত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইলম দান করেন। এই ইলম কখনোই লিখিত হয়নি; বরং তা শুধু তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। এই ইলম তারা পরবর্তীদের মুখস্থ করায়, যার ধারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসছিল। বোখতে নসরের গোলামির সময় সেই ইলমকে লিপিবদ্ধ করার নামে ভ্রান্ত আলিমরা তালমুদ লিখে দেয়; যাতে তা ধ্বংস না হয়ে যায়। আর এভাবেই দ্বীনের উৎস একের জায়গায় দুটি হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি তাওরাত ও দ্বিতীয়টি তালমুদ। এটাই ছিল বনি ইসরাইলের সবচেয়ে বড় গোমরাহি। তালমুদ কোনো ওহি বা দ্বীনের উৎস ছিল না; বরং তা ছিল উলামায়ে সু'দের মনগড়া বিধানাবলি, যা তারা বনি ইসরাইলের সামনে দ্বীনের উৎস হিসেবে পেশ করেছিল।

অপরদিকে সেই ভ্রান্ত আলিমরা তালমুদ রচনার অপরাধ থেকে আরও অগ্রসর হয়ে নবিদের কাজের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করে। এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল নবিদের সাধারণ মানুষের স্তরে নিয়ে আসা, যারা ভুল ও গুনাহ করতে পারে (নাউজুবিল্লাহ)। কারণ, যদি নবিদের গুনাহ ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ওহির মধ্যেও ভুল হতে পারে। তাই আলিম ও নবির মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। এই প্রোপাগাণ্ডাকে প্রমাণ করার জন্য নুহ ﷺ-কে শরাব পানকারী বলে প্রচার করে (নাউজুবিল্লাহ), লুত ﷺ-কে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দেয় (নাউজুবিল্লাহ), ইয়াকুব ﷺ-কে নিজের ভাইকে ধোঁকা দেওয়ার মিথ্যা অপবাদ দেয় (নাউজুবিল্লাহ), ইউসুফ, দাউদ, সুলাইমান ﷺ-এর নামে মিথ্যা প্রেমকাহিনি প্রচার করে (নাউজুবিল্লাহ)। এমনকি সেই ইহুদিদের আলিমদের দাবি অনুযায়ী সুলাইমান ﷺ বিবির মহব্বতে মূর্তিপূজা শুরু করেন (নাউজুবিল্লাহ)। এগুলো সব

মিথ্যা অভিযোগ ও প্রোপাগাণ্ডা। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল তাওরাত ও নবিদের সম্মান কমিয়ে ভ্রান্ত আলিমদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

উলামায়ে সু'দের এই চক্রান্ত সফল হওয়ার পর আস্তে আস্তে তালমুদ তাওরাত থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া শুরু হয় এবং নবির স্থান ভ্রান্ত আলিমরা দখল করে নেয়। তখনকার সময়ে নাজিলকৃত কিতাব ও সহিফাগুলো অধ্যয়ন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বোখতে নসরের হামলার কিছু কাল পূর্ব থেকে পরের সকল নবির মূল দাওয়াত সেই আলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। এ ছাড়াও সেই কিতাবগুলো অধ্যয়নের পর এমনটাও অনুভূত হয় যে, বনি ইসরাইলের নবিগণ ও উলামায়ে সু'দের মধ্যে এক ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব চলমান ছিল। জাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ইসা ﷺ-এর জমানায় এই দ্বন্দ্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। তখন ভ্রান্ত আলিমরা নবিগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাঁদের হত্যা পর্যন্ত শুরু করে। ভ্রান্ত আলিমদের অধীনে বনি ইসরাইল যেসব অপরাধ করেছিল, তার আলোচনা কুরআনে বিস্তারিত এসেছে। যেমন হককে গোপন করা, হককে বাতিলের সাথে মিলিয়ে ফেলা, নবিদের হত্যা করা ও কিতাবুল্লাহর মধ্যে বিকৃতি ঘটানো ইত্যাদি। এগুলো ছিল এমন অপরাধ, যার মাধ্যমে সত্য দ্বীনকে মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন করে রাখা হয়। ফলে সত্যপন্থী আলিমরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ভ্রান্ত আলিমরা বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলার কিতাব ও নবিদের নির্দেশনা ত্যাগ করে তালমুদের বানানো বিধান পালনের ফলে তারা সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে এক নতুন ধর্মের দিকে চলতে শুরু করে, যাকে আজ ইহুদিবাদ বলা হয়।

তৃতীয় কারণ : বনি ইসরাইলের মধ্যে শিরক ও বিদআতের প্রাদুর্ভাব

বনি ইসরাইলের গোমরাহির তৃতীয় কারণ ছিল তাদের মধ্যে শিরক ও বিদআত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া। আর তাদের মাঝে শিরক-বিদআত ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল সত্যপন্থী আলিমদের পরিবর্তে ভ্রান্ত আলিমদের আনুগত্য। এর ফলে সমাজে এমন সব সভ্যতা-সংস্কৃতি চালু হয়, যার সাথে আল্লাহর বিধান ও নবিদের দাওয়াতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। যা বনি ইসরাইলকে আস্তে আস্তে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকারের শিরক ছিল আল্লাহ তাআলার সত্তা ও সিফাতের মধ্যে শিরক। যেমন উজাইর ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার সন্তান বলা। আরও কিছু ভয়াবহ শিরক ছিল, যা ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের থেকে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে ফিলিস্তিন বিজয় করে সেখানে বসবাসকারী জাতিকে পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বনি ইসরাইল তাদের হত্যা না করে ছেড়ে দেয়, অতঃপর সময়ের সাথে সাথে সেই জাতির সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে তাদের শিরকগুলো গ্রহণ করে নেয়।

ফিলিস্তিনের পূর্বের অধিবাসীরা ছিল মুশরিক, যাদের সবচেয়ে বড় মূর্তির নাম ছিল আইল ও তার স্ত্রীর নাম আশিরা। এদের থেকে আরও মূর্তি জন্ম নেয়, যেগুলোকে অনেক কাজের দায়িত্বশীল মনে করা হতো। কোনোটা রিজিকের মূর্তি ও কোনোটা বিপদদাতা ইত্যাদি (নাউজুবিল্লাহ)। এগুলোর মধ্যে বা'ল (Baal) মূর্তিটি সবচেয়ে শক্তিশালী হিসেবে গণ্য হতো, যার বিবির নাম ছিল আস্তারাত (Ashtoreth)। বনি ইসরাইলের ইতিহাসে এই কথা স্বীকৃত যে, তারা পরিপূর্ণভাবে বা'ল ও আস্তারাত পূজায় লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের জন্য **ইলইয়াস** ﷺ-কে প্রেরণ করেন এবং উনার মূল দাওয়াত ছিল বা'ল পূজার বিরুদ্ধে।[২১]

শিরক ও কুফরের আরেকটি প্রকার বনি ইসরাইলের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে। সেটা হলো জাদু শিক্ষা ও নিজেদের স্বার্থে তা ব্যবহার করা। এই সমস্যা অনেক ব্যাপকতা লাভ করে, যার আলোচনা কুরআনের সুরা বাকারাতে এসেছে। এই জাদু দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটাত।[২২]

---

২১. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ - أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

'নিশ্চয় ইলইয়াস ছিল রাসুল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, "তোমরা কি ভয় করো না? তোমরা কি বা'ল দেবতার ইবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে।"' (সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১২৩-১২৫)

২২. দেখুন, সুরা বাকারার ১০২ নং আয়াত।

ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসসমূহ

ভ্রান্ত আলিমরা যখন বনি ইসরাইলের দ্বীনের উৎস পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়, তখন তারা দ্বীনের মধ্যে নিজেদের বানানো বিশ্বাস ছড়ানো শুরু করে। তারা ইহুদিদের নতুন প্রজন্মকে বলা শুরু করে যে, ইহুদিরাই আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত জাতি এবং অন্যদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ও উত্তম। তাই দুনিয়াকে শাসন করার অধিকার শুধু ইহুদিদের। উলামায়ে সু'রা নতুন প্রজন্মকে আরও বিশ্বাস করায় যে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ড আল্লাহ তাআলা চিরদিনের জন্য বনি ইসরাইলকে দিয়ে দিয়েছেন। এই ভূমিতে শুধুই তাদের অধিকার রয়েছে। আর যারা তাদের থেকে এই ভূমি ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা হচ্ছে জালিম। তাই এই ভূমি ফিরিয়ে আনা তাদের সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ। তারা নতুন প্রজন্মকে আরও শিক্ষা দেয় যে, তাদের মূল ইবাদতগৃহ হচ্ছে হাইকালে সুলাইমানি। যে হাইকালের ওপর মুসলিমরা মাসজিদুল আকসা বানিয়ে রেখেছে। সেটাকে ধ্বংস করে হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করা ইহুদিদের ইমানের অংশ।

উলামায়ে সু'রা আসমানি কিতাব থেকে নবিদের সুসংবাদগুলো দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে বলে যে, বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় তাদের হাতে আসবে এবং হাইকালে সুলাইমানি দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হবে। যার পর তাদের হাতে সুলাইমান ﷺ-এর মতো বৈশ্বিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। যার প্রেক্ষিতেই নতুন প্রজন্ম এই বিশ্বাসকে ধারণ করে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তারা নবিদের আনীত কিতাব তাওরাত, জাবুর, ইনজিলসহ সহিফাগুলোর হিদায়াত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ফলে এখন শুধু তাদের কাছে রয়েছে বনি ইসরাইলের বংশীয় অধিকারের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনের ভূমির মিথ্যা দাবি, মিথ্যা মাসিহের দাবি, মিথ্যা হাইকালে সুলাইমানির দাবি এবং সুলাইমান ﷺ-এর মতো বৈশ্বিক ক্ষমতার স্বপ্ন। এটাই আজকের ইহুদিবাদ ও তাদের ধর্ম, যার সাথে নবিদের শিক্ষা ও আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত হিদায়াতের দূরতম সম্পর্ক নেই।

এখন আমরা ইহুদিদের মিথ্যা বিশ্বাসগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করব :

- আল্লাহ তাআলার প্রিয় জাতি
- অ-ইহুদিদের ব্যাপারে গোয়েম বিশ্বাস
- প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস
- দানিয়েলের দুআ ও মহান লক্ষ্য
- ইলিয়াসংক্রান্ত বিশ্বাস
- মাসিহসংক্রান্ত বিশ্বাস
- হাইকালে সুলাইমানি-সংক্রান্ত বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলার প্রিয় জাতি

ইহুদিরা নিজেদের পুরাতন ইতিহাস থেকে প্রথম যে বিশ্বাস গ্রহণ করেছে তা হলো, আল্লাহ তাআলা সমস্ত বনি আদমের মধ্যে শুধু বনি ইসরাইল বংশকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন কোনো শর্ত ছাড়াই। অর্থাৎ বনি ইসরাইল যা-ই করুক আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও বাছাইকৃত জাতি হিসেবেই থাকবে। এই দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা শুধু ইহুদিদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, কেননা তারা নবিদের সন্তান। এই দাবি প্রমাণের জন্য তারা তাদের ওপর নাজিল হওয়া আল্লাহ তাআলার নিয়ামতগুলো নিয়ে আলোচনা করে। যেমন তাদেরকে ফিরআওন থেকে নাজাত দিয়েছেন। সিনাই মরুতে মান্না-সালওয়া পাঠিয়েছেন। মরুতে পানির ব্যবস্থাস্বরূপ বারোটি ঝরনা প্রবাহিত করেছেন। পুনরায় তাদেরকে ফিলিস্তিনের বাদশাহি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যাতে সেখানে বসবাস করতে পারে। যখনই ইহুদিদের সামনে কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাদের জন্য কোনো মাসিহ প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের সেই সমস্যা সমাধানের অসিলা হয়েছেন। সেই মাসিহদের মধ্যে রয়েছেন মুসা ﷺ, তালুত, দাউদ ﷺ, বাদশাহ জুলকারনাইন এবং সর্বশেষ আরেকজন মাসিহ রয়েছে, যাকে তারা মাসিহ দাজ্জাল বলে ডাকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের কয়েক জায়গায় তাদের এই ভুল বিশ্বাসের ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৩] আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে নিজ নিয়ামত স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, এই ইহসান বনি ইসরাইলের সেই সমস্ত মুসলিমের জন্য ছিল, যারা নবিদের আনুগত্য করত। যখন তাদের থেকে কোনো ভুল প্রকাশিত হতো, তখন তারা গুনাহ থেকে ইসতিগফার করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে লেগে যেত। আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামতের কথা বর্ণনার পাশাপাশি বনি ইসরাইলের অবাধ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে নিয়ামতের অস্বীকার, জিহাদ ত্যাগ করা, নবিদের নাফরমানি, উলামায়ে সু'দের আনুগত্য, নবিদের হত্যা করা, কিতাবুল্লাহতে বিকৃতি ও হক গোপন করার কারণে তাদেরকে অপরাধীও সাব্যস্ত করেছেন।

আলিমরা বলেছেন, আল্লাহ তাআলার এই ইহসান ও নিয়ামতগুলো ছিল বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা নবিদের আনুগত্যকারী মুসলিম, তাদের জন্য। এগুলো কাফির ইহুদিদের জন্য নয়, যারা প্রথমে ইসা ﷺ-কে অস্বীকার করেছে, অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকার করেছে। যার মধ্যে আজকের সমস্ত ইহুদি অর্ন্তভুক্ত। কিন্তু তারা গত দুইশ বছর পূর্ব থেকে

---

23. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।" আপনি বলুন, "তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"' (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৮)

নিজেদের এই বিশ্বাসগুলো খ্রিষ্টানদের মাঝেও প্রচার শুরু করে এবং তাদের অধিকাংশকে এটা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, ইহুদিরাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার একমাত্র নির্বাচিত জাতি এবং ফিলিস্তিনের ওপর শুধু তাদেরই অধিকার রয়েছে।

অ-ইহুদিদের ব্যাপারে গোয়েম বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত ও নির্বাচিত জাতি হওয়ার বিশ্বাসের ফলে ইহুদিদের ধারণা হচ্ছে সকল মানুষ দুই প্রকার, ইহুদি ও অ-ইহুদি। অ-ইহুদিদের জন্য তাদের কিতাবে 'গোয়েম' (Goyim) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গোয়েম' একটি ইবরানি শব্দ, যার অর্থ নিচু শ্রেণির মানুষ। শব্দটিকে কখনো গোলাম ও কখনো জন্তুর জন্যও ব্যবহার করা হয়। তারা সমস্ত মানুষের থেকে উত্তম হওয়ার ফলে অন্যদের 'গোয়েম' উপাধি দিয়ে থাকে এবং নিজেদের থেকে নিম্নশ্রেণির মনে করে। এই আকিদা অনুযায়ী বাকি সমস্ত মানুষকে মূলত বনি ইসরাইলের খিদমতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই ইহুদিদের জন্য তাদের ওপর যেকোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বৈধ। বিশেষ করে তাদের থেকে বিভিন্নভাবে মোটা অংকের সুদ উসুল করা; যদিও তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী সুদি কারবার হারাম। এমনিভাবে 'গোয়েমদের' জান-মাল ও সম্মানসহ সবকিছু দখল করা ইহুদিদের জন্য বৈধ।

প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস

ইহুদিদের তৃতীয় আকিদা হচ্ছে, প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই ভূমি, যার প্রতিশ্রুতি বনি ইসরাইলকে দেওয়া হয়েছে। ইহুদিদের আকিদা হচ্ছে, ফিলিস্তিন বিশেষ করে জেরুজালেমকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই এই ভূমিতে শুধু তাদেরই অধিকার রয়েছে। খ্রিষ্টান ও মুসলিম যারা তাদের নিকট 'গোয়েম', তারা ফিলিস্তিনে অবৈধ দখল করে রেখেছে, আর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বর্তমানের ইহুদিরা 'গ্রেটার ইসরাইল' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে।

ইসরাইলি সাম্রাজ্যের সীমানা কী হবে? এর উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের দ্বিতীয়বার বনি ইসরাইলের ইতিহাসের ওপর নজর বুলাতে হবে। বনি ইসরাইলের শুরু ইয়াকুব ﷺ থেকে হয়েছে। তাঁর মূল বাসভূমি ছিল ফিলিস্তিনের কিনান। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজ বংশধরসহ সন্তান ইউসুফ ﷺ-এর হুকুমতের সময় মিশরে আবাদ হয়ে যান। পুনরায় তারা মুসা ﷺ-এর যুগে মিশর থেকে বের হয়ে সিনাই মরুতে অবস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর তাঁর অফাতের পর ইউশা ﷺ-এর সময় তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। অতঃপর বোখতে নসরের হাতে দেশান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে ইরাকের এলাকা ইরান, শাম ও জাজিরাতুল আরবে ছড়িয়ে পড়ে। তেমনিভাবে টাইটাসের সময় এবং তারপর খ্রিষ্টান ও ইসলামের যুগেও ইহুদিরা বিভিন্ন এলাকায় দেশান্তর হয়।

আজকের ইহুদিরা সেই সব এলাকাকে বিশাল ইসরাইলি সাম্রাজ্যের অংশ মনে করে, যেখানে তারা বিভিন্ন সময় বসবাস করত। তাদের স্লোগান হচ্ছে, 'নীল থেকে ফোরাত ও খাইবার থেকে কিনান পর্যন্ত এলাকা তাদের ভূমি।' যদি কেউ বর্তমানের ইসরাইলের পতাকার দিকে লক্ষ করেন, তাহলে প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। সেখানে ওপরে নিচে দুটা নীল দাগ ও মধ্যে ছয় কোণবিশিষ্ট তারা রয়েছে। দুই নীল দাগ হচ্ছে, নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত অঞ্চল, যা বিশাল ইসরাইল রাজ্যের সীমানা। ছয় কোণবিশিষ্ট তারকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটা দাউদ ﷺ-এর নিশানা, যা তাঁর পতাকাতে ছিল। তারা এটাকে 'ডেভিড স্টার' (David Star) বলে থাকে। বর্তমানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশাল ইসরাইলি সাম্রাজ্যের ওপর দাউদ ﷺ-এর বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসা ﷺ-এর সাথে কৃত ফিলিস্তিন ভূমির ওয়াদা বনি ইসরাইলের অযোগ্যতা, চরিত্রহীনতা ও ভ্রষ্ট বিশ্বাসের কারণে যদিও অনেক পরে অর্জিত হয়েছিল—তবে তা ফিরে পাওয়ার পরেও তারা সেটাকে সংরক্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু আজ তারা সময়ের বিবর্তনে ও তাদের মনগড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাসকে সত্য বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত। তাদের সমস্ত শক্তি ও ধোঁকার মাধ্যমে তারা এই বিশ্বাস বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ইলিয়াসংক্রান্ত বিশ্বাস

ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে আসার সফর 'ইলিয়া' (Alizah) নামে প্রসিদ্ধ। পুনরায় জেরুজালেমে ফিরে আসার সফরকে তারা অনেক কঠিন যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করে। এই সফরের প্রথম ধাপ হচ্ছে, পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়া এবং দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, পুরো দুনিয়ার ওপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা। ইহুদিদের পুরাতন কিতাবগুলোর মধ্যে এই সফরের নকশা পাওয়া যায়। সেখানে যে সমস্ত এলাকা তার সীমার ভেতর দেখানো হয়েছে, সেগুলোর মোড় উসমানি খিলাফতের দিকে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটেন রাজ্যের সাহায্যে ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদিদের স্থানান্তরকে তারা ইলিয়া মনে করে থাকে।

মাসিহসংক্রান্ত বিশ্বাস

মাসিহ বলা হয়, সেই ব্যক্তিকে, যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোনো সময়ে বিশেষ কোনো লক্ষ্যে প্রেরণ করেন, যিনি আল্লাহ তাআলার হুকুমে মানুষকে সাহায্যের জন্য কাজ করেন। ইহুদিরা তাদের কিতাবে কয়েকজন মাসিহের আলোচনা উল্লেখ করেছে, যারা

পূর্বে গত হয়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী শুধু একজন মাসিহ বাকি রয়েছেন, যিনি এসে তাদের হাতে সুলাইমান ﷺ-এর মতো সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। ইহুদিদের এই মাসিহ মূলত দাজ্জাল, যাকে আসল মাসিহ ইসা ﷺ হত্যা করবেন। ইহুদিরা ইসা ﷺ-কে মাসিহ মানতে অস্বীকার করে, কারণ তিনি দাউদ ﷺ-এর বংশ থেকে ছিলেন না। ইহুদি আলিমরা বলত, মাসিহ দাউদ ﷺ-এর বংশ থেকে আসবে। আর এটা তারা নিজ থেকে বানিয়ে বলত, বাস্তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম এমন কোনো কথা বলেননি।

খ্রিষ্টানরা ইসা ﷺ-কে মাসিহুল্লাহ মনে করে এবং দ্বিতীয়বার তিনি দুনিয়াতে আসার ওপর বিশ্বাসও রাখে। কিন্তু তারা এই বিশ্বাস করে, ইসা ﷺ-এর পুনরায় প্রত্যাবর্তন শুধু খ্রিষ্টানদের মধ্যে হবে, মুসলিম বা ইহুদিদের মধ্যে নয়। তারা বলে, 'তিনি আবার ফিরে এসে সৎ খ্রিষ্টানদের বাছাই করে সাথে নেবেন। ফলে দুনিয়াতে ভালো-খারাপের বিশাল যুদ্ধ হবে, যাকে তারা 'আরমাগেডন' বলে। এই যুদ্ধে সৎ ব্যক্তিরা বিজয়ী হবে এবং ইসা ﷺ দুনিয়াতে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। মুসলিমদের বিশ্বাস হচ্ছে, ইসা ﷺ নিহত হননি; বরং তাঁকে আল্লাহর হুকুমে দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইমাম মাহদির সময়ের শেষ দিকে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি দুনিয়াতে এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং সমস্ত বাতিল দ্বীনকে খতম করে সত্য দ্বীনকে পূর্ণরূপে বিজয়ী করবেন। বর্তমানে ইহুদিরা মাসিহ দাজ্জালের অপেক্ষায় আছে এবং তার সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হাইকালে সুলাইমানি-সংক্রান্ত বিশ্বাস

ইহুদিদের বিশ্বাস অনুযায়ী হাইকালে সুলাইমানি, যা সুলাইমান ﷺ বানিয়েছেন, তা দুবার ধ্বংস হয়েছিল। প্রথমবার বোখতে নসরের হাতে, যা পরে জুলকারনাইনের সময় আবার নির্মিত হয়। দ্বিতীয়বার ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান বাদশাহ টাইটাসের হাতে এবং সেই সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত তা আর নির্মাণ করা হয়নি। তাই বর্তমান ইহুদিদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, হাইকালে সুলাইমানিকে দ্বিতীয়বার নির্মাণ করা। তাদের আরও বিশ্বাস হচ্ছে, হাইকালের দ্বিতীয় নির্মাণ তাদের মাসিহ দাউদ এসে করবেন; কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতি প্রস্তুত করা তাদের দায়িত্ব। এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, তারা যেখানে হাইকাল নির্মাণ করতে চাচ্ছে, সেখানেই মাসজিদুল আকসা নির্মিত রয়েছে। তাই হাইকাল নির্মাণের জন্য মাসজিদুল আকসা ধ্বংস করা আবশ্যক। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র ও মসজিদের নিচে সুড়ঙ্গ করছে; বরং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেও বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছে।

মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী সুলাইমান ﷺ হাইকাল নির্মাণ করেননি; বরং মাসজিদুল আকসাকেই সম্প্রসারণ করেছেন। এই মসজিদ মুসলিমদের প্রথম কিবলা আর হাইকাল একটি মিথ্যা কাহিনি, যা ইহুদিরা মাসজিদুল আকসা ধ্বংসের জন্য তৈরি করেছে।

তাবুতে সাকিনার বিশ্বাস

তাবুতে সাকিনা একটি কাঠের বাক্স। যার মধ্যে এক বর্ণনামতে সেই তাওরাত রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা মুসা ﷷ-কে তুর পাহাড়ে কথা বলার সময় দান করেছিলেন। এ ছাড়াও মুসা ﷷ-এর লাঠি ও মান্না-সালওয়া রয়েছে। এই বাক্স আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। বনি ইসরাইল এটাকে নিজেদের জন্য বরকত ও উত্থানের কারণ মনে করে। এই তাবুত বা বাক্সকে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যা তালুতের বাহিনীকে নিদর্শন হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর বোখতে নসরের সময় দ্বিতীয়বার হারিয়ে যাওয়ার পর উজাইর ﷷ-এর সময় পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু পরে তা আবারও হারিয়ে যায়। ইহুদিদের বিশ্বাস হচ্ছে, মাসিহে দাউদ দাজ্জালের সময় এই বাক্স পুনরায় ফিরে আসবে এবং তা তাদের চিরকালের উত্থানের কারণ হবে।

দানিয়েল ﷷ-এর দুআ ও মহান লক্ষ্য

ইহুদিদের কিতাবে নবিদের সহিফাগুলোর একটি সংকলন রয়েছে। সেখানে থাকা সর্বশেষ সহিফাটি 'কিতাবে দানিয়েল' নামে প্রসিদ্ধ। বনি ইসরাইলের বর্ণনা অনুযায়ী বোখতে নসরের গোলামির সময় দানিয়েল ﷷ ছিলেন তাদের কাছে প্রেরিত সর্বশেষ নবি। বনি ইসরাইলের কাছে দানিয়েল ﷷ-এর প্রসিদ্ধির দুটি কারণ ছিল। একটা হলো তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অনেক দক্ষ ছিলেন অনেকটা ইউসুফ ﷷ-এর মতো। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে শেষ জমানায় সংঘটিতব্য ঘটনাগুলোর বিস্তারিত ইলম দান করেছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাগুলোর 'ভুল ব্যাখ্যা' বনি ইসরাইলের মধ্যে গোমরাহির এক বিশাল দরজা খুলে দেয়।

ইবনে কাসির ﵀ স্বীয় ইতিহাস-গ্রন্থে দানিয়েল ﷷ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবু মুসা আশআরি ﵁ যখন ইরানের তাসতার শহর বিজয় করেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে, এই শহরে একটি লাশ আছে, যাকে মানুষ দানিয়েল ﷷ-এর লাশ মনে করে। এর সাথে সোনা ও রুপার একটি ভান্ডার রয়েছে। আবু মুসা আশআরি ﵁ যখন লাশের জিয়ারত করেন, তখন সেখানে একটি খাজানা, একটি আংটি ও একটি লিখিত সহিফা দেখতে পান। এই ঘটনা উমর ﵁-এর কাছে লিখে পাঠানো হলে তিনি লাশকে দাফন করে খাজানা গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া ও আংটি আবু মুসা আশআরি ﵁-কে দিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সহিফাটি কাব আহবার ﵀ অনুবাদ করেন, যিনি ইসরাইলি রিওয়ায়াতে অনেক পারদর্শী ছিলেন। সেই সহিফায় উম্মতে মুহাম্মাদির নিদর্শন ও তাদের উত্থানের বিস্তারিত আলোচনা ছিল।

ইহুদিদের নিকট প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, বনি ইসরাইল যখন বোখতে নসরের কাছে বন্দী ছিল, তখন দানিয়েল ﷺ-কে তাদের নবি হিসেবে পাঠানো হয়। তারা তখন তাঁর কাছে আবেদন জানায়, যাতে তিনি তাদের মুক্তি ও ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়া এবং হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণের ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেন। তাদের দাবি অনুযায়ী দানিয়েল ﷺ দুআ করেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে সুসংবাদ দেন যে, তাঁর দুআ কবুল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা একজন বাদশাহ পাঠাবেন, যিনি তাদেরকে গোলামি থেকে মুক্তির পাশাপাশি ফিলিস্তিনে যেতে সাহায্য করবেন এবং হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণেও সাহায্য করবেন। অতঃপর দুনিয়াতে সুলাইমান ﷺ-এর মতো তাদের ক্ষমতা একজন মাসিহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। ইহুদিরা তখন দানিয়েল ﷺ-এর সুসংবাদকেই তাদের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয় এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকে। এই লক্ষ্যে তিনটি অংশ রয়েছে :

১- ইহুদিদের বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে যাওয়ার অনুমতি।

২- হাইকালে সুলাইমানি দ্বিতীয়বার নির্মিত হওয়া।

৩- সুলাইমান ﷺ-এর যুগের মতো বৈশ্বিক ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদের শুরু

ইসা ﷺ-এর হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে দুটা নতুন ধর্ম অর্থাৎ ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদ জন্ম নেয়। ইহুদিবাদ ছিল সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত তালমুদের বিধান ও ভ্রান্ত আলিমদের নির্দেশনায় পরিচালিত এক নতুন দ্বীন, যার সাথে মুসা ﷺ-এর দ্বীনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখন ইহুদিরা দানিয়েল ﷺ-এর দুআর ভিত্তিতে একজন মাসিহের অপেক্ষায় রয়েছে, যে তাদের দাবি অনুযায়ী দাউদ ﷺ-এর বংশ থেকে আসবে, যার নেতৃত্বে তারা প্রতিশ্রুত ভূমি দখল করবে, হাইকালে সুলাইমানি পুনরায় নির্মাণ করবে এবং দুনিয়াতে বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে।

অপরদিকে খ্রিষ্টানরাও সেই দ্বীনের ওপর টিকে থাকেনি, যা ইসা ﷺ নিয়ে এসেছেন। তারা এই দ্বীনের মধ্যে তাহরিফ করে এবং সেন্ট পৌল (Saint Paul)-এর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করে পুরো দ্বীনকেই পরিবর্তন করে ফেলেছে।

ইহুদিদের নতুন ইতিহাস

ইহুদিদের নতুন ইতিহাস অনেক জটিল এবং এই ইতিহাস পুরো দুনিয়াতে বিস্তৃত। ইহুদিদের একই সময়ে কয়েকটি যুগের এবং কয়েকটি এলাকার ইতিহাস আছে। যখন তাদেরকে রোমানরা জেরুজালেম থেকে বের করে দিয়েছিল, তখন তারা শাম, ইরাক, জাজিরাতুল আরব, ইয়ামান, পারস্য ও আন্তাকিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে যেহেতু এই এলাকাগুলোতেও রোমানদের কঠিন দখল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই প্রত্যেক অঞ্চলেই তারা নতুন শাসক ও বিপদের মুখোমুখি হয়। আর এই সবই আলাদা আলাদা ইতিহাস। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে রোমান বাদশাহ কনস্টানটাইন (Constantine) যখন খ্রিষ্টান হয়ে যায়, তখন শামে ইহুদিরা নতুন বিপদের মুখোমুখি হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আগমনের পর জাজিরাতুল আরব ও ইয়ামানে ইহুদিরা আবার নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে আরব থেকেও বের করে দেওয়া হয়।

ইসলামের উত্থানের সময় যখন ইসায়িরা পূর্ব ইউরোপে পোপতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন সেখানে ইহুদিরা নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়। এয়োদশ শতাব্দীতে কাফকাজের (ককেশাসের) খিসার জাতি (Khazars)—যারা ইহুদিবাদ গ্রহণ করেছিল—তাতারদের হামলার ফলে সেখান থেকে পলায়ন করে পূর্ব ইউরোপে চলে আসতে বাধ্য হয়; ফলে ইউরোপে ইহুদিদের নতুন ইতিহাস শুরু হয়। তেমনিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন আন্দালুস খ্রিষ্টানরা দখল করে নেয়, তখন মুসলিমদের সাথে ইহুদিরাও সেখান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়; ফলে তখন তারা ইতালি ও উসমানি সালতানাতের দিকে চলে আসে। সর্বশেষ ফরাসি বিপ্লবের পর ইহুদিরা এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। মোটকথা ইহুদিদের ইতিহাস এতগুলো ধাপ পাড়ি দিয়েছে, যা এই কিতাবে আলাদা আলাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তাই আমরা এখানে ইহুদিদের ইতিহাসকে পাঁচটি বড় অংশে ভাগ করে সেগুলোর ধারাবাহিক আলোচনা করব।

- মুশরিক রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা
- খ্রিষ্টান রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা
- ইসলামি সালতানাতে ইহুদিরা
- ইউরোপে ইহুদিরা
- ফরাসি বিপ্লব থেকে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত

মুশরিক রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা যখন ইহুদিদেরকে জেরুজালেম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা শাম, ইরাক, ইরান, মদিনা ও তুর্কি ইত্যাদি এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে। এটা ছিল তাদের অনেক কষ্টের যুগ। তাদের স্বপ্নের ভূমি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদের সাথে রোমানদের আচরণ ছিল অনেক কঠোর। শামে ইহুদিদেরকে দুই দিক থেকে চাপ মোকাবিলা করতে হতো। একদিকে ছিল মুশরিক রোম, অন্যদিকে ইসা ﷺ-এর আনীত সত্য দ্বীনের অনুসারীগণ। ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে সত্য দ্বীনের মধ্যে পৌলের মতবাদ মিশ্রিত হওয়ার পর এই নতুন সৃষ্ট খ্রিষ্টবাদ তখন সত্যপন্থী দ্বীনদার ও ইহুদিদের বিরোধিতা শুরু করে।

সেই যুগেও তাদের ওপর কয়েকবার গণহত্যা চালানো হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার শাস্তির ফলে তখন তারা এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং পুরো দুনিয়াতে লাঞ্ছনার জীবনযাপন করতে থাকে। অথচ সেই সময়ও ভ্রান্ত আলিমরা তাদের পিছু ছাড়েনি। তাদের এই কথা বোঝাতে থাকে যে, তারা আল্লাহ তাআলার শাস্তির কারণে জেরুজালেম থেকে বহিষ্কৃত হয়নি; বরং রোমানদের জুলুমের ফলে এমন হয়েছে। সুতরাং তারা একটি মাজলুম জাতি এবং ফিলিস্তিন ভূমি তাদেরকে চিরকালের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে; তাই তাদের পুনরায় ফিরে যেতে হবে। এই চিন্তা-দর্শন নিয়েই ইহুদিরা আজ পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে।

রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা

ইহুদিরা একদিকে ধারাবাহিক গণহত্যা ও দেশান্তরের শিকার হয়ে অপদস্থতার জীবনযাপন করছিল, অপরদিকে ইসা ﷺ-এর আনীত সত্য দ্বীনের বিপরীতে তাদের চক্রান্তও পুরো দমে চলছিল। তারা ইসা ﷺ-এর সঙ্গীদের মধ্যে একজন চক্রান্তকারী প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে ছিল এক ইহুদি আলিম, যে 'সেন্ট পৌল' নামে পরিচিত। সে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সত্য দ্বীন গ্রহণ করে এবং অগ্রসর হয়ে একসময় হাওয়ারিদের সাথে মিলে দ্বীনের প্রচার করতে থাকে। যখন হাওয়ারিগণসহ সবাই সেন্ট পৌলকে বিশ্বাস করে নেয়, তখন সে সত্য দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি শুরু করে। সে ইসা ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার সন্তান এবং তার থেকে মানবসত্তা বিলুপ্ত হওয়ার বিশ্বাস প্রচার শুরু করে। আস্তে আস্তে ইসা ﷺ-এর আনীত সত্য দ্বীন সেন্ট পৌলের শিরকি বিশ্বাসের স্রোতে হারিয়ে যেতে থাকে। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনের অধ্যায়ে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইহুদিদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল যখন ইসা ﷺ-এর জন্মের তিনশ বছর পরে রোমান-সম্রাট খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কনস্টানটাইন খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার পর ইহুদিদের সামনে পুরো দুনিয়া উলটে যায়। সে ইহুদিদের ওপর ব্যাপকভাবে জুলুম-নির্যাতন শুরু

করে। কেননা, তাদের বিশ্বাসমতে ইহুদিরা প্রভুর সন্তান (নাউজুবিল্লাহ) ইসা ﷺ-কে ঘৃণা করে এবং রোমানদের সাথে মিলে চক্রান্ত করে উনাকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করেছে। রোমের খ্রিষ্টানরা ইহুদিদেরকে খ্রিষ্টান হতে বাধ্য করত এবং যারা খ্রিষ্টান হতে অস্বীকার করত, তাদের হত্যা করা হতো। এটা ইহুদিদের ইতিহাসে কঠিন এক যুগ ছিল।

মুসলিম সম্রাজ্যে ইহুদিরা

ইহুদিদের ওপর খ্রিষ্টানদের এই নির্যাতন সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চলমান ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলামের সূর্য উদিত হয়। আল্লাহর নবি ﷺ মদিনায় হিজরতের সময় সেখানে ইহুদিদের তিনটি গোত্র বনি কুরাইজা, বনি কাইনুকা ও বনি নাজির বাস করত। তারা আল্লাহর নবির আনীত দ্বীনের সত্যতা জানার পরও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাদেরকে গাদ্দারি ও চুক্তি ভঙ্গের কারণে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। অতঃপর উমর ﷺ-এর সময় আল্লাহর রাসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদেরকে পুরো জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়া হয়। যখন উমর ﷺ-এর সময় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়, তখন ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমির নাম ছিল ইলিয়া এবং সেখানে শাসক ছিল রোমান খ্রিষ্টান। বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিষ্টান পাদরিরা খিলাফতের অধীনে জিম্মি হিসেবে থাকাকে গ্রহণ করে নেয়। যখন উমর ﷺ তাদের থেকে শহরের চাবি নেওয়ার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে যান, তখন একটি চুক্তিপত্র লিখেন। যেখানে একটি মূলনীতি ছিল, ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের মতো ইহুদিরা বসবাসের কোনো অনুমতি পাবে না।[২৪]

মুসলিমদের হাতে ফিলিস্তিন বিজয় ছিল ইহুদিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইহুদিদের সামনে তখন খ্রিষ্টানদের পর আরেকটি শক্তিশালী দ্বীন ফিলিস্তিন ভূমির দাবি নিয়ে এসেছে এবং সেই ভূমি দখলও করে নিয়েছে। সেই সাথে খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মাঝে 'ক্রুসেড' নামে যুদ্ধের এক নতুন ধারা শুরু হয়। এই যুদ্ধগুলোতে ইহুদিরা সরাসরি অংশ নিত না। কেননা, তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল না, যার দ্বারা তারা দুটো বড় শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে। তাই তারা চক্রান্তের মাধ্যমে কাজ করতে থাকে এবং এটাই তাদের নতুন ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিরা বড় বড় ষড়যন্ত্র করে। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার চক্রান্তও করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে সফল চক্রান্ত ছিল উসমান ﷺ-এর যুগের এক ইহুদির মাধ্যমে সংঘটিত ফিতনা। সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে উসমান ﷺ-এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাঁর বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করতে থাকে এবং আলি ﷺ-এর ব্যাপারে বিভিন্ন কিছু প্রচার করতে থাকে। আলি ﷺ-কে খিলাফতের অধিক হকদার ও নবি

---

২৪. ইমাম তাবারি ﷺ চুক্তির যে বক্তব্য পেশ করেছেন, সেখানে এই বাক্য ছিল, (ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود)। কোনো ইহুদি তাদের সাথে ইলিয়াতে বসবাস করতে পারবে না।

ﷺ-এর সহকারী হিসেবে প্রচার করতে থাকে। তার এই কার্যক্রম সফল হয় এবং এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে একটি দল উসমান ﷺ-এর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা শুরু করে। এই ভয়ানক কাজের সর্বশেষ ফল হিসেবে উসমান ﷺ শাহাদাত বরণ করেন। উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের ফলে উম্মাহর মধ্যে শিয়া ও রাফিজি ফিতনার এমন ভয়ানক দরজা খুলে যায়, যা সম্ভবত শেষ জমানা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এখানে এই ফিতনার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদিদের চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করা। ইহুদি আব্দুল্লাহ বিন সাবার কাজগুলো সেন্ট পৌলের কার্যক্রমের সাথে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, যে ইসা ﷺ-এর আনীত সত্য দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়ে তাকে খ্রিষ্টবাদে পরিণত করে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত সর্বশেষ কিতাবের ভিন্ন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল। ফারিসি আলিমরা তাওরাতের শিক্ষাকে পরিবর্তন করেছিল এবং সেন্ট পৌল ইসা ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে পূর্ণ বিপরীত বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন সাবার কুফুরি বিশ্বাসগুলো থেকে এই উম্মাহকে সংরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা এমন হকপন্থী আলিমদেরকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা অসম্ভব মেহনতের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর আকিদা ও রাফিজিদের গোমরাহিকে পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেন; যাতে এই দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত সকল ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকে।

ইসলামি খিলাফতের পরবর্তী যুগে ইহুদিরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জিম্মি হিসেবে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে থাকে। সেই সময় মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাগত উন্নতির সুযোগ গ্রহণ করে তারাও উন্নত হয় এবং আবার উত্থানের জন্য তৈরি হতে থাকে। বিশেষত আন্দালুসের মুসলিম শাসনকে এখনও তারা নিজেদের সোনালি যুগ হিসেবে স্মরণ করে।

ইউরোপে ইহুদিরা

১৮০৮ সালে কাফকাজের খিসার গোত্রের বাদশাহ পুরো জাতিকে নিয়ে ইহুদিবাদ গ্রহণ করে নেয়। বলা হয়ে থাকে, ইহুদিদের উলামায়ে সু'রা সেই কওমকে ইবরাহিম ﷺ-এর বংশধর প্রমাণ করে তাদের ইহুদি হওয়াকে কবুল করে নেয়। অন্যথায় ইহুদিরা তাদের দ্বীন প্রচার করে না এবং তাদের রক্ত-সম্পর্ক ছাড়া কাউকে নিজেদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। এয়োদশ শতাব্দীতে তাতারদের হামলার কারণে খিসার গোত্র কাফকাজ থেকে বের হতে বাধ্য হয় এবং পুরো ইউরোপ বিশেষত পোল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ইহুদিকে এস্কিনাজিক ইহুদি (Ashkenazic Jews) বলা হয়। আর যে সমস্ত ইহুদি মুসলিমদের এলাকা অর্থাৎ তুর্কি ও পূর্ব আফ্রিকাতে ছিল, তাদের সেপার্ডিক ইহুদি (Sephardic Jews) বলা হয়। আজ ইসরাইলের আশি শতাংশ এস্কিনাজিক ইহুদি এবং বাকি বিশ শতাংশ

সেপার্ডিক ইহুদি অর্থাৎ তারাই হচ্ছে বর্তমান মূল ইহুদি। ফলে বর্তমান ইসরাইলের আশি শতাংশ জনগণ বনি ইসরাইলের বংশের থেকে নয়; বরং খিসার বংশের সাথে সম্পৃক্ত।

ইউরোপে ইহুদিরা গোলামের মতো জীবনযাপন করত। রোমান ক্যাথলিক গির্জা তাদেরকে ইসা ﷺ-এর হত্যাকারী মনে করত। তাই ইহুদিদেরকে অভিশপ্ত ঘোষণা দিয়ে খ্রিষ্টানদের এলাকায় থাকতে নিষেধ করে এবং খ্রিষ্টানদের বসতির বাইরে আলাদা কলোনিতে থাকতে বাধ্য করে। সেই আলাদা কলোনিগুলো ইতিহাসে 'ইহুদিদের বাড়ি' (Jewish Ghettos) নামে প্রসিদ্ধ। তাদের সরকারি কোনো পেশায় চাকরি করার অনুমতি ছিল না। ইউরোপে তাদের একটাই পেশা গ্রহণের অনুমতি ছিল, তা হচ্ছে ব্যবসা। কারণ ব্যবসা ইউরোপের জাগিরদার সমাজে তৃতীয় শ্রেণির পেশা হিসেবে গণ্য হতো।

ইউরোপে ইহুদিদেরকে গণহত্যা ছিল একটি সাধারণ বিষয়। মুসলিমদের সাথে খ্রিষ্টানদের ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে খ্রিষ্টানরা তাদের কয়েকবার গণহত্যা করে। ইহুদিদের গণহত্যার একটি মূল কারণ ছিল, তারা সুদের ভিত্তিতে সম্পদ লোন দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিত; ফলে সেই সমাজের লোকেরা তাদের ওপর বিদ্রোহ করে গণহত্যা করত।

ইতিহাসে ইহুদিদের গণহত্যার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদেরকে ইংল্যান্ড থেকে গণহত্যার পর দেশান্তর করা হয়, ফ্রান্সে প্রথম ১৩০৬ ও পরে ১৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, বেলজিয়াম থেকে ১৩৭০ সালে, যুগোস্লাভিয়াতে ১৩৮০ সালে, হল্যান্ডে ১৪৪৪ সালে, রাশিয়াতে ১৫১০ সালে, ইতালিতে ১৫৪০ সালে এবং জার্মানিতে ১৫৫১ সালে গণহত্যা ও দেশান্তর করা হয়। আন্দালুস খ্রিষ্টানরা দখল করার পর মুসলিমদের সাথে ইহুদিদেরকেও দেশান্তর করা হয়। তাদের দেশান্তর ও গণহত্যার এই ধারা পুরো ইউরোপে সময়ে সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

ইহুদিবাদ ও মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলন

ইউরোপে ইহুদিদের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল জার্মান পাদরি (Martin Luther) মার্টিন লুথারের (Reformation) রিফরমেশন আন্দোলনে সফলতা। মার্টিন লুথারের এই আন্দোলন গির্জা ও পাদরিদের সংশোধনের জন্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক ছিল, মার্টিন লুথার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের বিপরীতে তাওরাত-জাবুরসহ ওল্ড টেস্টামেন্টে (Old Testament) প্রাপ্ত সহিফাগুলোকে খ্রিষ্টানদের দ্বীনের উৎস হিসেবে গণ্য করত। আরও এমন কিছু বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলনকে অনেক ঐতিহাসিক ইহুদিদের চক্রান্ত মনে করেন। কিছু ইতিহাসবিদের মত হচ্ছে, মার্টিন লুথার নিজেই ইহুদি ছিল, যে পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টান হয়। কয়েকজনের মত হচ্ছে, তার মা ইহুদি ছিল, আল্লাহু আ'লাম। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তার আন্দোলন খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন এক নতুন দলের জন্ম দেয়, যারা

ইহুদিদের ধর্মীয় বড় ভাই মনে করে। তারা ওল্ড টেস্টামেন্টকেই দ্বীনের মূল উৎস মনে করার পাশাপাশি ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতীক্ষিত ভূমি, হাইকালে সুলাইমানি, দানিয়েল ﷺ-এর দুআর ওপরেও বিশ্বাস রাখে এবং ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের অধিকারী মনে করে। এই দলকে আজ আমরা প্রটেস্টান্ট (Protestant) নামে চিনি। এভাবেই খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইহুদিদের জন্য অনেক বড় বন্ধু ও সাহায্যকারী মিলে যায়।

ব্রিটেন সাম্রাজ্য ও প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান

১৫৩২ সালে ব্রিটেনের বাদশাহ হেনরি অষ্টম (Henrz VIII) তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেন। কিন্তু রোমান গির্জা এই বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করে; যার ফলে বাদশাহর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান এলিজাবেথ প্রথম (Elizabeth I) সিংহাসনে বসার অযোগ্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় এলিজাবেথের সামনে প্রটেস্টান্ট মতাদর্শ গ্রহণ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না, যার মাধ্যমে সে বাদশাহির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ফলে এলিজাবেথ এমনটাই করে এবং নিজের সৎ বোন ম্যারিকে (Queen Marz I) সিংহাসনচ্যুত করে নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আর এভাবেই ব্রিটেনে প্রটেস্টান্ট মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এলিজাবেথের পর জেমস প্রথম (James I) ও দ্বিতীয় (James II)-এর যুগে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মতাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলমান থাকে। ১৬৮৮ সালে অনেক যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে 'চার্চ অফ ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাকে ১৬৮৮ সালের 'মহান বিপ্লব' বলা হয়। চার্চ অফ ইংল্যান্ডের দাবি অনুযায়ী এটি এমন এক গির্জা ছিল, যা প্রটেস্টান্ট বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যাহোক, ১৬৮৮ সালেই এই বিপ্লব ইহুদিদের জন্য অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়। যার ফলে ১৭ শতকে ইংল্যান্ড ইহুদিদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। আর এটা ছিল প্রটেস্টান্ট ও ইহুদিদের প্রথম বড় সফলতা, যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে পশ্চিমাদের অধ্যায়ে করা হবে।

ইউরোপে ৩০ বছরের যুদ্ধ ও প্রটেস্টান্টদের উত্থান

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রাজ্যগুলোতে ৩০ বছরের ধারাবাহিক এক যুদ্ধ শুরু হয়। যেখানে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ডের বাদশাহ ও শাহজাদারা নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে শত্রুতা। ১৭৭৪ সালে একটি চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয়, যাকে ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি (Peace of Westphalia treatz) বলা হয়। এই চুক্তির অধীনে সকল পক্ষকে অধিকার দেওয়া হয়, প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে যেকোনো মতবাদ গ্রহণ করে নিতে পারবে। যার ফলে ব্রিটেনের পর পুরো ইউরোপে প্রটেস্টান্ট মতাদর্শকে আলাদা একটি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয়। প্রটেস্টান্ট ফিরকা যেখানেই অবস্থান গ্রহণ করত, সেখানেই ইহুদিদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত। কেননা, প্রটেস্টান্ট দল ইহুদিদেরকে তাদের ধর্মীয় বড় ভাই হিসেবে গণ্য করে।

ইহুদিবাদ ও আমেরিকার আবিষ্কার

১৪৯২ সালে স্পেনের নাবিল ক্রিস্টোফার কলম্বাস (Christopher columbus) আমেরিকা আবিষ্কার করে। আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপের সব শাসক সেই নতুন ভূমিতে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু করে। যার মধ্যে স্পেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকা আবিষ্কার ইহুদি ও তাদের সাহায্যকারী প্রটেস্টান্টদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ ছিল। ১৭২৭ সালে এই দুই দল রোমান ক্যাথলিক গির্জার জুলুমের শিকার হয়ে অনেক কষ্টে আমেরিকায় চলে যেতে শুরু করে। আমেরিকাতে রোমান ক্যাথলিকদের বেশি শক্তি ছিল না; তাই অনেক কম সময়ের মধ্যে এই দুই দল আমেরিকাতে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে ফেলে এবং এখনো তারা সেখানে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ফরাসি বিপ্লব থেকে আধুনিক ইসরাইল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লব

একদিকে প্রটেস্টান্টরা ইউরোপে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল প্রভাব বিস্তার করছিল, অপরদিকে রোমের গির্জার জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্মের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট খ্রিষ্টানরা সপ্তদশ শতাব্দীতে গির্জার বিরুদ্ধে মানবাধিকারের নামে একটি আন্দোলন শুরু করে। যাকে তারা 'এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন' (Enlightenment Movement) বলে থাকে। এই আন্দোলনের দার্শনিকরা মানবীয় বিবেকের ভিত্তিতে খ্রিষ্টান ধর্মকে অস্বীকার করে বসে। ১৭৮৯ সালের ৪ জুলাই 'ফরাসি বিপ্লব' (French Revolution) হয়। যার ফলে গির্জা ও বাদশাহদের ক্ষমতা শেষ হয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়। এরপর থেকে আস্তে আস্তে পুরো ইউরোপে গণতন্ত্রের আওয়াজ উঁচু হতে শুরু করে। ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা আর কারও ফায়দা হোক বা না হোক, ইহুদিদের অনেক ফায়দা হয়। তাদের ওপর থেকে সব বাধা দূর হয়ে যায়। ইতিহাসবিদগণ এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনে ইহুদিদের হাত থাকার অনেক প্রমাণ পেশ করে থাকেন। মোটকথা ফরাসি বিপ্লবের পর ইহুদিদের ওপর থেকে গির্জার সব ধরনের বাধা দূর হয়ে যায়। এই বাধাগুলো দূর হওয়ার পর ইহুদিদের ইসরাইল দখল পর্যন্ত আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

আঠারো শতাব্দীর সূর্য ইহুদিদের উত্থানের সাথে উদিত হয়। ইহুদিরা ইউরোপে তৃতীয় স্তরের নাগরিক ছিল, ফরাসি বিপ্লবের পর গণতান্ত্রিক প্রশাসনের পার্লামেন্টগুলো তাদের সমান অধিকার দিয়ে দেয় এবং এর ফলে ইহুদিরা প্রথম স্তরের নাগরিকে পরিণত হয়। আর এটা ছিল ইসরাইলি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। যার পর আরও কয়েকটি ধাপের পথ উন্মোচন হয়ে যায়।

ইহুদিদের নতুন ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্যকর বিষয় হচ্ছে, ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল সব ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টির ফলে এবং যার প্রভাবে পুরো বিশ্বে ধর্মহীনতার শাসন ছড়িয়ে পড়ে এবং সব ধরনের দ্বীনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ তারাই আবার তাদের ক্ষমতা ও বৈশ্বিক শক্তির সাহায্যে এমন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যা শুধু ধর্মীয় ও বংশীয় ভিত্তিতে গঠিত। এটাই অনেক বড় প্রমাণ যে, নতুন বিশ্বব্যবস্থা ইহুদিদের তৈরি করা। তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই তা প্রতিষ্ঠা করেছে। সামনে আমরা পরবর্তী ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

ইউরোপে ইসরাইলি হুকুমত প্রতিষ্ঠার বীজ (১৮০০ - ১৯০০ খ্রি.)

১৮ শতকে ইহুদিরা প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান, এনলাইটেনমেন্টের ধর্মহীন খ্রিষ্টান, আমেরিকা ও ব্রিটেন প্রশাসনের আকৃতিতে এমন কিছু বন্ধু পেয়ে যায়, যারা তাদেরকে দানিয়েল ﷺ-এর দুআ বাস্তবায়নের সফরে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তখন সেখানে মুক্ত অর্থনীতির নামে ব্যাংক ও নতুন কারেন্সি-ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইহুদিরা ছিল এই ময়দানের অগ্রদূত। কেননা, তারা কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে ব্যাংক ও কারেন্সির ব্যবসা করে আসছিল।

১৮ শতকে তারা ব্যাংকের মাধ্যমে ইউরোপের সকল ব্যবসার ওপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং ইউরোপের সব রাষ্ট্রের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। আর এটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে তাদের মূল শক্তিতে পরিণত হয়। এই ঋণের চাপের কারণেই ইউরোপের দেশগুলো ইহুদিদেরকে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে বাধ্য করে। আর এই ক্ষেত্রে প্রটেস্টান্টরা সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি বিষয় ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে প্রথম রথচাইল্ড বংশ (House of Rothschild), দ্বিতীয় জায়োনিস্ট আন্দোলনের উত্থান এবং তৃতীয় উসমানি খিলাফতের ধ্বংসের জন্য গ্রেট গেইম বাস্তবায়ন। এখানে আমরা এই তিনটি মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করব।

রথচাইল্ড বংশ

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রথচাইল্ডের কার্যক্রমগুলো বোঝা অনেক কঠিন। রথচাইল্ড অর্থ হচ্ছে, হলুদ ডাল। এই বংশ আজও বিশ্বের অধিকাংশ বড় ব্যাংকগুলোর মালিক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের বিরাট অংশের ওপর তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। তখনকার সময়ে রথচাইল্ডের উত্তরাধিকারী মায়ার এমসেলকে (Mayer Amschel) ১৭৪৩ থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত ইহুদি আলিম হিসেবে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সে নিজের জন্য ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়। মায়ার নিজের ধর্মের প্রতি এতটাই আনুগত্যশীল ছিল যে, পুরো জীবন

সমস্ত দস্তখতে খ্রিষ্টাব্দের পরিবর্তে ইহুদিদের তারিখ ব্যবহার করত। সে ব্যাংকিং খাতে অস্বাভাবিক সফলতা অর্জন করে। এমনকি পুরো ইউরোপে তার ব্যাংকের অনেক শাখা ছড়িয়ে দেয়।

তার সন্তানরাও তাদের পিতার কারবারকে এতটা উন্নতি করে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বংশকে ইউরোপের শাসক ও প্রভাবশীল বংশ হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। সেই শতকে সম্ভবত এমন কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি, যার মধ্যে এই বংশের সরাসরি বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না। এই বংশ ইউরোপের বাদশাহদেরকেও ঋণের দ্বারা বেষ্টন করে ফেলেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে সংঘটিত প্রসিদ্ধ 'ওয়াটার লু' যুদ্ধে (Waterloo Battle) রথচাইল্ড বংশ ব্রিটেনের প্রশাসনকে মোটা অঙ্কের ঋণ দেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মাঝে রেললাইন নির্মাণেও এই বংশের ২৫% শেয়ার রয়েছে। শুধু ইউরোপ নয়; বরং উসমানিদেরকেও রেললাইন নির্মাণের জন্য তারা ঋণ দিয়েছিল।

সেই সময় প্রায় সমস্ত খবরের কাগজ ছিল এই বংশের মালিকানাধীন। এই বংশ ব্রিটেন সরকারকে সুয়েজ খালের (Suez Canal) জায়গা ক্রয় করার জন্য বিশাল ঋণ দিয়েছিল। একপর্যায়ে এসে এই বংশ পুরো ইউরোপ ও উসমানিদেরকে নিজেদের ঋণের দ্বারা আবদ্ধ করে ফেলেছিল। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় 'ঋণের ভিত্তিতে রাজনীতি' এই ইহুদি বংশই শুরু করে। রথচাইল্ড বংশ ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ভূমি ক্রয়ের জন্য মাল দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ইলিয়ার বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র ভূমির দিকে হিজরত করা এবং সেখানে নতুন জীবন শুরু করার জন্য সব ধরনের সাহায্য করেছিল। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার জন্য যে অভিশপ্ত চিঠি লিখেছিল, তা এই রথচাইল্ডের উদ্দেশেই লিখিত ছিল। সেই চিঠিকে ইতিহাসে বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) বলা হয়।

জায়োনিস্ট কার্যক্রমের সূচনা

১৮৮০ সালে জায়োনিস্ট আন্দোলন (Zionism) দুনিয়ার সামনে আসে। ফিলিস্তিনের একটি পাহাড়ের নাম সাহয়ুন, যার নামে তাদের নাম রাখা হয়েছে সাহয়ুনিয়্যাত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদি ও অ-ইহুদি সেই সমস্ত ব্যক্তি ও সংগঠন, যারা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা প্রতিশ্রুত ভূমি দখলের জন্য প্রচেষ্টা করছে। এই আন্দোলনের ভিত্তি সুইজারল্যান্ডের থিউডর হার্জেল (Theodor herzl) নামক এক ইহুদির হাতে স্থাপিত হয়। হার্জেল ১৮৯৬ সালে ইহুদি রাষ্ট্র (Der Judenstaat) নামে একটি বই লিখে, যেখানে সে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কার্যকর নকশা পেশ করে। সে তার বইয়ে বলে, 'পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে', আর এমনটাই হয়েছিল।

জেরুজালেমে ইহুদিদের গোপন আবাদি ও ইলিয়ার বিশ্বাস

১৭৮২ সালে জায়োনিস্ট আন্দোলনের প্রধান জোসেফ ফাইনবার্গ ও রথচাইল্ড বংশের প্রধান এডমন্ড ডি রথচাইল্ড (Edmond de Rothschild) ইহুদিদেরকে গোপনে ফিলিস্তিনে আবাদির পরিকল্পনা করে। এই কাজের জন্য সব ধরনের সাহায্য করেছিল রথচাইল্ড এবং সে নিজেও ফিলিস্তিনে কয়েকবার গোপনে সফর করেছিল। রথচাইল্ডের এজেন্টরা সেখানের মুসলিমদের থেকে ভূমি ক্রয় শুরু করে। কিন্তু যখন মুসলিমদের হুঁশ আসে এবং তারা বাধা দেওয়া শুরু করে, ততক্ষণে ফিলিস্তিন ব্রিটেনের কব্জায় চলে গিয়েছে এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।

বেলফোর ঘোষণা ও প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রথচাইল্ড বংশের প্রধান এডমন্ড, যে তখন ব্রিটেনের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিল, ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোরকে একটি চিঠি লেখে। আমরা সেই চিঠির বক্তব্য নিচে পেশ করছি।

> প্রিয় মিস্টার বেলফোর,
>
> গত শুক্রবারে একটি আর্জি পেশ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ধারণামতে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে ফেরানো উচিত। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সরকারী ও বেসরকারী জার্মান পত্রিকাগুলো ব্যাপক সংবাদ প্রচার করেছে, যেখানে বলা হচ্ছে নিরাপত্তা চুক্তিগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তিকে এই শর্ত দেওয়া উচিত; যাতে জার্মানির অধীন ফিলিস্তিনের এলাকাকে ইহুদিদের ভূমি ঘোষণা দেওয়া হয়। আমি এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, ব্রিটেনের ঘোষণাকে এমন একটা আন্দোলনের মাধ্যম বানানো উচিত। যদি আপনার ওয়াদা মুতাবিক আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে চান, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক মিস্টার ওয়াইজম্যান (ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী)-কে জানিয়ে দিন।
>
> আপনার একান্ত প্রিয়
> রথচাইল্ড

এই চিঠির জবাবে বেলফোর যে চিঠি লিখেছিল, তা-ই ইতিহাসে বেলফোর ঘোষণা হিসেবে পরিচিত। এই বেলফোর ঘোষণা মূলত ব্রিটেনের পক্ষ থেকে গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার অনুমতির ঘোষণা। আমরা সেই প্রত্যুত্তরমূলক চিঠিটি এখানে পেশ করছি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - ২ নভেম্বর ১৯১৭

প্রিয় লর্ড রথচাইল্ড,

আপনাকে এটা জানিয়ে আমার খুশি লাগছে যে, ব্রিটেনের বাদশাহর প্রশাসন ইহুদিদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ প্রশাসন ইহুদি জনগণের জন্য আলাদা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখছে এবং নিজেদের সমস্ত চেষ্টা সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যয় করবে। এই কথা স্পষ্টভাবে জেনে নিন যে, এমন কোনো কাজ করা হবে না, যার ফলে ফিলিস্তিনে অবস্থিত ইহুদি ভাইদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারের ক্ষতি হয় অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রে ইহুদিদের অধিকার ও রাজনৈতিক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি কৃতার্থ থাকব যদি আপনি এই ঘোষণা জায়োনিস্ট ফেডারেশনকে জানিয়ে দেন।

আপনার একনিষ্ঠ
আর্থার ডি বেলফোর

গ্রেট গেইম বা উসমানি খিলাফতের পতন

গ্রেট গেইমের বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় আলোচিত হচ্ছে। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল উসমানি খিলাফত। কেননা, ফিলিস্তিন তাদের অধীনে ছিল। আমিরুল মুমিনিন উমর ﷺ ফিলিস্তিন বিজয় করে খ্রিষ্টানদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, সেখানে এই শর্ত ছিল, ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসবাস করতে দেওয়া হবে না। তাই যখন ইহুদিদের গোপন প্রতিনিধি উসমানি খিলাফতের সর্বশেষ শক্তিশালী সুলতান আব্দুল হামীদকে অনেক ঘুষের বিনিময়ে এই আকাঙ্ক্ষা পেশ করে যে, তিনি যেন ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আবাদির অনুমতি দেন। তখন তিনি তাদের সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেন এবং কঠিন ভাষায় অস্বীকৃতি জানান। ফলে ইহুদিদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, উসমানি সালতানাতকে ধ্বংস করা ব্যতীত তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। উসমানি সালতানাতের পতনের ষড়যন্ত্র তো অনেক পূর্ব থেকে হচ্ছিল। একদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আর অপরদিকে রাশিয়ানরা ধারাবাহিকভাবে তাদের দুর্বল করছিল। তারা প্রথমে ইউরোপে উসমানিদের দুর্বল করে। এই ক্ষেত্রে আর্মেনিয়া, বসনিয়া ও বলকানের ষড়যন্ত্র ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শাম-লেবাননেও এই তিন শক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে মানবাধিকারের স্লোগান নিয়ে কনফারেন্স করত এবং সেখানে খ্রিষ্টানদের স্বাধীনতার কথা বলত। এটা ছিল ৫০ বছরের দীর্ঘ এক চক্রান্ত; যার ফলে উসমানিদের শক্তি অনেক দুর্বল হয়ে যায়। অতঃপর

বলকান যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্ত ও বিভিন্ন গোপন চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদের মূল কেন্দ্রকে খতম করে দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন আরবকে জাতীয়তাবাদ ও গোত্রপ্রেমের ভিত্তিতে সংগঠিত করে তোলে। তাদেরকে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সাহায্য করার বিনিময়ে আরববিশ্ব শাসনের স্বপ্ন দেখায়। বর্তমান জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর বাবা হুসাইনের পিতার পরদাদা হুসাইন বিন আলি উসমানিদের অধীনে হিজাজের গভর্নর ছিল, যাকে শরিফে মক্কা বলা হতো। ইংরেজরা প্রথমে তাকে এবং পরে তার ছেলে শাহ ফয়সাল ও শাহ আব্দুল্লাহকে এই শর্তের ওপর ইরাক ও সিরিয়াতে ক্ষমতা প্রদান করতে সম্মত হয় যে, তারা উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এ ছাড়াও তাদেরকে এর বিনিময়ে প্রতি মাসে পঁচিশ হাজার পাউন্ড সোনা ঘুষ হিসেবে দেওয়া হতো। আরবদেরকে উসমানিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর এই কাজ ব্রিটেনের সিক্রেট এজেন্সির কর্নেল লরেন্স আঞ্জাম দিয়েছিল, যে 'লরেন্স অফ আরাবিয়া' (Lawrence Of Arabia) নামেও পরিচিত। এভাবেই আরব ও উসমানিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়; যার ফলে ফিলিস্তিন ব্রিটেনের হাতে চলে যায়। ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্ক খিলাফতকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

ফিলিস্তিন ব্রিটেনের অধীনে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়া লীগ অফ নেশন (League Of Nations) ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে তাদের হাতে সোপর্দ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনকে বিলুপ্ত করে জাতিসংঘ গঠন করা হয় এবং ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ 'ইউএন পার্টিশন' পেশ করে, যেখানে ৫০% এলাকা ইহুদিদের ও ৪৫% এলাকা আরবদেরকে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে জেরুজালেম ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে দুই জাতির মধ্যবর্তী শহর ঘোষণা দেওয়া হয়। এই প্ল্যানকে ডেভিড বেনগুরিয়ান (Ben-Gurion) সাথে সাথে গ্রহণ করে নেয়; কিন্তু আরবলীগ এটা মানতে অস্বীকার করে। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে জাতিসংঘের প্ল্যান মুতাবিক ব্রিটেন তাদের প্রতিনিধিত্বের এলাকা ইসরাইলের হাতে হস্তান্তর করে দেয় এবং বেনগুরিয়ান ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। পরের দিন মিশর, শাম, ইরাক, লেবানন ও ফিলিস্তিনে অবস্থানরত আরবরা যুদ্ধ শুরু করে, যা তেরো মাস পর্যন্ত চলমান ছিল। এটা ছিল প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, যা কোনো ফলাফল ছাড়া শেষ হয়।

১৯৬৭ সালে ইসরাইল মিশরের দিক থেকে হামলার আশঙ্কার বাহানা তৈরি করে যুদ্ধ শুরু করে, যা ছয় দিন চলমান থাকে। এই যুদ্ধে ইসরাইল মিশরের সিনাই মরুভূমি ও ফিলিস্তিনের গাজা এবং শামের গোলান মালভূমির পাহাড়গুলো দখল করে নেয়।

১৯৭৩ সালে মিশর ও শাম মিলে হামলা করে আবার সিনাই মরুভূমি ও গোলানের পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু অংশ ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (Camp David Accords), যা ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন (Menachem Begin) ও মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত (Anwar Al-Sadat) এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের (Jimmy Carter) মধ্যস্থতায় হয়েছিল, এই চুক্তির অধীনে ইসরাইল সিনাই মরুভূমি ছেড়ে দিতে রাজি হয় এবং ফিলিস্তিনের পূর্বাঞ্চল ও গাজা থেকেও বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। যার বদলে মিশর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়।

১৯৮২ সালে ইসরাইল লেবাননে হামলা করে; যাতে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ রুখে দেওয়া যায়। ১৯৮৩ সালের আগস্টে তারা সেখান থেকে বের হয়ে সেটাকে একটি নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯৮৮ সালের নভেম্বরে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৯৯৩ সালের আগস্টে অসলো চুক্তির (Oslo Accords) মাধ্যমে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রটি স্বাধীনভাবে আজও পর্যন্ত অস্তিত্বে আসতে পারেনি।

ইহুদিদের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা

ইহুদিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা দেখা যায় যে, ইহুদিদের ইতিহাসে মৌলিক দুটি অংশ রয়েছে। একটি পুরাতন ইতিহাস ও আরেকটি নতুন ইতিহাস। ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস শুধু ইহুদিদের ইতিহাস নয়; বরং এখানে তাদের পূর্বযুগের আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারী মুসলিমদের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি এখানে ইহুদিদের ভ্রষ্টদের ইতিহাস ও তাদের গোমরাহির কারণগুলোর বর্ণনা রয়েছে। পূর্বে বনি ইসরাইলের ইতিহাসের আলোচনায় আমরা বলেছি, কীভাবে তারা মুসলিম থেকে ইহুদি হয়েছিল। বনি ইসরাইলের গোমরাহির কারণ ছিল শিরক, বিদআত ও উলামায়ে সু'দের অন্ধ অনুসরণ এবং চারিত্রিক অধঃপতন। তারা দ্বীনের মূল উৎসকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছিল। যাকে বনি ইসরাইলের অধিকাংশরাই মেনে নিয়েছিল। আর যখন কোনো দ্বীনের উৎসের ওপর অভিযোগ ওঠে এবং মানুষ তা গ্রহণ করে নিতে থাকে, তখন সেটা দ্বীন হিসেবেই বাকি থাকে না। তারা ভ্রান্ত আলিমদের চাহিদামতো চলা শুরু করে এবং তাদেরকে রবের জায়গায় বসিয়ে দেয়। তাদের শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পরবর্তী যুগে এই ফারিসি আলিমরা শুধু নবিদের বিরোধিতাই করেনি; বরং তাঁদের হত্যা করানোও শুরু করে। এই সমস্ত কারণেই বনি ইসরাইল আল্লাহ তাআলার লানতপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয় এবং তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কিন্তু আধুনিক যুগে তাদের আলিমরা পুরো ইতিহাসকে নতুন রং লাগিয়ে পেশ করতে শুরু করে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত জাতি হিসেবে পেশ করে। তারা ইহুদিদেরকে এই বিশ্বাস করানো শুরু করে যে, ফিলিস্তিনের ভূমি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চিরদিনের জন্য দিয়েছেন এবং দানিয়েল ﷺ-এর দুআর ফলে যে মাসিহের আগমন হবে, তা এখনো পূরণ হয়নি; বরং তিনি সামনে আসবেন। তিনি হাইকাল নির্মাণ করবেন এবং পুরো বিশ্বে একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। আর এই সমস্ত বিশ্বাস বাস্তবায়নই নতুন যুগের ইহুদিদের মূল লক্ষ্য। ইহুদিরা মুসলিম বা খ্রিষ্টানদের অধীনে যেখানেই থাকুক, তারা সর্বদাই এই উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করেছে। তাই ইহুদিদের নতুন ইতিহাস নিজেদের পক্ষ থেকে ধার্যকৃত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টার নাম।

ইহুদিদের বৃহৎ লক্ষ্য ও তা বাস্তবায়নে বাধাসমূহ

ইহুদিরা তাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে। কেননা, তারা সেই ইতিহাসের সূত্রেই গাঁথা। কিন্তু ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেওয়ার পর থেকেই সারা বিশ্বে তারা ঘুরে ফিরতে থাকে। একদিকে রোমানদের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার ফলে খ্রিষ্টান-দুনিয়া তাদের সামনে সংকীর্ণ হয়ে যায়, অপরদিকে ইসলামের আবির্ভাবের পর তাদের মূল মিশন বা লক্ষ্যের আরেক দাবিদার বৃদ্ধি পায়। এখন তাদের সামনে একের জায়গায় দুই শত্রু হয়ে

যায়। এভাবেই ইহুদিদের নতুন ইতিহাসে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা সেই সমস্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে তিনটি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব :

১. ইহুদিরা সংখ্যায় কম হওয়া

২. মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের কঠিন দুশমন

৩. ইহুদিদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

ইহুদিদের সংখ্যা কম হওয়া

ইহুদিদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, তাদের সদস্য-সংখ্যা অনেক কম। আর এর মূল কারণ এটা তাদের বংশীয় ধর্ম। সেই ব্যক্তিই ইহুদি হতে পারবে, যে বনি ইসরাইলের বংশের হবে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি তাদের আকিদা গ্রহণ করে নিলেও ইহুদি হতে পারবে না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত বান্দা (chosen people) বলে থাকে। কুরআনে এসেছে, (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) 'ইহুদি ও নাসারারা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।"'[২৫] যার ফলে ইহুদিরা তাদের দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয় না। আর এটাই ইহুদিদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এবং তারা নিজেরাও এই দুর্বলতা খুব ভালো করেই বোঝে। তারা আরও জানে যে, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মোকাবিলা করা নিজস্ব সদস্য-শক্তি দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ তাদের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেই পরিমাণ সদস্য দরকার ছিল, তা তাদের কাছে নেই।

মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের কঠিন দুশমন

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দেওয়ার পর ইহুদিদের সামনে দ্বিতীয় বাধাটি ছিল দুই বড় শত্রু। একদিকে রোমান ক্যাথলিক ও অপরদিকে মুসলিমরা। ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম বাধা ছিল খ্রিষ্টানরা, যারা তাদেরকে ইসা ﷺ-এর হত্যার (নাউজুবিল্লাহ) অভিযুক্ত মনে করত এবং এই অপরাধ কোনোভাবেই ক্ষমা করতে রাজি ছিল না। তাই ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত ইউরোপের কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি বা খ্রিষ্টান আবাদিতে বসবাসের অনুমতিও তাদের ছিল না। ইহুদিদের এই অবস্থাকে ইতিহাসবিদরা রোমান গির্জার বানানো শিকলে বন্দী হওয়ার সাথে সাদৃশ্য দেন। তাদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই শিকল হতে মুক্তি আবশ্যক ছিল। ইহুদিদের জন্য দ্বিতীয় বাধা ছিল, ইহুদিদের মতো খ্রিষ্টানরা নিজেদেরকে ফিলিস্তিনের দাবিদার মনে করত।

---

২৫. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৮।

মুসলিমদের দিক থেকে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল, কুরআনের নির্দেশনার আলোকে মুসলিমরা তাদেরকে নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করত। ফলে তাদেরকে জিম্মি বানিয়ে রাখত। অপরদিকে ইহুদিরা জানত, মুসলিমদের কাছে ফিলিস্তিনের অবস্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তারা মাসজিদুল আকসাকে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন ও প্রথম কিবলা গণ্য করে এবং নবিদের ভূমিকে ইহুদিদের থেকেও বেশি নিজেদের অধিকার মনে করে। মুসলিমদের জন্য বিষয়টা শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা কোনো ভূমি থেকে বহিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ যেখানে কিছু সময়ের জন্যও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা হয়, তারা সেই ভূমিকে দারুল ইসলাম বলে থাকে। এ ছাড়াও ইহুদিরা যে হাইকাল তৈরি করতে চাচ্ছে, তা মুসলিমদের প্রথম কিবলা মাসজিদুল আকসার ধ্বংসের ফলেই সম্ভব হতে পারে। আর এটাকে ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে ইহুদিরা এখনো ভীত। খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের দুশমনি ছাড়াও তৃতীয় বাধা ছিল, ফিলিস্তিন ভূমির দাবিদার শুধু তারা একাই ছিল না; বরং মুসলিম ও খ্রিষ্টানরাও নিজেদেরকে ফিলিস্তিনের হকদার মনে করে। খ্রিষ্টানরা ফিলিস্তিনকে ইসা ﷺ-এর জন্মস্থান মনে করে এবং মুসলিমরা মাসজিদুল আকসাকে প্রথম কিবলা এবং ফিলিস্তিন নবিদের ভূমি ও দারুল ইসলাম হওয়ার ফলে নিজেদের ভূমি মনে করে। ইহুদিদের সামনে এই দুই শত্রু এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ইহুদিদের একার পক্ষে দুই দুশমনের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

ইহুদিদের সামনে তৃতীয় বাধা ছিল সেই শাসনব্যবস্থা, যা মুসলিম ও খ্রিষ্টান-দুনিয়াতে চলমান ছিল। এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল—মুসলিম-বিশ্ব হোক বা খ্রিষ্টান-বিশ্ব—সকল বিধানের মালিক আল্লাহ তাআলা এবং জমিনে আল্লাহ তাআলার বিধানই প্রয়োগ হবে। ইউরোপের পোপতন্ত্র এই দাবি করত এবং মুসলিমদের খিলাফত এই নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিশ্বাস আপন জায়গায় এতটাই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, দুই জাতির সাধারণরা এই বিশ্বাসের সাথে কঠিনভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই দুটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের উপস্থিতিতে ইহুদিদের সেই বৈশ্বিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না, যার কেন্দ্র হবে প্রতিশ্রুত ভূমি ফিলিস্তিন এবং যেখানে তাদের দাবি অনুযায়ী তারা হাইকালে সুলাইমানি বানিয়ে রবের ইবাদত করবে। এই পোপতন্ত্র ও খিলাফতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইহুদিদের জন্য প্রতিকূল ছিল।

এ ছাড়াও মৌলিকভাবে পুরো দুনিয়াতে দুই ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি কৃষি জমির ভিত্তিতে কৃষি-সমাজ ও অপরটি রক্তের ভিত্তিতে গোত্রীয় সমাজ। এই সমাজগুলোতে ছিল পুরুষদের নেতৃত্ব এবং কয়েকটি গোত্র মিলে একটি জাতিতে পরিণত হতো। আর এটা এতটাই শক্তিশালী সমাজ ছিল যে, তারা নিজেদের সব প্রয়োজন ও স্বার্থ নিজেরাই রক্ষা করতে পারত। এই সামাজিক ব্যবস্থা ইহুদিদের জন্য সর্বোচ্চ ভয়ানক

ছিল। কেননা, তা এতটাই মজবুত ছিল যে, কোনো একটি গোত্র একাই ইহুদিদের তছনছ করে দিতে সক্ষম ছিল। এবং তাদের লক্ষ্যের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা রাখত। সমাজের এই শক্তিকে কাবু করা ব্যতীত ইহুদিরা কখনোই বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিল না।

ইহুদিদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, তারা ছিল ব্যবসায়ী জাতি এবং যেখানে যেত, সেখানেই সুদি অর্থনীতি চালু করত। এই ব্যবস্থা কিছু বছর ঠিকমতো চলত। কিন্তু যখন সুদি ব্যবস্থার দ্বারা ইহুদিরা সমাজের রক্ত চোষা শুরু করে দিত, তখন সেই সমাজ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদের গণহত্যা করত। তাদের সম্পদ দখল করত এবং জীবিতদের দেশান্তর করত। এমন ঘটনা ইতিহাসে বেশ কয়েকবার হয়েছিল। এভাবেই তাদের বানানো সুদি ব্যবস্থা কয়েকবার মূল থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহুদিদের কার্যপদ্ধতি

ইহুদিদের লিখিত বই এবং তাদের বিরোধীদের বইগুলো অধ্যয়নের দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, ইহুদিরা নিজেদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিল। নিজেদের সংখ্যা কম হওয়া ও দুশমনের শক্তির ব্যাপারে তারা জানত। এই জন্য তারা খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে নিজেদের সহযোগী তৈরি করা শুরু করে, যারা তাদেরকে এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সাহায্য করবে। তারা সেই সহযোগীদের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের বানানো অবরোধ থেকে বের হয়ে আসে। কেননা, এই অবরোধ থেকে বের হওয়া ব্যতীত তারা কখনোই নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম ছিল না। অতঃপর তাদের সমমনা ব্যক্তিদের সাহায্যে সেই শক্তিগুলো দূর করতে থাকে, যারা তাদের পবিত্র ভূমি দখলের মধ্যে বাধা হয়ে ছিল। যাতে তারা ফিলিস্তিন দখল করে পুরো দুনিয়াকে গোলাম বানিয়ে নিজেদের বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। তাদের এই বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই সামাজিক শক্তিগুলোকে বিলুপ্ত করা বা দুর্বল করে দেওয়া আবশ্যক ছিল। বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর কব্জা করা ও পুরো দুনিয়াকে কন্ট্রোল করা প্রয়োজন ছিল। কারণ চলমান পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা ইহুদিদের কাজে আসছিল না। তাই তাদের পুরো দুনিয়ার সমস্ত সিস্টেমকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। আর এই নতুন ব্যবস্থাকেই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা বলা হয়।

ইহুদিদের লক্ষ্য কী ছিল? এবং তারা কী চায়? জায়োনিজমের ওপর লিখিত সবগুলো বইয়েই এর কিছু না কিছু উত্তর অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে বিস্তারিত সামগ্রিক আলোচনা সেই দলিলগুলো থেকে পাওয়া গেছে, যা ১৯০৫ সালে রাশিয়ার এক পাদরির হাতে আসে এবং যাকে 'ইহুদিবাদী গুরুদের নীতিমালা' (Protocols of the Elders of Zion) বলা হয়। সেই গোপন নথিপত্রে ইহুদি গুরুদের পূর্বের শত বছরের কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং তাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপগুলোর আলোচনা রয়েছে। সেই নথিতে বর্ণনা করা হয়েছে,

কীভাবে ইহুদিরা ইউরোপে আলোকায়নের নামে ধর্মবিরোধিতা ছড়িয়েছে। ইউরোপের পুরাতন ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে ভবিষ্যতে তারা কীভাবে অর্থনীতির মাধ্যমে পুরো দুনিয়াতে নিজেদের হুকুমতকে চাপিয়ে দেবে। সেই নথিপত্র খুব গভীরভাবে অধ্যয়নের দ্বারা বোঝা যায়, ইউরোপে বৃদ্ধি পাওয়া ধর্মহীনতার আন্দোলনকে ইহুদিরা কীভাবে দক্ষতার সাথে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং ফরাসি বিপ্লবের পর দুনিয়ার পরিবর্তনগুলো কীভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এই কথাগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, নিজেদের লক্ষ্য পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ইহুদি ও জায়োনিস্ট সংগঠনগুলো ইউরোপে ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নিম্নোক্ত শক্তিগুলোকে টার্গেট বানায় :

১. প্রথম টার্গেট ছিল মুসলিম ও খ্রিষ্টান জনগণের মাঝে থাকা বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলাই সকল বিধানের উৎস। ইউরোপের মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে, গির্জা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুমত আর পোপরা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি এবং বাদশাহরা পোপদের প্রতিনিধি। বাদশাহদের কাজ হচ্ছে, রোমের পোপদের আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা, যে আদেশ খ্রিষ্টানদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। ফলে তখন বাদশাহ ও জনগণের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। অপরদিকে খলিফাদের ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস হচ্ছে, তারা আল্লাহর রাসুলের প্রতিনিধি এবং তাদের কাজ আল্লাহ তাআলার বিধান প্রয়োগ করা এবং মানুষকে শরিয়াহ মুতাবিক পরিচালিত করা।[২৬] সুতরাং সব বিধানের মূল আল্লাহ তাআলার আদেশ, হাকিমিয়্যাতের এই আকিদা সমাজে টিকে থাকা অবস্থায় ইহুদিদের বৈশ্বিক হুকুম প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। তাই তারা এই আকিদাকে এনলাইটেনমেন্টের ধর্মহীন আন্দোলনের মাধ্যমে খতম করে দেয়।

২৬. এখানে ইহুদিদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো 'আল্লাহর হাকিমিয়্যাত'-এর আলোচনা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলার হিদায়াত ও শিক্ষা অনুযায়ী মুসলিমদের খিলাফতে বাস্তবায়িত ছিল। খ্রিষ্টানদের মাঝেও এর একটি অবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং তা ইহুদিদের পথে বাধা হয়েছিল; কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিকৃত। সেখানে পাদরিদেরকে আল্লাহর আদেশের ঊর্ধ্বে স্বয়ং হালাল-হারাম নির্ধারণকারী মনে করা হতো। খ্রিষ্টবাদ মূলত দ্বীনের লিবাসে মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করত। পক্ষান্তরে ইসলামে শাসক, আলিম ও জনগণ সবাই সমানভাবে এই শরিয়তের অনুগত, যা আল্লাহর নবি ﷺ নিয়ে এসেছেন। যা আলিম ও শাসক নিজেদেরকেও মানতে হয় এবং জনগণকেও সেই মুতাবিক (নিজের চাহিদা অনুযায়ী নয়) পরিচালনা করতে হয়। এর সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ আবু বকর رضي الله عنه-এর খিলাফত গ্রহণকালে দেখা যায়, যখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি সোজা পথে (শরিয়াহ অনুযায়ী) চলি, তাহলে আমাকে আনুগত্য করবে; আর যদি বাঁকা পথে যাই, তাহলে আমাকে সোজা করে দেবে।' মোটকথা এখানে বোঝা আবশ্যক যে, ইসলামকে কখনোই খ্রিষ্টবাদের সদৃশ আখ্যা দেওয়া যাবে না। এখানে কেবল ইহুদিদের পথে একটি বাধা হিসেবে আলোচনা করা উদ্দেশ্য।

২. দ্বিতীয় শক্তি ছিল গোত্র ও বংশীয় ঐক্য। পুরো দুনিয়াতে গোত্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা ইউরোপে জাগিরদার ব্যবস্থার মাধ্যমে চলমান ছিল। এই জাগিরদার ব্যবস্থা মূলত গোত্রীয় শক্তিগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং গোত্রীয় শক্তিগুলো বংশধারার ভিত্তিতে চলমান ছিল এবং বংশীয় ব্যবস্থার নেতৃত্ব ছিল পুরুষদের হাতে। যার ফলে এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সমস্ত কার্যক্রম, আচরণবিধি ও অর্থনীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশাল শক্তি বিদ্যমান ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকত, ততদিন ইহুদিদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। তাই এই ব্যবস্থাকে তারা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধোঁকার মাধ্যমে, স্বাধীনতা (Freedom) সমতার (Equality) স্লোগানের সাহায্যে দূর করে দেয়।

৩. তৃতীয় শক্তি ছিল অর্থের শক্তি। ইহুদিরা অনেক বছর যাবৎ ইউরোপের বাণিজ্যের ওপর কর্তৃত্বশীল ছিল। তবে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর কব্জার জন্য তাদের এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, যা সমস্ত বিশ্বের প্রতিটা দেশের অর্থনীতিকে একে অপরের মুখাপেক্ষী করে দেবে।[২৭] এই ব্যবস্থা শুধু তখনই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব ছিল, যখন স্বর্ণকে কারেন্সি থেকে আলাদা করে তার জায়গায় কাগজের কারেন্সি প্রচলন ঘটানো হবে এবং কারেন্সির মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষমতা শুধু ব্যাংককে দেওয়া হবে এবং সেই ব্যাংকগুলোও থাকবে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর স্বর্ণকে কারেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুবাদে ইহুদিদের ব্যাংকগুলো অগণিত কারেন্সি নিজেরাই ছাপানোর সুযোগ পেয়ে যায়। যার ফলে পুরাতন বাণিজ্যব্যবস্থা শেষ হয়ে নতুন বাণিজ্যিক ব্যবস্থার অধীনে সব অঞ্চলের বাণিজ্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল (Interdependant) হয়ে যায়। এই অগণিত কারেন্সি দ্বারা ইহুদিরা পুরো দুনিয়ার উৎপাদন ও বাণিজ্যের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। কারণ দুনিয়ার ওপর তারাই শাসন করে, যাদের হাতে খাদ্যের মজুদ থাকে। কারেন্সি অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার দ্বিতীয় ফায়দা হচ্ছে, ইহুদিরা ব্যাংক থেকে প্রত্যেকটা কোম্পানি, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে সুদ-ভিত্তিক ঋণ দিয়ে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখে। কারেন্সির এই শক্তি তাদেরকে বিশ্ব বাণিজ্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে যেমন সাহায্য করে, তেমনই সামরিক অস্ত্র হিসেবেও কাজ করে।

অপরদিকে ইহুদিরা এই অগণিত কারেন্সির দ্বারা দুনিয়ার অধিকাংশ স্বর্ণের ভান্ডার ক্রয় করে নেয়। যাতে কারেন্সির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, স্বর্ণের ভান্ডার জমা করা এবং সমস্ত রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বৈশ্বিকভাবে একে অপরের মুখাপেক্ষী করে দেওয়ার দ্বারা দুনিয়ার

---

২৭. এটাকে Economic Integration বলা হয়। যার দ্বারা উদ্দেশ্য আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া; যাতে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত বাণিজ্যিক একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর ফলে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ (Global Capital) সৃষ্টি হয়। বাহ্যিকভাবে এই শৃঙ্খলার মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে একটি সন্তুষ্টিজনক উন্নতি দেখা যায়; কিন্তু এর ফলে আড়ালে আন্তর্জাতিক স্তরে বসে থাকা ইহুদি পুঁজিবাদী কোম্পানি ও ব্যক্তিরা বিশ্বের সমস্ত সম্পদকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, যার ভয়ানক ফলাফলের দিকে পূর্বের আলোচনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই অর্থনৈতিক শক্তিকে তারা যখন চাইবে, ব্যবসার জন্য ব্যবহার করবে, আবার যখন চাইবে সামরিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। সুতরাং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাকে 'বাজার অর্থনীতি' (Market Economy) বলা হয়, এই দুইটাই আজ পূর্ণভাবে ইহুদিদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ব্যাপারে আমরা বইয়ের দ্বিতীয় অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ইহুদিদের গোপন এজেন্ডা

ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে তাদের সমস্যা ও সমাধানের পরিকল্পনাগুলো গোপন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। ইসলামি বিশ্ব ও ইউরোপের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়নের দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি অনেক পশ্চিমা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও খ্রিষ্টান-বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের প্রশাসনের সামনে ইহুদিদের এই গোপন এজেন্ডার প্রমাণ পেশ করেছে, যা তারা খ্রিষ্টান-বিশ্বের বিরুদ্ধে করছিল। এ ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান শাসক এই গোপন সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিল। এই ধরনের একটি আক্রমণের আলোচনা চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান বাদশাহ ফিলিপ দ্য ফায়ার (Philip IV, the Fair)-এর ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাদশাহ ফিলিপ হঠাৎ প্যারিসে (Knights Templar) নাইট টেম্পলারদের একটি ঘাঁটিতে ক্র্যাকডাউন দিয়ে সেখানের সকল নাইট সিপাহিকে গ্রেফতার করে আনে। এই ধরনের সেনাদের গ্রেফতার করা কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। কারণ নাইটরা ছিল ক্রুসেডগুলোর হিরো এবং তাদের ছিল বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা। গ্রেফতার হওয়া নাইট সিপাহিদের ওপর ধর্মীয় আদালতে মামলা চালানো হয়। তাদের ওপর অভিযোগ ছিল, তারা ক্রুশকে অসম্মান করে এবং শয়তানের পূজা করে। পরবর্তী সময়ে তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল যে, এই নাইটরা ইহুদি ছিল এবং তারা খ্রিষ্টানদের বেশ ধারণ করে ফিলিস্তিনে হামলাকারী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে তারা বেশ সাহসিকতার সাথে লড়াই করে অনেক আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টানদের উত্থান নয়; বরং ইহুদিদের জন্য ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাস্তা পরিষ্কার করা।

নাইট টেম্পলারদের দ্বিতীয় ঘটনা সেই যুগেই স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বাদশাহ ফিলিপের আক্রমণ থেকে পলায়ন করে নাইটরা তখন স্কটল্যান্ডের বাদশাহ (Robert Bruce) রবার্ট ব্রোসের আশ্রয়ে চলে যায়। ব্রোস তখন ইংল্যান্ডের সাথে যুদ্ধরত ছিল। সে এই শর্তে নাইটদের আশ্রয় দেয় যে, তারা সেই যুদ্ধে তাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে এবং নাইটরা এতে সম্মত হয়। পরবর্তী সময়ে বাদশাহ ব্রোস এই যুদ্ধে জয় লাভ করে এবং স্কটল্যান্ড ইংরেজদের থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। বাদশাহর পক্ষ থেকে সুবিধা পেয়ে নাইটরা স্কটল্যান্ডে তাদের সংগঠনকে এগিয়ে নিতে থাকে।

ইহুদিদের গোপন কার্যক্রমের আরেকটি রেকর্ড পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ফ্রি মেসন (free Mason) নামের একটি আন্দোলন সামনে আসে। ফ্রি মেসন শব্দের অর্থ হচ্ছে, স্বাধীন স্থাপত্যশিল্পী বা রাজমিস্ত্রী। ফ্রি মেসন আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ইহুদিবাদ। তাদের বিশ্বাস ছিল হাইকাল নির্মাণের জন্য সুলাইমান ﷺ এমন এক রাজমিস্ত্রীকে কাজে লাগান, যে লোহা ব্যতীত শুধু আওয়াজ দিয়েই পাথর কাটতে পারত। আর সেই মাস্টার মেসন বা প্রধান মিস্ত্রী ছিল আবিফ আহিরাম নামক এক ব্যক্তি। যার কাছে জিউমেট্রিক জ্ঞান ছিল এবং এই ব্যক্তি লোহা ব্যতীতই পাথর কাটতে পারত। সুলাইমান ﷺ আবিফ আহিরামকে হাইকাল নির্মাণের জন্য মাস্টার মেসন অর্থাৎ প্রধান মিস্ত্রী বানিয়েছিলেন। হাইকাল নির্মাণের পর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই মাস্টার মেসনকে হত্যা করা হয়।

ইহুদিদের বিশ্বাস হচ্ছে, এই মাস্টার মেসনের কাছেই হাইকালের গোপন ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা ছিল। তাই এই মাস্টার মেসন দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবে এবং তার অধীনে হাইকাল দ্বিতীয়বার নির্মাণ করা হবে। আর ফ্রি মেসনদের জিম্মাদারি হচ্ছে, সেই মেসনের আগমনের জন্য পরিবেশ প্রস্তুত করা। অর্থাৎ তারা চক্রান্তের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যার ফলে পুরো দুনিয়াতে কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ফ্রি মেসন আন্দোলনের অধীনে অনেক গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন কাজ করে। প্রকাশ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন সংগঠন, যার বাহ্যিক কোনো সাধারণ লক্ষ্য থাকে; কিন্তু যারা এই সংগঠনের গভীরে প্রবেশ করে, তারা জানতে পারে যে, মূলত তাদের উদ্দেশ্য সেটাই, যা ফ্রি মেসনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়। এই সমস্ত সংগঠনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'লায়ন্স ক্লাব' (International Association of Lions Clubs) এবং 'রোটারি ক্লাব' (Rotary International)

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক বইয়ে এবং অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিডিয়ার সামনে ইহুদিদের গোপন চক্রান্তগুলো উন্মোচন করেছে। তাদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln), প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ফোর্ড মটর কোম্পানির (Ford Motor Company) মালিক হেনরি ফোর্ড (Henry Ford), জার্মানির শাসক হিটলার (Adlof Hitler) অন্তর্ভুক্ত। তারা ইউরোপে ইহুদিদের প্রভাব ও বৈশ্বিক ক্ষমতার ওপর তাদের দখলদারির চক্রান্ত প্রকাশ করেছে। এই ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই, যা বিশ্বের সামনে ইহুদিদের চক্রান্ত ও লক্ষ্যগুলোকে স্পষ্ট করেছে, তা হচ্ছে 'প্রটোকলস' অর্থাৎ ইহুদিদের গুরুদের চুক্তি ও নথিপত্র। যার আলোচনা আমরা পূর্বেও করেছি। ইহুদিদের এই সমস্ত প্ল্যানকে বিস্তারিতভাবে জন লরেন্সের (Jhon Lawrence Reynolds) প্রসিদ্ধ বই (Secret Societies) 'সিক্রেট সোসাইটি' এবং ওয়াল্টার ল্যাকারের (Walter Laqueur) বই 'হিস্টোরি অফ জায়োনিজম' (A History of Zionism)-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইহুদিদের এই সমস্ত চালবাজি ও কার্যক্রমের ব্যাপারে গত শতাব্দীতে মুসলিম ও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ অনেক দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন, ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেওয়ার পর থেকেই তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এই কাজে সব ধরনের ইহুদিরা অংশগ্রহণ করেছিল, এখানে সেসব দৃঢ় বিশ্বাসের ইহুদি ছিল, যারা মাসিহ আসার অপেক্ষায় রয়েছে। যারা মনে করে মাসিহের আগমনের পর ইহুদিদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সেসব ইহুদিও ছিল, যারা মনে করে মাসিহের অপেক্ষা না করে বরং আমাদেরকে মাসিহের আগমনের পরিবেশ প্রস্তুতের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রকারের ইহুদি—যারা মাসিহের আগমনের পরিবেশ তৈরি করছে—তাদের মধ্যে দুটি দল পাওয়া যায়। একটি দল দৃঢ় বিশ্বাসী ইহুদি, যারা তালমুদের বিধানের ওপর আমল করে মাসিহকে পেতে চায়, অপর দলটি জায়োনিস্টদের সাথে সম্পৃক্ত ইহুদি।

এই দুটি দল বনি ইসরাইলের সেই পুরাতন দুই ফিরকার ধারাবাহিকতার ফসল, যাদের মধ্যে একটি দল পরিপূর্ণভাবে বা'ল ও আস্তারাতের পূজায় লিপ্ত ছিল এবং অপর দল ছিল ফারিসি আলিম, যারা দাউদ ﷺ-এর বংশ থেকে মাসিহের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। এই দুই দলই ইসা ﷺ-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল। কেননা, বনি ইসরাইলের মুশরিক গ্রুপ, যারা বা'ল দেবতার পূজা করত, তারা জেনেবুঝে ইসা ﷺ-এর মোকাবিলায় শয়তানি শক্তির সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের বিশ্বাস ছিল দুনিয়াতে দুটি শক্তি রয়েছে, ভালো শক্তি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও শিরকি শক্তি অর্থাৎ শয়তান। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে, তারা এই দুই শক্তির যেকোনো একটির সাথে থাকতে পারবে। মূলত তারা যে মাসিহের অপেক্ষায় আছে, সেই মাসিহ হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে আগমনকারী দাজ্জাল। এই গ্রুপগুলো গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

অপর দল যারা ফারিসি আলিমদের কারণে দ্বীনের মধ্যে বিকৃতির শিকার হয়েছিল, তারাও সর্বশেষ নবি ও মাসিহের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ইসা ﷺ-এর হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনার পর তারা পরিপূর্ণভাবে গোমরাহ হয়ে যায়। এই দলটি নবিদের ওপর আসা ওহির মাধ্যমে শেষ জমানার ঘটনাগুলোর ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল এবং তারা জানত যে, শেষ জমানায় একজন মাসিহ আসবেন, যিনি পুরো দুনিয়াতে শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন যেহেতু এই ইহুদিরা নিজেরাই ভ্রান্ত ও সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা মাসিহুল্লাহর দুশমন হয়ে যায় এবং মাসিহে দাজ্জালকেই তারা সর্বশেষ জমানার মাসিহ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এই দলটি মাসিহের আগমনের জন্য পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে মুশরিক ইহুদিদের সাথে একজোট হয়ে কাজ করছে।

সুতরাং এই দুটি দল—চাই মুশরিক ইহুদি হোক বা বিকৃতির শিকার ইহুদি—তারা সকলেই জায়োনিস্ট আন্দোলনে একত্রিত হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সকলেই সেই তিনটি

লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা, জায়োনিজম বা ইহুদিবাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অনেক গোপন সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি। এই সমস্ত শক্তিশালী বাস্তবতা সত্ত্বেও এখানে কেবল তাদের পর্দাবৃত পরিকল্পনার আলোচনার ওপর নির্ভর করা হচ্ছে না; বরং তাদের সেসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তগুলোও আলোচনা করা হবে, যা প্রত্যেকের সামনেই দৃশ্যমান এবং যার দলিল-প্রমাণ এখন কোনো গোপন বিষয় নয়।

ইহুদিদের প্রকাশ্য চক্রান্ত

ইহুদিদের নতুন ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে গত দুই হাজার বছরের দ্বীনে হকের সাথে তাদের দুশমনি ও চক্রান্ত, মানুষকে গোমরাহ করা এবং নিজেদের স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার আলোচনা এখনো সংরক্ষিত দেখতে পাওয়া যায়। ইসা ﷺ-এর আনীত সত্য দ্বীনের মধ্যে বিকৃতির ক্ষেত্রে সেন্ট পৌলের কার্যক্রম, উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের মধ্যে ইহুদি আব্দুল্লাহ বিন সাবার চক্রান্ত, ইউরোপের মার্টিন লুথারের প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের সাথে ইহুদিদের সম্পর্ক, ইউরোপে গির্জার বিরুদ্ধে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ইহুদি দার্শনিকদের ভূমিকা, ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে ইহুদিদের পদক্ষেপ, নতুন ব্যাংকব্যবস্থা, কারেন্সি ও বাণিজ্যব্যবস্থাকে কাবু করার জন্য ইহুদি বংশের চক্রান্ত, ইউরোপে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইহুদিদের চক্রান্ত, রাশিয়াতে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ইহুদিদের কার্যক্রম, খিলাফত ধ্বংসে ইহুদিদের কার্যক্রম এবং আমেরিকার প্রত্যেকটি অংশে ইহুদিদের দখলদারিত্ব এতটাই স্পষ্ট ও প্রমাণিত বিষয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইহুদিদের চক্রান্ত গোপন হোক বা প্রকাশ্য—তাদের দাবি ও লক্ষ্য একটাই। তা হচ্ছে, আধুনিক যুগে ইহুদিরা নিজেদের পূর্বের ক্ষমতা ও ইতিহাসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। বর্তমানের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত ইহুদিদের আদি ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনার নাম। কারণ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত ইহুদি ও তাদের সমমনাদেরই সৃষ্টি। তবে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা হোক বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা, মুসলিম উম্মাহর সামনে শত্রু একটাই। আমরা সামনের অধ্যায়ে চক্রান্তগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাস এই কথা স্বীকার করে যে, ইহুদিরা ইউরোপের গির্জার বিরুদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলনসমূহকে নিজেদের স্বার্থ অর্জনের জন্য খুব ভালোভাবে ব্যবহার করেছিল। কীভাবে তারা নিজেদের স্বার্থ অর্জন করেছিল—সেই আলোচনার পূর্বে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব যে, ইউরোপে খ্রিষ্টানদের উত্থান কীভাবে হয়েছিল? খ্রিষ্টবাদ ইউরোপে কোন ধরনের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিল? সেই ব্যবস্থায় কী ধরনের সমস্যা ছিল? সেই সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কী কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল? গির্জার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপের মানুষের মধ্যে কী ধরনের চিন্তাগত পরিবর্তন এসেছিল? সেই চিন্তাগত পরিবর্তন থেকে ইহুদিরা কীভাবে ফায়দা নিয়েছিল? ইহুদিরা ইউরোপে খ্রিষ্টানদের চাপিয়ে

দেওয়া বাধা কীভাবে ভেঙে ফেলেছিল? ইউরোপে মানবাধিকারের যুদ্ধ কীভাবে শুরু হয় এবং কীভাবে ইহুদিরা এর থেকে ফায়দা অর্জন করে? খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা একজোট কীভাবে হয়েছিল? ইহুদিরা ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থা কীভাবে ভেঙে ফেলেছিল? ইহুদিরা বৈশ্বিক বাণিজ্যকে কীভাবে কব্জা করেছে? আজকের ইহুদিরা বৈশ্বিক অর্থনীতিকে কীভাবে একটা যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে? জাতিসংঘের অধীনে ইহুদিরা কীভাবে বৈশ্বিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এতে তাদের উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে সামনের অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।
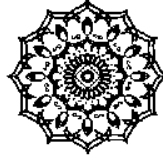
দ্বিতীয় অধ্যায়

ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার ও পশ্চিমাদের ইতিহাস

যখনই আমাদের সামনে ইউরোপ, আমেরিকা বা পশ্চিমাদের পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা হয়, তখনই খ্রিষ্টান ও ক্রুসেড যুদ্ধের ছবি ভেসে ওঠে, যেখানে ঘোড়ার ওপর সওয়ার নাইটরা পবিত্র ভূমির দিকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে দুইশ বছর পূর্বে সম্ভবত এই চিত্রের কল্পনা সঠিক হলেও বর্তমানে এই কল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভুল। এই দুইশ বছরে ইউরোপ ও আমেরিকাতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মুসলিমদের মধ্যে পশ্চিমাকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক অসংগতি থেকে যায়। আর এই অসংগতির ফল মুসলিমদের নিয়ে চিন্তাশীল শ্রেণির কার্যক্রমের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাই আমাদের চেষ্টা হবে পশ্চিমাদের পরিপূর্ণ দৃশ্য মুসলিমদের সামনে পেশ করা; যাতে আজকের মুসলিমদের সচেতন ও সংবেদনশীল ব্যক্তিরা তাদেরকে পূর্ণভাবে চিনে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।

বর্তমানে 'পশ্চিমা' পরিভাষাটি ব্যাপক পরিসরে ভৌগলিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। ভৌগলিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা শব্দের ব্যবহার সেই জাতির ওপর হয়ে থাকে, যারা একদিকে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও কানাডাতে বাস করে এবং অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বাস করে। আদর্শিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা দ্বারা দুইটা বিকৃত আসমানি ধর্ম ইহুদি ও খ্রিষ্টান এবং নতুন ধর্মহীনতার চিন্তা-চেতনার সমষ্টিকে বোঝানো হয়। এ নতুন মতাদর্শের মধ্যে পুঁজিবাদ (Capitalisom), গণতন্ত্র (Democracy), সমাজতন্ত্র (Communism) ছাড়াও আরও অনেক মতাদর্শ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসব মতাদর্শের উৎস হচ্ছে ধর্মহীনতা (Secularism)।

আজকের পশ্চিমাদের নতুন ইতিহাস সপ্তম শতকে সাহাবিদের হাতে শাম ও ফিলিস্তিনে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পরাজয় থেকে শুরু হয়। যেখানে খ্রিষ্টানদের পূর্বাংশ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তারা পশ্চিমে কনস্টান্টিনোপল ও রোমে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমে খ্রিষ্টানদের উত্থান হয় খ্রিষ্টাব্দ ৮ম শতকে ফ্রান্সের বাদশাহ চার্লিমানের (Charlemagne) রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী শাসনভার গ্রহণের মাধ্যমে। এটা ছিল ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের সূচনা। ইউরোপে গির্জা ও বাদশাহদের ক্ষমতার এমন জোয়ার সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা তারা মধ্যযুগে পুরো ইউরোপে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। পরবর্তী

সময়ে বাদশাহ ও গির্জার খারাপ কাজের ফলে তাদের ক্ষমতার এই জোয়ারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় এবং তা সংশোধনের জন্য অনেক আন্দোলনের জন্ম হয়। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় ও ধর্মহীন সব ধরনের আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আন্দোলনগুলো ইউরোপে অনেক বিশাল চিন্তাগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যেই চিন্তাগত পরিবর্তনগুলোর সাথে বর্তমান যুগের জিহাদের চিন্তাগত ভিত্তির খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই আমরা এই অধ্যায়ে পশ্চিমাদের নতুন ইতিহাসের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করব। কারণ পশ্চিমাদের পুরাতন ইতিহাস এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়।

পশ্চিমাদের নতুন ইতিহাস রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের উত্থান থেকে শুরু হয়ে ধর্মহীনতার ফিতনার প্রভাবে সংগঠিত ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত এসে পৌঁছে। এটা আনুমানিক এক হাজার বছরের ইতিহাস। এই সময়ে ইউরোপে ধর্মহীনতার ফিতনা শুরু হয়। যার ফলে গির্জা ও ধর্মহীনতার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যা প্রায় পাঁচশ বছর চলমান থাকে। এই সময়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রটেস্টান্ট নামক দলের সৃষ্টি হয়, যারা রোমান ক্যাথলিক শাসনকে আরও অধিক দুর্বল করে ফেলে। নতুন বিশ্ব অর্থাৎ আমেরিকার আবিষ্কারের পর প্রটেস্টান্টরা সেখানে গিয়ে আবাদ হয়ে যায় এবং আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। অপরদিকে ইউরোপের ধর্মহীন আন্দোলনগুলো মজবুত হতে থাকে এবং ১৭৭৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে গির্জার এক হাজার বছরের শাসনের পতন হয় এবং ইউরোপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়।

পশ্চিমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল ব্রিটেন কর্তৃক হিন্দুস্থানের ওপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা। ব্রিটেনের এই বিজয়ের ফলে হিন্দুস্থান থেকে এত পরিমাণ কাঁচামাল অর্জিত হয়, যার ওপরেই দুনিয়ার প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তি রাখা হয়। ১৮৩০ সালের প্রথম শিল্প-বিপ্লবের পর ইউরোপের দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব পশ্চিমাকে সামরিক শক্তির পাশাপাশি একটি সামাজিক শক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে হিন্দুস্থান থেকে অগণিত জনশক্তি সংগৃহীত হয়, যাদেরকে সামরিক শক্তিতে পরিণত করে প্রথমে পুরো হিন্দুস্থানের ওপর নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর এই শক্তি দ্বারা তারা ইয়ামান, মিশর ও মাল্টা দখল করে ইউরোপ থেকে হিন্দুস্থান পর্যন্ত সামুদ্রিক রাস্তা ক্লিয়ার করে নেয়। তারপর ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই বাহিনীর সাহায্যে উসমানি খিলাফতকে শহিদ করে ফিলিস্তিন দখলের পাশাপাশি সেখানে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও এই বাহিনী দ্বারাই ইহুদিদের সর্বোচ্চ সাহায্য করে। তারা এই বাহিনী দ্বারা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও মুসলিমদের সমস্ত তেলের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং মুসলিম উম্মাহকে টুকরা টুকরা করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ পুরো বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, যার ফলে পশ্চিমাদের নেতৃত্ব আমেরিকার হাতে চলে যায়। তবে আমেরিকার কার্যক্রম ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী ধারা হিসেবেই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা নিউ

ওয়ার্ল্ড অর্ডারের উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে, যাকে 'মার্কেট ইকোনমি বা বাজার অর্থনীতি' বলা হয়। এর বিপরীতে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হয়, যা আফগান জিহাদে মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রাশিয়ার পরাজয়ের পর আমেরিকা দুনিয়ার একক পরাশক্তিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে উম্মাহর মুজাহিদরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। এখন পশ্চিমা ও মুজাহিদরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এবং এই যুদ্ধ পুরোদমে চলমান রয়েছে। ইউরোপে গির্জার উত্থান থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ঘোষণা পর্যন্ত পশ্চিমাদের ইতিহাসে কয়েকটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। পশ্চিমাদের এই ইতিহাস খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা এখানে পশ্চিমাদের ইতিহাসের আলোচনা খ্রিষ্টবাদ থেকে শুরু করব।

খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস

ইউরোপ থেকে নয়; বরং ফিলিস্তিন ও শাম থেকে খ্রিষ্টবাদের সূচনা হয়। তখনকার সময় এই অঞ্চলগুলো রোমানদের অধীন ছিল। খ্রিষ্টবাদ সেই সত্য দ্বীন নয়, যা ইসা ﷺ নিয়ে এসেছেন এবং যার দাওয়াহ তাঁর সাথিগণ দিয়েছিলেন; বরং এটা মানুষের বানানো একটি ধর্ম। এই দ্বীনের উত্থান ইসা ﷺ-এর আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার কিছু বছর পর থেকে শুরু হয়। খ্রিষ্টবাদ মূলত এক ইহুদি আলিম সেন্ট পৌলের মস্তিষ্কের আবিষ্কার। ইসা ﷺ-এর জীবদ্দশায় সে-ই ইসা ﷺ-এর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল। কিন্তু ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর বাহ্যিকভাবে সে খ্রিষ্টান হয় এবং হাওয়ারিদের সাথে মিলে দাওয়াহ কাজ শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে সে সত্য দ্বীনে বিকৃতি ও নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মানুষও তার বিকৃতিগুলো গ্রহণ করে সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান বাদশাহ কনস্টান্টাইন (১ম) যখন খ্রিষ্টান হয়ে যায়, তখন সত্য দ্বীন মানুষের দৃষ্টি থেকে পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়।

খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস কয়েকটা ভাগে বিভক্ত :

- প্রথম যুগ : বিপদ ও পরীক্ষার যুগ (১- ৩০৬ খ্রি.)
- দ্বিতীয় যুগ : খ্রিষ্টবাদের উত্থান (৩০৬-৫৯০ খ্রি.)
- তৃতীয় যুগ : ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের উত্থান (আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে অন্ধকার যুগ) (৫৯০-৭১৪ খ্রি.)
- চতুর্থ যুগ : ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের পতনের সূচনা (আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যযুগ) (৭১৪-১৪৫৩ খ্রি.)
- পঞ্চম যুগ : খ্রিষ্টবাদের পতন (আধুনিক পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মতে রেনেসাঁর যুগ) (১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রি.)

খ্রিষ্টানদেরকে কুরআন মাজিদে নাসারা বলা হয়েছে। এই নামকরণের ব্যাপারে দুটি বর্ণনা এসেছে। একটি মত অনুযায়ী এই নামের সম্বন্ধ হচ্ছে ইসা ﷺ-এর হাওয়ারিদের দিকে, যারা ইসা ﷺ-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, (نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ) 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।' অপর মত হচ্ছে, এর সম্বন্ধ ইসা ﷺ-এর জন্মের ঘটনার সাথে, যা নাসেরা নামে প্রসিদ্ধ। উপমহাদেশে ইসা ﷺ-এর নামানুসারে তাদের ইসায়ি বলা হয়। এ ছাড়াও ইসা ﷺ-এর লকব মাসিহের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদের মাসিহিও ডাকা হয়।

ইসা ﷺ যে দ্বীন এনেছিলেন, তা তাওরাতের শিক্ষা থেকে ভিন্ন ছিল না; বরং ইসা ﷺ-কে সত্য দ্বীন উজ্জীবিত করা এবং বনি ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আর এটা হাওয়ারিরাও জানত; তাই তারা কখনোই বনি ইসরাইলের বাইরে তাবলিগের

চেষ্টা করেনি। ইসা ﷺ-এর জন্য তাওরাতকেই শরিয়াহ হিসেবে অনুমোদন দেওয়া এর প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়াও সুরা আলে ইমরানের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'বনি ইসরাইলের দিকে প্রেরিত রাসুল' অর্থাৎ ইসা ﷺ-কে শুধু বনি ইসরাইলের কাছেই নবি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ইসা ﷺ, তাঁর সাথিবর্গ ও তাঁর ওপর ইমান আনয়নকারীগণ বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই সত্য দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটানোর পর তাওহিদের আনুসারী জাতি তিন প্রভুর আনুসারীতে পরিণত হয়। সেই সাথে তারা নিজেদের দাওয়াহকে বৈশ্বিক বানিয়ে নেয় এবং তাওরাতের বিধানের মাঝে অনেক পরিবর্তন করে ফেলে। আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে, এই বিকৃতিগুলোতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এই ইহুদি আলিম 'সেন্ট পৌল' পালন করেছিল।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে এমনটা বলা ভুল হবে না যে, বর্তমানের খ্রিষ্টবাদ মূলত ইহুদিবাদের বিকৃত রূপ। এই দুটি ধর্ম সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার ফলে কুরআনে তাদের জন্য আহলে কিতাব নামক একক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক জায়গায় দুটি দলকে এক শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টবাদ একটি ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে; তাই তাদের আলাদা বর্ণনা করা হয়। এখানে এটা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, এই দুটি ধর্মের পরস্পর এত এত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মাঝে ঐতিহাসিক ও চিন্তাগত গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

খ্রিষ্টানদের ইতিহাসের যুগগুলোর মধ্যে আমরা প্রথম দুটি যুগের আলোচনা এখানে করব। বাকি তিন যুগের আলোচনা ইউরোপের ইতিহাসের অধ্যায়ে করব। কেননা রোমানরা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরে খ্রিষ্টবাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ফিলিস্তিন ও পূর্ব ইউরোপ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মধ্য ইউরোপে চলে যায়। অপরদিকে এই ঘটনাগুলো ইউরোপে সংঘটিত হওয়ার ফলে ঐতিহাসিকগণ এগুলোকে শুধু খ্রিষ্টানদের ইতিহাস নয়; বরং ইউরোপের ইতিহাসের অংশও মনে করে। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, পরবর্তী যুগগুলোর মধ্যে মুসলিমদের তৃতীয় দুশমন অর্থাৎ নতুন মুশরিকদের উত্থান হয়েছিল। তাই ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস খ্রিষ্টানদের ইতিহাস থেকে আলাদা আলোচনা হওয়াই যথার্থ।

প্রথম যুগ : বিপদ ও পরীক্ষার যুগ (১-৩০৬ খ্রি.)

খ্রিষ্টানদের ইতিহাসের প্রথম যুগকে বিপদের ও পরীক্ষার সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে এই যুগে খ্রিষ্টানদের ওপর মুশরিক রোমান কর্তৃক অনেক জুলুম হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, রোমানদের এই জুলুম মূলত ছিল সত্য দ্বীনের অনুসারীদের ওপর। এর প্রমাণ হচ্ছে আসহাবে উখদুদ ও আসহাবে কাহফের ঘটনা এই যুগেই সংঘটিত হয়েছিল, যারা ছিলেন সত্য দ্বীনের অনুসারী। তবে মূলকথা হচ্ছে বিপদের যুগে ইসা ﷺ-এর সত্য দ্বীন ও সেন্ট পৌলের বানানো মতাদর্শ একই সাথে প্রচারিত হচ্ছিল। যার দৃষ্টান্ত বর্তমানেও রয়েছে। যেমন মুসলিম ও তাদের বিকৃত আকিদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা কখনো কখনো লড়াই পর্যন্ত পৌঁছায়।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে বনি ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন; কিন্তু বনি ইসরাইল উলামায়ে সু'দের আনুগত্যের ফলে শুধু ইসা ﷺ-কে অস্বীকারই করেনি; বরং তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করেছে। তারা রোমানদের সাথে মিলে ইসা ﷺ-কে শূলিতে চড়ানোর চক্রান্ত করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে রক্ষা করে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যান। ইসা ﷺ-কে হত্যার চক্রান্ত বনি ইসরাইলের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা। কারণ এর পর থেকেই বনি ইসরাইল খ্রিষ্টান ও ইহুদি নামে দুটি নতুন ধর্মে বিভক্ত হয়ে যায়।

ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর তাঁর সাহায্যকারীরা বনি ইসরাইলের মধ্যে সত্য দ্বীনের প্রচার করতে থাকে। কিন্তু সেখানে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়; যার ফলে ইসা ﷺ-এর আনীত তাওহিদের দ্বীন ত্রিত্ববাদে পরিবর্তন হয়ে যায়। সাউল নামের এক ইহুদি আলিম—যে ইহুদিদের সবচেয়ে কট্টর দল ফারিসিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ইসা ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর শিক্ষার কঠিন বিরোধিতা করত; তাঁকে ও তাঁর সাথিদের অনেক কষ্ট দিত; কিন্তু ইসা ﷺ-এর অফাতের পর সে হঠাৎ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তার দাবি অনুযায়ী এর কারণ ছিল, যখন সে জেরুজালেমে ইহুদি আলিমদের সাথে পরামর্শ করে দামেস্কে রওয়ানা হয়, তখন আসমান থেকে একটি নুর দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেখান থেকে একটি আওয়াজ তাকে বলে, 'এই সাউল, তুমি কেন আমার বিরোধিতা করো?' সে বুঝতে পারে এই আওয়াজ ইসা ﷺ-এর ছিল। সাউলের এই ঘটনাকে শুধু একজন ব্যতীত আর কোনো হাওয়ারি পাত্তা দেয়নি। তবে সে একাই অন্যদের সাউলের একনিষ্ঠতার ব্যাপারে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়। এবং সে সাউলের সাথে মিলে তাবলিগ শুরু করে। সাউল নিজের নাম পরিবর্তন করে 'পৌল' রাখে, যা ইতিহাসে সেন্ট পৌল নামে প্রসিদ্ধ। তার তাবলিগের ফলে বনি ইসরাইলের অসংখ্য মুশরিক খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু যে দ্বীনের দিকে সে আহ্বান করত, সেখানে আস্তে আস্তে নতুন আকিদা ও বিধান প্রবেশ করাতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ছিল ইসা ﷺ-এর উলুহিয়্যাতের আকিদা। যা পরবর্তী সময়ে ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটির আকৃতি ধারণ করে। যার অর্থ অনেকটা এমন যে, আল্লাহ তাআলা, ইসা ﷺ ও রুহুল কদুস—এই তিন প্রভু মূলত একজনই।

এ ছাড়াও সে মুসা ﷺ-এর শরিয়াহর অধিকাংশ বিধানকে খ্রিষ্টানদের জন্য নিষিদ্ধ হিসেবে প্রচার করতে থাকে। অথচ ইসা ﷺ নতুন কোনো শরিয়তসহ প্রেরিত হননি; বরং যে বিধানগুলো ইহুদিরা মুছে দিয়েছিল, সেগুলোই নতুন আকৃতিতে দ্বিতীয়বার উজ্জীবিত করার আদেশ নিয়ে তিনি এসেছেন। সঠিক আকিদা ও শরিয়তের মধ্যে বিকৃতি ও শিথিলতার ফলে অনেক অ-ইহুদি মুশরিকদের মধ্যে এই দ্বীনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। এই বিকৃতির ফলে পৌল ও হাওয়ারিদের মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, এমনকি যে হাওয়ারি তাকে সাহায্য করেছিল, সেও তার থেকে আলাদা হয়ে যায়।

মোটকথা তখন সত্য দ্বীনের অনুসারীগণ দুই ধরনের বিপদের মুখোমুখি হয়। একদিকে সেই সমস্ত বিশ্বাসের মুকাবিলা করা, যা সেন্ট পৌল প্রচার করা শুরু করেছে। অপরদিকে সেই জুলুম সহ্য করা, যা রোমান মুশরিকরা ইমানদারদের ওপর শুরু করেছে। সেই সময়েই আসহাবে উখদুদের ঘটনা সংঘটিত হয়, যার আলোচনা কুরআনে সুরা বুরুজে এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, ইয়ামানে এক বাদশাহ নিজেকে রব দাবি করত। এই বাদশাহর এক জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তার সমস্ত জাদু একজন শাগরিদকে শিক্ষা দেওয়ার আদেশ দেয়। জাদুকর একটি বুদ্ধিমান বালক চায়, যাকে সহজে সবকিছু শিখাতে পারবে। সেই বালক যে রাস্তা দিয়ে জাদুকরের কাছে যেত, সেই রাস্তার পাশে আল্লাহ তাআলার একজন নেক বান্দার খানকা ছিল, যিনি ইসা ﷺ-এর আনীত দ্বীনের ওপর সঠিকভাবে ইমান এনেছিলেন। বালক সেই রাহিবের কাছে গিয়ে ইমান গ্রহণ করে নেয়। এই কথা জানার পর বাদশাহ বালককে হত্যার আদেশ দেয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে কোনোভাবেই হত্যা করা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ বালক নিজেই বলে, 'যদি আমাকে সত্যিই হত্যা করতে চাও, তাহলে তা-ই করবে, যেমনটা আমি বলব।'

বালক তখন বাদশাহকে বলে, 'যদি সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত করে "বালকের রবের নামে" এই কথা বলে তির চালাও, তাহলে আমি মারা যাব।' বাদশাহ যখন সমস্ত মানুষের সামনে এমনটা করে, তখন সেই বালক শহিদ হয়ে যায়। এই বালকের শাহাদাত দেখে সমস্ত মানুষ মুসলিম হয়ে যায়; যার ফলে বাদশাহ অনেক রাগান্বিত হয়। সে তার সেনাদেরকে ময়দানে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করার আদেশ দেয়। অতঃপর একেক জন ব্যক্তিকে ধরে এনে এই সত্য দ্বীন থেকে ফিরে আসার আদেশ দেয়। যারা দ্বীন ত্যাগ করত, তাদের মুক্ত করে দেওয়া হতো। আর যারা করত না, তাদের আগুনে ফেলে দেওয়া হতো। মুফাসসিরগণ বলেছেন, সেদিন খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বীন থেকে ফিরে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল আসহাবে কাহফের ঘটনা। অধিকাংশ আলিমদের মত হচ্ছে, এই ঘটনা রোমান সাম্রাজ্যের এলাকা জর্ডানে হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই ঘটনা মুসলিমদের হিদায়াতের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই যুবকদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এই যুবকরা ইসা ﷺ-এর আনীত দ্বীনের ওপর বিশ্বাসী ছিল। কিছু ঐতিহাসিকের মতে তারা বাদশাহর দরবারি লোক ছিল। তাদের ইসলামের ব্যাপারে মুশরিক বাদশাহ জানার পর দ্বীনত্যাগ করার জন্য একদিনের সুযোগ দেয়। এই যুবকরা তাদের ইমান বাঁচানোর জন্য শহর থেকে পলায়ন করে এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে যায়। তাদের সাথে তাদের এক কুকুরও ছিল। আল্লাহ তাআলা এদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের ওপর ঘুম চাপিয়ে দেন। তিনশ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমেই কাটিয়ে দেয়। যখন জাগ্রত হয়, তখন সেই জমানার রোমানরা খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করে নিয়েছিল। মানুষরা তাদের চিনে ফেলে, কেননা পলায়নকারী ব্যক্তিদের ঘটনা হিসেবে তাদের কথা বড়দের

থেকে শুনেছিল। অতঃপর তারা গুহাতে পুনরায় ফিরে আসার পর আল্লাহ তাআলা তাদের মৃত্যু দিয়ে দেন। এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত ঘটনা, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা রোমান বাদশাহদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানদের ওপর অনেক নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করেছে। সেই জুলুমকারী বাদশাহদের মধ্যে নিরো (Nero), ডিয়োক্লেশন (Diocletian)-সহ আরও অনেকেই আছে।

দ্বিতীয় যুগ : খ্রিস্টবাদের উত্থানের জমানা (৩০৬–৫৯০ খ্রি.)

৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান বাদশাহ কনস্টান্টাইন প্রথম সিংহাসনে আরোহণের ফলে খ্রিষ্টানদের উত্থান শুরু হয়। বাদশাহর মাতার নাম ছিল হেলেনা (Helena)। ঐতিহাসিকদের মতে হেলেনা ২৫০ থেকে ৩০০ সালের মধ্যে খ্রিষ্টান হয়। হেলেনার শুরুজীবনের ব্যাপারে ইতিহাসে কোনো তথ্য নেই। কিন্তু খ্রিষ্টানদের প্রায় সমস্ত দল তাকে (Saint) সেন্ট-এর মর্যাদা দেয় এবং তার নামে দিবস পালন করে। ইতিহাসে এটাও প্রমাণিত যে, বাদশাহ তার মাকে অনেক মহব্বত করত এবং তার সমস্ত কথা মেনে নিত। রোমান বাদশাহ কনস্টান্টাইন তার মায়ের প্রভাবে খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং ৩২১ সালে বাদশাহ সরকারীভাবে তা ঘোষণা করে। বাদশাহ হওয়ার পর সে খ্রিষ্টানদের ওপর জুলুম বন্ধের পাশাপাশি সমস্ত খ্রিষ্টান বন্দীকে মুক্ত করে দেয় এবং তাদের থেকে পূর্বের বাদশাহদের বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। এখানে আমরা একটি বাস্তবতা স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি, যে সমস্ত ব্যক্তিকে সেই যুগে ঐতিহাসিকরা ইসায়ি হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের মধ্যে সত্য দ্বীনের অনুসারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করেনি; বরং তারা দুই দলের জন্য একই শব্দ উল্লেখ করেছিল।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই বাস্তবতা স্পষ্ট করেছেন যে, বাদশাহ কনস্টান্টাইনের সময়ে একদল ছিল সত্যপন্থী ও আরেক দল ছিল গোমরাহ। এই কথার প্রমাণ সেই যুগের ঐতিহাসিকদের আলোচনা থেকেও স্পষ্ট, কেননা তারা খ্রিষ্টানদের মধ্যে আকিদাগত বিভক্তির কথা বলেছেন। তাদের একদল ইসা ﷺ-কে আল্লাহর সন্তান মনে করত এবং আরেক দল আল্লাহর নবি মনে করত। এই দুই দলের মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব ছিল এবং কখনো কখনো তাদের মাঝে খুনাখুনিও হতো। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই দ্বন্দ্ব বন্ধ করার জন্য বাদশাহর পক্ষ থেকে ৩২৫ সালে নিকিয়া অঞ্চলে আহ্বান করা একটি প্রসিদ্ধ কনফারেন্স, যাকে ভ্রান্ত খ্রিষ্টবাদের ভিত্তি বলা হয়।

নিকিয়া কনফারেন্স (৩২৫ খ্রি.) ত্রিত্ববাদের জয়

নিকিয়া কনফারেন্সের (Council of Nicaea) বিস্তারিত আলোচনা এমন সব খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক করেছে, যারা নিজেরাই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। ৩২৫ সালে বাদশাহ কনস্টান্টাইন খ্রিষ্টবাদের মাঝে মতানৈক্য নিঃশেষ করার জন্য তার রাজ্যের প্রায় এক হাজার পাদরি ও আলিমকে দাওয়াতনামা পাঠায়, যাদের প্রত্যেকের সাথে দুজন করে শাগরিদকেও আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু এই এক হাজারের মধ্যে আড়াইশ থেকে তিনশ জন অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে শাম, ফিলিস্তিন ও তুর্কির সদস্য বেশি ছিল অর্থাৎ রাজ্যের পূর্বাংশ থেকে বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে রাজ্যের পশ্চিমের অংশগ্রহণ কম ছিল।

এই কনফারেন্সের এজেন্ডা ছিল ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং তার বিরোধীদের মধ্যে একটি ঐকমত্য তৈরি করা। এই কনফারেন্সে কয়েক মাস আলোচনা-পর্যালোচনার পর সকলেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেখানে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে খ্রিষ্টবাদের অংশ ঘোষণা করা হয় এবং পুরো দুনিয়ার শুধু চারটি ইনজিলের ওপর একমত হয়ে বাকি সমস্ত ইনজিলকে ভুল ও বাতিল ঘোষণা করা হয়। এই বাতিল ঘোষিত ইনজিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কিতাবও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহর নবি ইসা ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ওপর তিনজন ব্যতীত সবাই স্বাক্ষর করেছিল। যার ফলে খ্রিষ্টানদের মধ্যে সেন্ট পৌল থেকে ছড়ানো শিরকি বিশ্বাস একটি সরকারী ধর্মে পরিণত হয়। নিকিয়া কনফারেন্সের এই সিদ্ধান্ত আজকের সমস্ত খ্রিষ্টানদের মূল বিশ্বাস। যদিও পরবর্তীকালে ৩৮১ ও ৪৩১ সালের কনফারেন্সগুলোতে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়েছে; কিন্তু মৌলিক বিশ্বাস তা-ই ছিল, যা নিকিয়াতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

নিকিয়ার সিদ্ধান্তগুলো সেই দ্বীন ছিল না, যা ইসা ﷺ এনেছেন এবং সেখানে সেই ইনজিল গ্রহণ করা হয়নি, যা আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত ছিল। সেখানে সেন্ট পৌলের বিকৃত বিশ্বাস ও উলামায়ে সু'দের লিখিত বইসমূহ একটি দ্বীনের আকার ধারণ করে। ফলে খ্রিষ্টবাদ সরকারী ধর্ম ও নিকিয়া কনফারেন্সের বিশ্বাসগুলো তাদের মূল বিশ্বাসে পরিণত হয়। কেউ যদি এই আকিদা ও ইনজিলগুলোর সমালোচনা বা বিরোধিতা করত, তখন প্রশাসনের নির্যাতনের শিকার হতো। যার ফলে ইমানদারদের ওপর জুলুমের নতুন ধারা শুরু হয়, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত পর্যন্ত চলমান ছিল। সত্য দ্বীন মানুষের দৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হয়ে শুধু সরকারী বিশ্বাসগুলো টিকে থাকে। মোটকথা, খ্রিষ্টান ধর্ম রোমান বাদশাহদের দরবারে প্রতিপালিত হতে থাকে। এই জন্য তা জন্ম থেকেই আপসবাদী ও

চাটুকারিতার ধর্মে পরিণত হয়।[২৮] শুরু থেকেই খ্রিষ্টানদের দুটি বড় কেন্দ্র ছিল। একটি কনস্টান্টিনোপল—যা আজকের তুর্কির ইস্তাম্বুল ও অপরটি আজকের ইতালির শহর রোম।

ধর্মহীনতার ফিতনা প্রতিরোধ

গ্রিক সূচনাকাল থেকেই শিরক ও ধর্মহীনতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। আনুমানিক খ্রি.পূ. তিনশ সালে সেখানে এরিস্টটল (Aristotle) ও প্লেটোর (Plato) দর্শনের জন্ম হয় এবং ইউরোপের অনেক অংশকে তা প্রভাবিত করে। গ্রিক দর্শনের ভিত্তি ছিল আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার ও ইলমে ওহির বিপরীতে মানববুদ্ধিকে অগ্রগামী প্রমাণ করা। গ্রিকের ধর্মহীন দর্শন মূলত ছিল ধর্মের বিরোধিতা। খ্রিষ্টানরা শুরু থেকে এই দর্শনের মোকাবিলা করতে থাকে। একসময় পঞ্চম শতাব্দীতে যখন রোমান সাম্রাজ্যের এলাকাগুলোতে এই ফিতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন খ্রিষ্টান ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পাদরি সেন্ট অগাস্টিন (Saint Augustine) (৩৫৪-৪৩০ খ্রি.) ময়দানে নেমে আসে। সে বুদ্ধিপূজার এই ফিতনাকে বিতর্ক ও প্রশাসনিক শক্তি দ্বারা প্রতিহত করে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেয়। কিছু খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের মতে সেন্ট অগাস্টিনই সে ব্যক্তি, যে ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে প্রথমবার সেক্যুলার ও ধর্মবিরোধিতার পরিভাষা ব্যবহার করে। মোটকথা, এই ফিতনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। এবং পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আনুমানিক ৯শ বছর খ্রিষ্টান ইউরোপে আর ধর্মহীনতার ফিতনা মাথা উঁচু করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে গির্জার দুর্নীতির সুযোগে ধর্মহীনতা পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে গির্জাকে পরাজিত করে। যার আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

---

২৮. মুসলিম দেশগুলোর পরাজিত মানসিকতার সেক্যুলার শ্রেণি ইসলামকে খ্রিষ্টবাদের ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখে ও দেখায়। যেমন, তারা মিথ্যা দাবি করে যে, খ্রিষ্টবাদের পোপতন্ত্র ও ইসলামের আলিম ও মাদরাসাগুলোর কার্যক্রম একই। বাস্তবতা হচ্ছে এই যুক্তি অনেকগুলো কারণে ভুল। এর একটি মূল কারণ হলো, খ্রিষ্টবাদ সর্বদাই সরকারী দরবারি ধর্ম হিসেবে ছিল। খ্রিষ্টান পাদরিরা শাসকদের জুলুমে অংশীদার ছিল এবং শাসকদের জুলুমকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তারা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলেছিল। পক্ষান্তরে ইসলামের পুরো ইতিহাস সাক্ষী যে, আমাদের আলিমরা মৌলিকভাবে সর্বদা শাসকদের বিরোধী ও দরবার থেকে দূরে ছিলেন। যখনই কুরআন ও শাসক দুয়ের যেকোনো একটি বাছাইয়ের পরিবেশ এসেছে, তখন তারা কুরআনকেই বাছাই করেছেন। এই সর্বশেষ মুসলিম জাতির সামষ্টিক অনুভূতিও এমন যে, তারা কখনো ভ্রান্ত আলিমদের সম্মান করেনি। বরং জেলে মৃত্যুবরণকারী আবু হানিফা, গাধায় চড়িয়ে ঘুরানো মালিক বিন আনাস, চাবুকের আঘাতপ্রাপ্ত আহমাদ বিন হাম্বল, মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ইবনে তাইমিয়াকে নিজেদের ইমাম মেনেছে।

রোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি

৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্য (Roman Empire) পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। ইউরোপের মধ্যে তাদের অধঃপতনের কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ সমস্যা। ঐতিহাসিকগণ চারিত্রিক অশ্লীলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে পতনের মূল কারণ মনে করেন। পশ্চিম ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ক্ষমতা পূর্ণভাবে পূর্ব ইউরোপের হাতে চলে আসে, যাকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য (Byzantine Empire) বলা হয়। এই সাম্রাজ্যের সাথেই ইসলামের শুরুতে সাহাবিদের মোকাবিলা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেন্ট বেনেডিক অফ নর্সিয়া (Saint Benedict of Nursia) খ্রিষ্টানদের মধ্যে রুহবানিয়্যাতের (বৈরাগ্যবাদ) ব্যবস্থা চালু করে, যা আজও প্রচলিত রয়েছে। এই ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান পুরুষ বা মহিলা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিজেকে গির্জার কাছে সোপর্দ করে দিত। তারা সেখানে বিবাহ করতে পারত না এবং কোনো বৈধ চাহিদাও পূরণ করতে পারত না। এই ব্যবস্থা গির্জার ভেতরে অশ্লীলতার এক নতুন রাস্তা খুলে দেয়, যা পরবর্তী সময়ে গির্জার ধ্বংসের কারণ হয়।

খ্রিষ্টানদের পরবর্তী যুগগুলো আলোচনার পূর্বে আমরা এই সময় পর্যন্ত জন্ম নেওয়া খ্রিষ্টবাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলো আলোচনা করব; যাতে সামনের ঐতিহাসিক আলোচনায় মূল খ্রিষ্টবাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

খ্রিষ্টবাদের বিশ্বাস

খ্রিষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সেন্ট পৌলের আবিষ্কৃত খ্রিষ্টবাদের আকিদাসমূহ :

- ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস
- শূলিতে চড়ানো ও কাফফারার বিশ্বাস
  - খ্রিষ্টান হওয়ার পদ্ধতি
  - পবিত্র ক্রুশ
- ইসা ﷺ-এর পুনর্জন্মের বিশ্বাস

ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস

খ্রিষ্টানদের কাছে রব হলো তিনজনের নাম কিংবা তাদের পরিভাষায় রব তিন জিনিসের সমষ্টি : বাবা, সন্তান ও পবিত্র আত্মা। তাদের দাবি অনুযায়ী এই তিনজন মিলে একজন খোদা, তিনজন মিলে তিন খোদা নয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই তিনজনের সম্পর্ক নিয়েও অনেক মতানৈক্য পাওয়া যায়। ইসায়িরা বলে বাবা হলো আল্লাহ তাআলার সত্তা, সন্তান আল্লাহ তাআলার সিফাতে কালাম এবং রুহুল কুদুস তার সিফাতে হায়াত এবং মহব্বত। আর এই গুণটি ইসা ﷺ-এর শরীরে প্রবেশ করেছিল।

জেনে রাখা দরকার, কুরআনে ইসা ﷺ-কে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর জন্মের জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুম। আল্লাহ তাআলার সিফাত বা সিফাতের হুলুল কখনোই এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ এই বিশ্বাসকে মেনে নেওয়ার দ্বারা হুলুল ও দেহবাদের শিরকি আকিদা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়ে যায়। হুলুল ও তাজসিম দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার কোনো সিফাত বা অংশ মাখলুকের ভেতর প্রবেশ করা বা মাখলুকের আকৃতি ধারণ করা, যা আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে কঠিন শিরকি বিশ্বাস।

শূলিতে চড়ানো ও কাফফারার বিশ্বাস

ইসা ﷺ-এর ইলাহি সিফাত ধারণ ও তাঁকে আল্লাহর সন্তান ঘোষণা দেওয়ার পর শূলিতে চড়ানোর ঘটনাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য খ্রিষ্টানরা কাফফারার বিশ্বাস আবিষ্কার করে। যার মূল বিষয় হচ্ছে, আদম ও হাওয়া ﷺ থেকে সংঘটিত ভুলের দায়ভার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছড়িয়ে যেতে থাকে। আল্লাহ তাআলার ইনসাফের দাবি হলো, সমস্ত মানুষের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা। অপরদিকে রহমতের দাবি হলো অপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়া। এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা (নাউজুবিল্লাহ) ইসা ﷺ-এর মধ্যে নিজের রহমতের সিফাত ঢেলে দেন। ইসা ﷺ-এর মানব-শরীরে সবার অপরাধ প্রবেশ করিয়ে দেন এবং রুহুল কুদুসের হুলুলের মাধ্যমে সিফাতে রহমত তাঁর শরীরের চলে আসে।

সন্তানের মধ্যে থাকা সিফাতে রহমত সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করার জন্য কাফফারা হিসেবে নিজেই নিজেকে ক্রুশে চড়িয়ে দেন। এখন মানুষ দোজখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য শুধু এতটুকুই কর্তব্য যে, সে আল্লাহ তাআলার এই কাজকে স্বীকার করে নেবে। অর্থাৎ ইসা ﷺ-কে আল্লাহর সন্তান মেনে খ্রিষ্টান হয়ে যাবে (নাউজুবিল্লাহ)।

খ্রিস্টান হওয়ার পদ্ধতি

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস গ্রহণের জন্য ইসায়ি ধর্মের ব্যপ্টিজম (Baptism) ও খোদায়ি খাবার (Lord's Supper) উৎসব পালন করা হয়। ব্যপ্টিজম হচ্ছে যখন কেউ খ্রিষ্টান হয়, তখন তার ওপর বিশেষ পানি ছিটিয়ে পবিত্র করা হয়। এই সময় খ্রিষ্টান হওয়া ব্যক্তি সাদা কাপড় পরিধান করে। খ্রিষ্টানদের ব্যপ্টিজমের ভিত্তি হচ্ছে, যখন ইসা ﷺ মানুষকে তাওবা করাতেন, তখন নদীতে গোসলের আদেশ দিতেন, তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন, সেখানে শরবত ও বিশেষ রুটি বণ্টিত হতো।

পবিত্র ক্রুশ

ইসা ﷺ-কে ক্রুশে চড়ানোর ওপর নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশের জন্য তারা পবিত্র ক্রুশের বিশ্বাস চালু করে। এটি শুরু হয় কনস্টান্টাইনের সময় থেকে, কারণ সে নাকি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আকাশে ক্রুশের চিহ্ন দেখতে পায় এবং এর ফলে যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। অতঃপর ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী বাদশাহর মা সেন্ট হেলেনা কোনো এক জায়গা থেকে সেই ক্রুশ নাকি পেয়ে যায়, যেটাকে ইসা ﷺ-কে শূলিতে চড়ানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যেকোনো বিপদের সময় এই ক্রুশকে উঁচু করে ধরা হতো। এরপর থেকে খ্রিষ্টানরা প্রত্যেক পবিত্র কাজের শুরুতে, খুশি ও খারাপ সংবাদে আঙুলের ইশারায় চেহারা ও বুকের ওপর ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কন করে এবং ক্রুশকে তাবিজ বানিয়ে গলায় লটকাতে থাকে।

ইসা ﷺ-এর পুনর্জন্মের বিশ্বাস

খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হচ্ছে, ইসা ﷺ কিয়ামতের পূর্বে দ্বিতীয়বার আগমন করবেন এবং বিশাল হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন। এই বিশ্বাসকেই দ্বিতীয় জীবন বলা হয়। খ্রিষ্টানদের কাছে এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সিফাতে হায়াত। তাদের দাবি অনুযায়ী ক্রুশে চড়ানোর তৃতীয় দিন হাওয়ারিদের সামনে ইসা ﷺ নিজেই এসেছিলেন এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসবেন। তখন দুনিয়ার খারাপ শক্তিগুলোকে পরাজিত করে বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন। এই আকিদা মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে থাকা মাসিহের আকিদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইউরোপের ইতিহাস

খ্রিষ্টবাদের প্রথম দুই যুগের সম্পর্ক ছিল তুর্কি, শাম ও ফিলিস্তিনের সাথে; কেননা খ্রিষ্টানদের উত্থান সেই এলাকাগুলো থেকেই হয়েছিল। এগুলো ছিল খ্রিষ্টানদের পূর্বাংশ এবং ইউরোপকে খ্রিষ্টানদের পশ্চিমাংশ বলা হতো। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ও সাহাবিদের বিজয়সমূহ খ্রিষ্টানদের পূর্বাংশকে পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেয়। ফলে খ্রিষ্টবাদ শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে তারা নিজেদের শক্তিশালী করার জন্য মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই যদি এটা বলা হয়, ইউরোপকে নতুনভাবে গঠনকারী শক্তি রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা, তাহলে তা ভুল হবে না।

যেমনটা আমরা ওপরে বলে এসেছি, খ্রিষ্টানদের বাকি যুগগুলোর আলোচনা ইউরোপের ইতিহাসে করব, কেননা এগুলো ইউরোপের ইতিহাসেরও অংশ। ইউরোপের নতুন ইতিহাস তিনটি বড় অংশে বিভক্ত। যার শেষ অংশে আবার দুটি ভাগ রয়েছে।

- অন্ধকার যুগ (৫৯০-৮০০ খ্রি.)
- মধ্যযুগ (৮০০-১৪৫৩ খ্রি.)
- রেনেসাঁর যুগ (১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রি.)
    - যুক্তিবাদের যুগ (১৪৫৩-১৬৭৫ খ্রি.)
    - আলোকায়নের যুগ (১৬৭৫-১৭৮৯ খ্রি.)

ইউরোপের ইতিহাসের ধাপগুলোর ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো এতিহাসিকের মতে, এই বিন্যাসটি সেক্যুলার ঐতিহাসিকরা পেশ করেছে, যারা খ্রিষ্টানদের উত্থানকে অন্ধকার যুগ ও পতনকে আলোকিত যুগ হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমান সময়ে যেহেতু সেক্যুলার ব্যবস্থা ও তাদের চিন্তাধারা বিজয়ী, তাই এখন ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিন্যাস হিসেবে এটাকেই বিবেচনা করা হয়। তাই আমরাও এটাকে উল্লেখ করেছি। কারণ এখানে ইউরোপের ইতিহাস বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং সেসব প্রতিক্রিয়াকে মুসলিমদের সামনে নিয়ে আসা উদ্দেশ্য, যার সাথে বর্তমান সময়ের মুসলিম উম্মাহ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সম্পর্ক রয়েছে।

ইউরোপের অন্ধকার যুগ (৫৯০–৮০০ খ্রি.)

ইউরোপের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে ডার্ক এজ বা অন্ধকার যুগ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ এর তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন, যা নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতন

কিছু ঐতিহাসিকের মতানুযায়ী এই পরিভাষার সর্বপ্রথম ব্যবহার ১৩৩০ সালে ইতালির ঐতিহাসিক পেত্রার্ক করেছিল। সে পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে[২৯] ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতন হিসেবে গণ্য করে অন্ধকার যুগ ঘোষণা দিয়েছিল। এ ছাড়াও বলেছিল, রোমানরা আবারও উন্নতি করবে এবং ইউরোপের এই অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসবে।

২. ইউরোপের অন্ধকার যুগ ও ইসলামের উত্থান

সপ্তম শতাব্দীতে জাজিরাতুল আরবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অতঃপর ৩০ বছরের কম সময়ে এই দ্বীন পুরো আরবে বিজয়ী হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অফাতের পর প্রথম খলিফা আবু বকর رضي الله عنه শামের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যেখানে সে সময় রোমান খ্রিষ্টানদের আবাদি ছিল এবং জুলিয়াস সিজারের শাসন চলমান ছিল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে চারটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম জেনারেলরা কয়েক বছরের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ পূর্ণভাবে বিজয় করে নেন। কায়সারের ক্ষমতা সংকীর্ণ হয়ে শুধু কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টবাদ যা রোমান সাম্রাজ্যের আবশ্যকীয় অংশ, তা ছোট হয়ে ইউরোপের অনেক সীমিত এলাকায় আবদ্ধ হয়ে যায়। সাহাবিদের হাতে পূর্বাংশে পরাজিত হয়ে আজও খ্রিষ্টবাদ পূর্ণভাবে ইউরোপে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। খ্রিষ্টানদের ইউরোপে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে।

---

২৯. এখানে রোম সাম্রাজ্যের পতন দ্বারা উদ্দেশ্য পশ্চিম ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের পতন, সামষ্টিকভাবে খ্রিষ্টবাদের পতন নয়। কেননা, রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব ইউরোপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তী সময়ে নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপেও রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়, যারা হোলি রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি রেখেছিল।

৩. ইউরোপে খ্রিষ্টসমাজ কর্তৃক গ্রিক দর্শনের বিরোধিতা

অন্ধকার যুগ বলার তৃতীয় কারণ সেক্যুলারিজম। কিছু সেক্যুলার ঐতিহাসিকের নিকট এই যুগে গির্জার পক্ষ থেকে গ্রিক দর্শন, সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতাকে প্রশাসনিক চাপের মাধ্যমে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। এবং এই আক্রমণ ও চাপের ফলে তাদের দাবি অনুযায়ী ইউরোপ বিজ্ঞানের উন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সেই সাথে খ্রিষ্টান পাদরিদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বাড়াবাড়ির ফলে ইউরোপে এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়, যার ফলে ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তাদের দাবি অনুযায়ী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বুদ্ধি, জ্ঞান ও স্বাধীনতার ওপর এই বাড়াবাড়ি প্রয়োগ হওয়াই ইউরোপে অন্ধকার যুগের কারণ। অনেক ঐতিহাসিকরা এই পরিভাষাকেই সঠিক মনে করেন না এবং এটাকে সেক্যুলার ঐতিহাসিকদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টান ধর্মের বিরোধিতা মনে করে। এটি অনেক দীর্ঘ এক আলোচনার বিষয়। কিন্তু এখান থেকে যে বিষয়টা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তা হলো সেই যুগে খ্রিষ্টবাদের পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশেই পতন শুরু হয়। অতঃপর এই যুগের শেষে এসে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মূর্খ ও হিংস্র গোত্রগুলোকে বাধ্য করে খ্রিষ্টান বানানো হয়।

ইউরোপের ইতিহাসের এই প্রথম যুগ পশ্চিম ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস থেকে শুরু হয়ে অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রান্সের বাদশাহ চার্লিম্যানের সিংহাসনে বসা পর্যন্ত চলমান ছিল। আরও ব্যাপকভাবে বললে, এই সময় ৫শ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এই সময়ে ইউরোপে একদিকে গৃহযুদ্ধ চলছিল এবং অপরদিকে খ্রিষ্টবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল। জেনে রাখা আবশ্যক যে, এই সময়ে পুরো ইউরোপে খ্রিষ্টানদের ক্ষমতার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি। কেননা পূর্ব ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য খ্রিষ্টানদের ক্ষমতা পূর্ণভাবে টিকিয়ে রেখেছিল। অতঃপর পশ্চিমে ৫৯০ সালে যখন গ্রেগোরি (১ম) পোপ হয়, তখন সে খ্রিষ্টবাদের প্রচারের সীমা জার্মানি ও ব্রিটেন পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়।

সেই সময় খ্রিষ্টান বা রোমান ক্যাথলিক চার্চই ছিল ইউরোপের একক শক্তিধর, যারা ইউরোপকে একত্রিত রেখেছিল। এমনকি চার্চ, স্টেট ও গির্জার ক্ষমতার এতটাই উত্থান হয়েছিল যে, ফ্রান্সের বাদশাহ চার্লিম্যানের সিংহাসনে বসার সময় তার মাথার মুকুট গির্জার পোপ রেখেছিল। সেই খ্রিষ্টান বাদশাহ মুশরিকদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছিল। অতঃপর নিজেকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যের অনুগত হওয়ার ঘোষণা করেছিল।

মধ্যযুগ (৮০০–১৪৫৩ খ্রি.)

ইউরোপের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে মধ্যযুগ (Middle Ages)। অন্ধকার যুগের পরিভাষার মতো মধ্যযুগের পরিভাষার ব্যাপারেও অনেক মতানৈক্য রয়েছে। এই পরিভাষাকে ইউরোপের সেক্যুলার ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করে। তাদের নিকট এই যুগটি খ্রিষ্টানদের উত্থানের যুগ এবং এই সময়ে বাদশাহ ও গির্জার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা উন্নতির চূড়ায় পৌছে যায়। এই যুগেই খ্রিষ্টানরা ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে নেয় এবং স্পেনের অনেক অঞ্চল মুসলিমদের থেকে ছিনিয়ে নেয়। অপরদিকে গির্জার খারাপ কাজের কারনে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে গ্রিক দর্শনের মতাদর্শগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে, যা ছিল সেক্যুলার ঐতিহাসিকদের নিকট মানুষের অন্ধকার যুগ থেকে আলোকিত যুগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই যুগে তাদের ধর্মহীন চিন্তার শিকড় খুব কঠিনভাবে গেড়ে বসে এবং এই যুগকে ইউরোপে রেনেসাঁ (Renaissance) ও এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) আন্দোলনের প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু সেক্যুলার ঐতিহাসিক এই পরিভাষাকে বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে। আর তা হচ্ছে, এটা ওই হাজার বছরের এক ইতিহাস, যা হিউম্যানিজম (Humanism) আন্দোলনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মোটকথা আধুনিক যুগের চিন্তাগত ভিত্তি বোঝার জন্য ইউরোপের মধ্যযুগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের সবচেয়ে বড় ফিতনা মানবাধিকার (Human Rights) আন্দোলন ও গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান সেই যুগেই হয়েছিল। এগুলো ছিল গির্জা ও বাদশাহদের সেই শাসনব্যবস্থার বিরোধী প্রতিক্রিয়া, যা সেন্ট অগাস্টিনের দর্শন অনুযায়ী 'আল্লাহ তাআলার হুকুমত ও মানুষের হুকুমত' এই থিউরির মাধ্যমে গঠন করা হয়েছিল। তাই আমাদের জন্য এই বিষয়গুলো খুব গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

এই যুগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ইউরোপের মধ্যে সেক্যুলারিজম দ্বিতীয়বার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা। যা পরবর্তী সময়ে গির্জা ও বাদশাহদের শাসনব্যবস্থাকে পরাজিত করে।

এই যুগের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ব্ল্যাক-ডেথ বা সেই মহামারি, যা পুরো ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ আবাদি খতম করে দেয়। ফলে ইউরোপীয় সমাজগুলো কৃষি শিল্প ত্যাগ করে অন্য কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা ইউরোপের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বিশাল পরিবর্তন সৃষ্টি করে, যা আস্তে আস্তে কোম্পানি-ভিত্তিক বাণিজ্য ও নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয় এবং ফরাসি বিপ্লবের পর এটা পুঁজিবাদী সিস্টেমে পরিবর্তন হয়ে আজ আমাদের মাথার ওপর চেপে বসেছে। অপরদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও উন্নতির ধাপ পাড়ি দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের পর এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিচালনাকারী সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়ত, এই যুগেই ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা দুইশ বছর চলমান ছিল।

যেহেতু এই সবগুলোর সাথে বর্তমান জিহাদের চিন্তাগত ভিত্তিগুলো বোঝার সাথে গভীর সম্পর্ক আছে। তাই আমাদের চেষ্টা থাকবে এই যুগে সংঘটিত ঘটনা ও কার্যক্রমগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা।

সেন্ট অগাস্টিনের থিউরি (আল্লাহর শহর ও মানুষের শহর)

যেমনটা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর তা টুকরা টুকরা হয়ে যায়। যেহেতু রোমান বাদশাহরা গির্জার সংরক্ষণকারী হিসেবে গণ্য হয়, তাই সেই সাম্রাজ্যের পতনের ফলে পশ্চিমা খ্রিষ্টানরা ঝুঁকির মুখে পড়ে যায় এবং সেই অবস্থাতেই সেন্ট অগাস্টিন—যে রোমান গির্জার পাদরি ছিল—৪১৫ সালে 'আল্লাহর শহর ও মানুষের শহর' এই প্রসিদ্ধ মতাদর্শ পেশ করে। সেন্ট অগাস্টিনের এই থিউরি গির্জা, বাদশাহ ও জনগণের মাঝে পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে। ইউরোপের অন্ধকার যুগে এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয় এবং মধ্যযুগে এই শাসনব্যবস্থা উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে যায়। এটাই ছিল সেই শাসনব্যবস্থা, যাকে আজকের ঐতিহাসিকগণ ইউরোপের ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলে থাকে। সামনে আমরা এই শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

সেন্ট অগাস্টিনের পেশকৃত থিউরিতে চারটি অংশ ছিল :

- গির্জা
- বাদশাহ
- জাগিরদার
- জনসাধারণ

অগাস্টিনের থিউরি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা দুই ধরনের বিশ্ব বানিয়েছেন। একটি চিরস্থায়ী দুনিয়া, যেখানে মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষ চিরকাল থাকবে এবং অপরটি পারিপার্শ্বিক দুনিয়া, যেখানে আজ মানুষরা রয়েছে। চিরস্থায়ী দুনিয়াতে শুধু আল্লাহ তাআলাই হুকুমত চলে এবং সেখানে থাকার মর্যাদা অর্জন করাই মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। সেই চিরস্থায়ী দুনিয়ার সম্পর্ক মানুষের রুহের সাথে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সম্পর্ক মানুষের শরীর ও তার প্রয়োজনাদির সাথে। পৃথিবীতে থাকা গির্জাগুলোর সম্পর্ক মূলত চিরস্থায়ী দুনিয়ার সাথে। মূল গির্জা হচ্ছে আসমানে অবস্থিত আল্লাহ তাআলার ঘর, সেই গির্জার প্রধান হচ্ছেন ইসা ﷺ। জমিনের গির্জার পাদরি ও রাহিবরা রুহানিভাবে আসমানি গির্জার সাথে সম্পৃক্ত। অগাস্টিনের মতানুযায়ী ইসা ﷺ সেই চিরস্থায়ী দুনিয়ার গির্জার প্রধান এবং দুনিয়ার বাকি গির্জাগুলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মতো। মাথা ও শরীরের মধ্যকার যেমন সম্পর্ক, ইসা ﷺ ও পাদরিদের মধ্যে তেমনই সম্পর্ক।

এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে গির্জাই চিরস্থায়ী দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার হুকুমতের প্রতিনিধি, জমিনের মধ্যে যা রোমে অবস্থিত। গির্জা ও পোপরা এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন পরিচালনা করে। যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, তারা আল্লাহ তাআলার হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে রয়েছে পাদরি, বিশপ ও রাহিব। তারা আল্লাহর শহরে বসবাস করে। তাই আজও রোমের গির্জার শহরকে ভ্যাটিকান বা আল্লাহর শহর বলা হয়। আল্লাহ তাআলার এই হুকুমতের বাইরে হচ্ছে মানব-হুকুমত। কিন্তু মানুষের হুকুমতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা আল্লাহর হুকুমত থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনমতো চলবে; বরং মানুষের হুকুমত আল্লাহ তাআলার হুকুমতেরই আনুগত্য করে চলবে। গির্জার পাদরিরাই বাদশাহকে জনগণের ওপর শাসন করার আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রদান করত। এই ক্ষমতা প্রদানের পরেই সে জনগণের বৈধ শাসক হিসেবে গণ্য হতো। তাই বৈধ শাসক সে-ই হতো, যাকে গির্জার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হতো। আর সমস্ত জনগণকে এই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হতো। বাদশাহদের কাজ হতো, নিজের অধীন জনগণকে এই বিশ্বাস অনুযায়ী পরিচালিত করা।

শুরুতে গির্জা দুভাগে বিভক্ত ছিল। একটি পূর্বাংশ, যার কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল, যার প্রধানকে বিশপ বলা হয়। অপরদিকে পশ্চিমাংশের কেন্দ্র ছিল ইতালির রোম, যার প্রধান পাদরিকে পোপ বলা হতো। যেহেতু খ্রিষ্টানদের উত্থান পূর্বাংশ থেকে হয়েছিল, তাই মহা বিশপকে বড় ও রোমের পোপকে দ্বিতীয় অবস্থানে গণ্য করা হতো। পশ্চিমে খ্রিষ্টানদের উত্থানের ফলে রোমের পোপের পাল্লাও ভারী হয়ে যায়। আস্তে আস্তে পূর্বাংশের গির্জা ও পশ্চিমের গির্জার মধ্যে মতানৈক্য হয়ে দুটাই একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যায়। কনস্টান্টিনোপলের গির্জা অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের কেন্দ্র হয়ে যায় এবং রোমের গির্জা ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এভাবেই খ্রিষ্টানরা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়।

পোপ ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ পিতা। এটি খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটি উপাধি হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। যা রোমের বড় পাদরির জন্য নির্দিষ্ট। খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, মাসিহের সাথে তার কিছু প্রিয় বান্দার সর্বদা কথা হয়, যাদের কথা ও কাজ আমাদের জন্য হুজ্জত বা দ্বীনের উৎস। যেহেতু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুজুর্গ ব্যক্তিকে গির্জার প্রধান হিসেবে নির্বাচন করা হতো, তাই প্রধান পোপের আদেশকে আল্লাহ তাআলার আদেশ হিসেবে মান্য করা হতো। খ্রিষ্টানদের পরিচালনা করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা রোমের ক্যাথলিক গির্জার হাতেই ছিল। তাদের সর্বোচ্চ হাকিমিয়্যাহ বা বিধানদাতার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক চাহিদা এই ছিল যে, বাদশাহ ও জাগিরদারদের সমস্ত শক্তি গির্জার সম্মান ও পোপের আনুগত্যে ব্যয় করবে।

গির্জার শাসনব্যবস্থা ও বাদশাহর অবস্থান

যেহেতু খ্রিষ্টানদের নিকট মানুষের ক্ষমতা স্বাধীন ক্ষমতা নয়; বরং গির্জার অধীনে পরিচালিত; তাই বাদশাহ গির্জার প্রণীত সিদ্ধান্তের অধীনেই শাসন পরিচালনা করতে বাধ্য। ৯ম শতাব্দীতে চার্লিম্যানই প্রথম বাদশাহ, যে সরকারীভাবে রোমের পোপ গ্রেগোরির হাতে মুকুট পরিধান করে এবং সারা জীবন গির্জার বিজয়ের পথে ব্যয় করে। সে রোমের পোপের আদেশে অনেক মুশরিক গোত্রকে খ্রিষ্টান বানায় এবং তার যুগে ইউরোপে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বা হোলি রোমান এম্প্যায়ার প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিষ্টানরা সর্বপ্রথম তার যুগেই ইংল্যান্ডে পৌঁছে এবং দশম শতাব্দীতে এই রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা জার্মান জাতির হাতে চলে যায়। যারা তাদের শাসনের যুগে এই সাম্রাজ্যকে অনেক শক্তিশালী করে। এমনকি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের পুরো এলাকাতে এর সীমানা ছড়িয়ে পড়ে। রোমান সাম্রাজ্য সেন্ট অগাস্টিনের সংবিধানকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে হোলি রোমান এম্প্যায়ারের শাসন দুর্বল হতে থাকে এবং কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে কয়েকটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত এই সমস্ত সাম্রাজ্য গির্জার আনুগত্যশীল ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ৩০ বছরের দীর্ঘ এক যুদ্ধ হয়, যা ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তির দ্বারা শেষ হয়। এই চুক্তির ফলে ইউরোপে নতুন নতুন স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। যার মধ্যে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জার্মান, বেলজিয়াম ও ইতালি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোই ছিল আজকের নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। পরবর্তী সময়ে যখন ধর্মহীনতার ফিতনা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং হিউম্যানিজম বা মানবাধিকার আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন এই রাষ্ট্রগুলোকে বৈধ রাষ্ট্র বানিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ এই রাষ্ট্রগুলো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রগুলোতে হোলি রোমান এম্প্যায়ারের ছাপ স্পষ্ট ছিল। সর্বশেষ ১৮০৬ সালে ফ্রান্সের বাদশাহ নেপোলিয়ন এই নিদর্শনকেও নিঃশেষ করে দেয়। যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

গির্জার শাসনে দুর্নীতি

ইউরোপে এক হাজার বছর যাবৎ আল্লাহর হুকুমত ও মানুষের হুকুমতের শাসনব্যবস্থা চলমান ছিল। কিন্তু সেখানে দুর্নীতি ছিল অনেক বেশি। গির্জা যেহেতু রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র ছিল, তাই যেমনিভাবে ইউরোপে বাদশাহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রোমান পোপদের বিশেষ ভূমিকা ছিল, তেমনিভাবে ইউরোপের প্রত্যেক বাদশাহও চাইত, যাতে তার ইচ্ছানুযায়ী নতুন পোপ নির্বাচন করা হয়। অপরদিকে প্রত্যেকটা বাদশাহর কাছে গির্জার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হতো, যাকে রোমের গির্জার প্রতিনিধি বলা হতো। প্রত্যেক বাদশাহর ইচ্ছা ছিল, তার কাছে পাঠানো প্রতিনিধি তার ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হবে। আর এভাবে বাদশাহ ও গির্জার মধ্যকার চাহিদাগুলোই তাদের মাঝে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার অনেক উদাহরণ ইতিহাসে রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

গির্জা ও বাদশাহদের দ্বন্দ্ব

ইউরোপের গির্জা ও বাদশাহদের মধ্যে বিজয়ী সে-ই হতো, যে অধিক শক্তিশালী হতো। যখন রোমের পোপ শক্তিশালী হতো, তখন সে বিজয়ী হতো এবং কখনো বাদশাহ শক্তিশালী হলে সে বিজয়ী হয়ে যেত। এই ঝগড়া রোমান সাম্রাজ্য ও নতুন পোপ নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়। রোমান সাম্রাজ্য যেহেতু মজবুত ছিল, তাই তারা পোপ নির্বাচনে প্রভাব ফেলত। গির্জার কার্যক্রমে বাদশাহদের অনুপ্রবেশের ফলে রোমের পোপরা অনেক অসন্তুষ্ট থাকত। অতঃপর হেনরি প্রথম যখন রোমান সাম্রাজ্যের বাদশাহ হয়, তখন সে ছিল বাচ্চা। তখন এর সুযোগ নিয়ে রোমের গির্জা বাদশাহদের পক্ষ থেকে পোপ নির্বাচনে অনুপ্রবেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কারণ হিসেবে বলা হয়, এটি একটি নিছক ধর্মীয় বিষয়; তাই এতে অধর্মীয় ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের কোনো অনুমতি নেই। এর পরিবর্তে পোপ নির্বাচনের জন্য দশজন পাদরির একটি কমিটি গঠন করা হয়। হেনরি বড় হওয়ার পর সে পোপদের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বসে। কিন্তু এই বিরোধিতার জবাবে পোপরা তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার ফরমান দেয়। ফলে জনগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার ছেলেকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। ১১২২ সালে গির্জা ও বাদশাহদের মাঝে একটি চুক্তির মাধ্যমে দশ জনের কমিটিকে মেনে নেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত এই কমিটিই পোপ নির্বাচন করে।

গির্জা ও বাদশাহদের মধ্যে দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় উদাহরণ পোপ বোনিফেস ও ফ্রান্সের বাদশাহ ফিলিপ দ্যা ফ্যায়ারের লড়াই। রোমের পোপ বোনিফেস ইউরোপের বাদশাহদেরকে এই ফরমান পাঠায় যে, মানুষের হুকুমতের প্রত্যেক সদস্যকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর হুকুমতের অধীন করে দেওয়া হোক। ফ্রান্সের বাদশাহ ফিলিপ এমনটা করতে অস্বীকার করে। ফলে রোমের পোপ ফিলিপ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু ফিলিপ ছিল শক্তিশালী বাদশাহ। সে ১৩০৩ সালে পোপ বোনিফেসকে গ্রেফতার করে; কিন্তু তিন দিন পর ছেড়ে দেয়। এই সমস্যা ছয় মাস পর পোপের মৃত্যুতে শেষ হয়। কিন্তু গির্জা ও বাদশাহর দ্বন্দ্ব চলমান থাকে এবং একসময় ফ্রান্সের বাদশাহ গির্জাকে রোম থেকে সরিয়ে ফ্রান্সের এভিগনন (Avignon) শহরে স্থানান্তরিত করে ফেলে। ফলে প্রায় একশ বছর পর্যন্ত রোমের পোপ ফ্রান্সের বাদশাহদের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। গির্জা ও বাদশাহদের দ্বন্দ্বের প্রমাণ 'মেঘনা কার্টা' (Megna Carta) প্রসিদ্ধ চুক্তি থেকেও দৃষ্টিগোচর হয়, যা জনগণ ও ব্রিটেনের বাদশাহ কিং জনের (King John) মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে গির্জা জনগণের সাথে ছিল। এই চুক্তির প্রথম অংশ ছিল বাদশাহ গির্জার কার্যক্রমে অনুপ্রবেশ করবে না। ইংল্যান্ডের বাদশাহ দ্বিতীয় হেনরির হাতে গির্জার প্রতিনিধি (Thomas Becket) থমাস বেকেটের হত্যা এই দ্বন্দ্বের একটি উদাহরণ। প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে জেরুজালেমের পাদরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে গির্জা ও বাদশাহদের দ্বন্দ্ব সামনে আসে। ইউরোপের পুরো ইতিহাস এই সমস্ত উদাহরণে ভরপুর। এই সমস্ত দ্বন্দ্বে জনগণ গির্জা ও বাদশাহদের চাপে পিষে মরছিল।

গির্জার অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি

গির্জা ও বাদশাহদের দ্বন্দ্ব ছাড়াও গির্জার অভ্যন্তরীণ অনেক দুর্নীতি ছিল। গির্জার রাহিবদের মধ্যে অনেক চারিত্রিক নোংরামি ছিল। ইতিহাসে পাদরি ও রাহিবদের অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের অনেক ঘটনা আছে। এ ছাড়াও দানের সম্পদ নিজেদের স্বার্থে খরচ করা, এই সম্পদ দ্বারা পাদরিদের আলিশান জীবনযাপন একটি প্রসিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

সর্বশেষ গির্জার ইতিহাসে 'মাফনামা' বণ্টন অনেক বড় দুর্নীতি হিসেবে সামনে আসে। পোপ ইনোসেন্ট দ্বিতীয় এই নীতি তৈরি করে যে, কেউ যদি গির্জায় বড় ধরনের দান করে বা কোনো গির্জা বানিয়ে দেয়, তাহলে গির্জা থেকে তাকে মাফনামা দেওয়া হবে। যার অর্থ এই ব্যক্তি যত অপরাধ করুক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তা ছাড়া সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি বদনাম সেই আদালতগুলো নিয়ে হয়েছিল, যা 'ইনকুইজিশন' নামে প্রসিদ্ধ। এই আদালত থেকে ইউরোপ ও স্পেনের মুসলিমরাসহ অনেক খ্রিষ্টানও রক্ষা পেত না। সামান্য থেকে সামান্য কারণে বা গির্জার কোনো কিছুর বিরোধিতা করলেই সাথে সাথে তার ওপর ধর্মত্যাগের মুকাদ্দামা চালানো হতো এবং তাকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। স্পেনের অসংখ্য মুসলিমকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ইহুদি এবং প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানও এই আদালতের বলি হয়।

গির্জার মধ্যে বিভক্তি (১০৫৪ খ্রি.)

মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১০৫৪ সালের রোমান ক্যাথলিক ও কনস্টান্টাইনের মধ্যে বিশাল বিভক্তি (Great Schism)। এই বিভক্তির কারণ ছিল একই সাথে বিশ্বাসগত, বংশীয় ও রাজনৈতিক। বিশ্বাস কেন্দ্রিক মতানৈক্য ছিল বাপ, ছেলে ও রুহুল কুদুসের অবস্থান নিয়ে। বংশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্তি ছিল পূর্ব দিকের গির্জা ইউনানি ও পশ্চিমের গির্জা ইতালিয়ান হওয়াকে কেন্দ্র করে। রোমান সাম্রাজ্য প্রথম থেকেই দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে ইউরোপে দুটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব ইউরোপে অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের অধীনে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় এবং পশ্চিম ইউরোপে গৃহযুদ্ধের পর বাদশাহ চার্লিম্যানের হাতে রোমান ক্যাথলিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব দিকের গির্জাগুলো অর্থডক্স নামে প্রসিদ্ধ ছিল, যাদের কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। আজও তুর্কি, শাম, লেবানন, আর্মেনিয়া, রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর বসবাসকারী খ্রিষ্টানরা অর্থডক্স গির্জার অনুসরণ করে। অন্যদিকে পশ্চিম দিকের গির্জাগুলো রোমান ক্যাথলিক নামে প্রসিদ্ধ ছিল, যাদের কেন্দ্র ইতালির রোম শহর। এদের সবার প্রধান ছিল পোপ। রোম শহরে ১১০ একর জায়গা আলাদা করা হয়, যার নাম ভ্যাটিকান সিটি। যাকে ১৯২৯ সালে ইতালির প্রশাসন পোপদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য রোমের পোপের

অধীনে স্বাধীন পোপীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করে দেয়। ভ্যাটিকান সিটি এখনো পশ্চিমা বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এই ধর্মের অনুসারী ইউরোপ ও আমেরিকাতেও পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টানদের বিভক্তির দুইশ বছর পর রোমের পোপ দুই দলের মধ্যে ঐক্য করার চেষ্টা করে এবং তাতে কিছু সফলতাও অর্জন করে। কিন্তু এই চেষ্টায় পানি ঢেলে দেওয়া হয়, যখন চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধে ক্রুসেডার সেনারা জেরুজালেম বিজয়ের জন্য বের হওয়ার পর সম্পদের ঘাটতি শুরু হয়। নিজেদের এই সমস্যা দূর করার জন্য ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপলের ওপর হামলা করে এবং সেখানে অনেক লুটপাট করে। উগ্রতার শিকার হয়ে সেখানের অর্থডক্স দলের সবচেয়ে বড় গির্জা আয়া সুফিয়াকে অসম্মানিত করে। তাদের প্রধান পাদরির সামনে বসে নাচ-গান করে। এই ঘটনার ফলে এই দুই দল আর কখনোই একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারেনি।

ইউরোপের শ্রেণি বিভাজনব্যবস্থা (জাগিরদার বনাম জনগণ)

যখনই জাগিরদারি ব্যবস্থার আলোচনা করা হয়, তখনই আমাদের সামনে জালিম জাগিরদারদের ছবি ভেসে ওঠে। যে নিজের খেত-খামারে মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটায়; কিন্তু তাদের অসুস্থ বাচ্চার জন্য টাকা দেয় না বা তাদের যুবতি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে আসে ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো জাগিরদারি ব্যবস্থার একটি দিক; কিন্তু এর মূল অংশটি মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য।

জাগিরদার ব্যবস্থা হচ্ছে, আঞ্চলিকভাবে জনগণের শৃঙ্খলা-বিন্যাস পরিচালনার সবচেয়ে পুরাতন সিস্টেম, যা বাদশাহরা জনগণকে পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ব্যবস্থা অনেক ইসলামি অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা খ্রিষ্টান ইউরোপ, রাশিয়া, পূর্ব চীন ও হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ব্যবস্থা মানবজাতির সবচেয়ে বেশি সময় যাবৎ প্রচলিত ও সবচেয়ে সফল ব্যবস্থা। তবে জেনে রাখা উচিত যে, এই ব্যবস্থার ভিত্তি, নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রত্যেক এলাকা ও বাদশাহর ভিন্নতায় ভিন্ন হয়ে থাকে। যেখানে এই ব্যবস্থায় বা জাগিরদারের ক্ষমতায় ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছিল কিংবা বাদশাহরা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তখন জাগিরদাররা নিজেরাই সেই এলাকার বাদশাহ হয়ে যেত এবং তাদের জুলুম ও নির্যাতন চরম আকার ধারণ করত, যা আজও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। বাদশাহ ও জাগিরদারদের এই জুলুমের ফলেই জনগণের মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, যা ইউরোপে মানবাধিকার আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং সেটাই পরবর্তী সময়ে বর্তমান গণতন্ত্রের আকৃতি ধারণ করে। তাই আমরা মনে করি, বর্তমান জিহাদের চিন্তাগত ভিত্তি বোঝার জন্য মুসলিমদেরকে জাগিরদার ব্যবস্থাকে বিস্তারিত বোঝা জরুরি।

জাগিরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাদশাহদের তিনটি বড় উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল জনগণ থেকে অর্থনৈতিক সেবা গ্রহণ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এলাকার শৃঙ্খলা-বিন্যাস পরিচালনা করা এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। পূর্বের জমানার জনগণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং এই কৃষি কাজ ফসলি জমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই বাদশাহ যখন কাউকে কোনো এলাকার পরিচালনার জিম্মাদারি দিত, তখন ফসলি জমির বিশাল অংশ তাকে দিয়ে দেওয়া হতো। অতঃপর জাগিরদাররা এই ভূমির ফসল ও আমদানি দ্বারা এলাকার শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিচালনা করত।

এই ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হতো ভূমির মালিকানা নিয়ে। এই ভূমি বাদশাহ জাগিরদারকে তার ব্যক্তি মালিকানাধীন বানিয়ে দেবে, নাকি এই ভূমির মালিকানা প্রশাসনের হাতে থাকবে এবং জাগিরদার শুধু তার ব্যবস্থাপক হবে? প্রথম অবস্থাতে জাগিরদারকে যখন জমিনের মালিকানা দেওয়া হতো, তখন সেই জাগিরদার অনেক শক্তিশালী হয়ে যেত এবং একসময় তার সন্তানরা সেই এলাকার বাদশায় পরিণত হতো।

ইউরোপের ইতিহাসে বাদশাহদের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি ছিল জাগিরদারকে ভূমির ব্যক্তিগত মালিক বানিয়ে দেওয়া। মালিক হয়ে যাওয়ার ফলে ইউরোপের জাগিরদারদের আলাদা একটি শ্রেণি তৈরি হয়ে যায়। যা আস্তে আস্তে এতটাই শক্তিশালী হয়ে যায় যে, তারা জনগণকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে ফেলে।

অন্যদিকে মুসলিমরা এই ব্যবস্থাকে ভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচালনা করত। ভূমি দেওয়ার সময় বাদশাহ জাগিরদারদের মালিকানা ও সরকারী মালিকানার ভূমি আলাদা করে দিত। জমিনের যেই অধিকাংশ অংশ দ্বারা এলাকার কার্যক্রম পরিচালিত হতো, সেটা সরকারী মালিকানাধীন থাকত। যার ফলে বিশেষ শ্রেণি ও জনগণের মধ্যে অতিরিক্ত পার্থক্য তৈরি হতো না। অপরদিকে ইসলামি এলাকাগুলোতে শরিয়াহ বাস্তবায়িত ছিল এবং জাকাত-উশরের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভূমির মালিক ও কৃষকের মাঝে স্পষ্ট ন্যায়-ভিত্তিক শরয়ি নীতিমালা ছিল; যার ফলে কোনো সমস্যা দেখা দিত না।

মুসলিমদের অঞ্চলেও জাগিরদারির অস্তিত্ব ছিল। জাগিরদার ব্যবস্থা বিকৃত হয়ে জুলুমের আকৃতি ধারণ করে, যখন তারা দ্বীনের বিধান বাস্তবায়ন ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের খ্রিষ্টানদের কাছে কোনো শরিয়াহ ছিল না; তাই এই ব্যবস্থা রোমের পোপ ও বাদশাহরা নিজেদের বানানো নীতিমালা দিয়ে পরিচালনা করত। এই নীতিগুলোর ক্ষেত্রে সম্মানিত শ্রেণিদের জন্য সহজ ব্যবস্থা রাখা হলেও জনগণের ওপর সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হতো।

জাগিরদার ব্যবস্থার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এলাকার শৃঙ্খলা ও বিন্যাস ঠিক রাখার জন্য উৎপাদিত ফসল থেকে এলাকার কাজি, পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত কর্মচারীর বেতন

সরবরাহ করা। এ ছাড়াও এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্থ এই ভূমি থেকেই অর্জিত হতো। যার দ্বারা বুঝে আসে, এই ব্যবস্থা এলাকার শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদিও পূরণ করত। এই ব্যবস্থার তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাদশাহর জন্য প্রয়োজনের সময় বাহিনীর রসদ সরবরাহ করা এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনা সদস্যের বেতন ও ঘোড়ার খোরাকিও এই জাগিরদারদের জিম্মাদারি ছিল। এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, জাগিরদার ব্যবস্থা জাগিরদারকে ক্ষমতা দানের পাশাপাশি অনেক বড় দায়িত্বও চাপিয়ে দিত।

ইউরোপে যা হতো, দায়িত্ব ও ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যহীনতার ফলে জুলুম ও বাড়াবাড়ি শুরু হতো। জাগিরদারকে জমির মালিক বানিয়ে দেওয়ার কারণে পুরো সমাজের মধ্যে শ্রেণি-বৈষম্য শুরু হয়ে যায়। যেখানে সবার ওপরে থাকত রোমের পোপ ও গির্জা। তাদের পরে যারা শাহি বংশের সাথে সম্পর্ক রাখত, তাদেরকে উঁচু শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হতো। এদের পরেই ছিল সম্মানিত শ্রেণি, যেখানে জাগিরদার, সেনাবাহিনীর বড় অফিসার ও নাইট এবং এলাকার পাদরিরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর বাইরে বাকি সমস্ত জনগণ ছিল সাধারণ শ্রেণির। ব্রিটেনে তাদেরকে কমন্স (Commons) বলা হতো।[৩০] সেই সময় বাস্তবিকভাবে সাধারণ জনগণের অবস্থা গোলাম থেকেও নিচে ছিল, যাদের কাজ ছিল শুধু জাগিরদারদের খিদমত করা। এর বিনিময়ে যা-ই পেত, সেটাই তাদের মেনে নিতে হতো। সাধারণ জনগণের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, তারা কোনো জাগিরদারদের পক্ষ থেকে জুলুমের শিকার হলে নিজের ইচ্ছা মুতাবিক অন্য জাগিরদারের কাছে কাজ করবে অথবা সমস্ত জাগিরদারদের থেকে দূরে গিয়ে অনাবাদি জমিনকে আবাদ করবে। এটা এমন অপরাধ ছিল, যার শাস্তি বন্দিত্ব বা মৃত্যু।

গির্জা, বাদশাহ ও জাগিরদারদের শয়তানি ত্রিভুজ

পোপ, বাদশাহ ও জাগিরদাররা জুলুম ও নির্যাতনের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। একেবারে সাধারণ কারণে জনগণের ওপর জুলুম ও নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দিত। তাদের থেকে ফসল ছিনিয়ে নেওয়ার পর তাদের প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত করা হতো না। সম্পদ জমা করা তাদের জন্য নিষিদ্ধের পর্যায়ে ছিল। ব্যবসা বা অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানো হতো। যদি আদায় করতে না পারত, তখন তাকে ও তার ব্যবসাকে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করত যে, তাকে ব্যবসা থেকে স্থায়ীভাবে হাত গুটিয়ে নিতে হতো। এমনকি তার ঘর এবং ইজ্জত-সম্মানটুকুও রক্ষা পেত না। ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এই সমস্ত কাজ গির্জার ছত্রছায়ায় আল্লাহ তাআলার নাম ব্যবহার করে করা হতো।

---

৩০. এরাই সেই শ্রেণি, যারা মানবাধিকারের যুদ্ধ শুরু করেছিল। অতঃপর মেঘনা কার্টা চুক্তিতে তাদের কিছু অধিকার মেনেও নেওয়া হয়েছিল। তাদের হওয়ার একটি জোট গঠন করা হয়, যাকে 'হাউস অফ কমন্স' বলা হয়। আজও ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষকে এই নামে ডাকা হয়।

মধ্যযুগে ইউরোপের জনগণের সামনে একদিকে ছিল গির্জা, অপরদিকে বাদশাহ ও তৃতীয় দিকে জাগিরদার। জনগণের অবস্থা এই ত্রিপক্ষীয় চাপে একজন গোলামের থেকেও বেশি খারাপ ছিল। এই অবস্থাটাই ইউরোপের মধ্যে ধর্মহীনতার সয়লাবের সুযোগ তৈরি করে দেয়। আর এই ধর্মহীনতা মানবাধিকার আন্দোলনের রূপ নেয়, যা সময়ের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়ে যায়।

মেঘনা কার্টা বা স্বাধীনতার মহান দলিল (১২১৫ খ্রি.)

১১৯৯ সালে এপ্রিল মাসে ইউরোপের খ্রিষ্টান হিরো ও ইংল্যান্ডের বাদশাহ (Richard, the Lion Hearted) রিচার্ড দ্যা লায়ন হার্টের মৃত্যুর পর তার ভাই 'জন' (John I) ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসে। জন তার শাসনের শুরুতেই বিপদে পড়ে যায়, যখন তার ও রোমের পোপের মধ্যে পাদরি নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। উভয় গ্রুপ তাদের নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে ইংল্যান্ডের পাদরি নির্ধারণ করতে চাচ্ছিল। এই দ্বন্দ্ব এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, একসময় গির্জার পক্ষ থেকে রোমের বাদশাহ জন-এর বাদশাহি ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং ফ্রান্সের বাদশাহকে তার দখলকৃত অঞ্চলগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাদশাহ জন-এর জন্য পরিস্থিতি অনেক খারাপ হয়ে যায়। বাদশাহর সিংহাসন থেকে অপসারিত হওয়ার সময়কালে ইংল্যান্ডের সমস্ত গির্জায় ইবাদত বন্ধ হয়ে যায়। জনগণের মধ্যে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে জাগিরদাররাও বাদশাহ জন-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

বাদশাহ জন-এর সামনে নিজের শাসন-ক্ষমতা বাঁচানোর জন্য তখন গির্জার সামনে হাতিয়ার ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না; তাই সে এমনটা করে এবং বাদশাহি বাঁচিয়ে নেয়। কিন্তু বাদশাহর বিরুদ্ধে জনগণ ও জাগিরদারদের বিদ্রোহ পুরোদমে চলমান ছিল। বাদশাহ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য গির্জার কাছে অনুরোধ জানায়, তখন গির্জা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে বাদশাহ ও জনগণের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই চুক্তিকে মেঘনা কার্টা (Megna Carta) বা স্বাধীনতার মহান দলিল বলা হয়। এই চুক্তির অধীনে বাদশাহ জনগণের কিছু দাবি মেনে নেয়। যার মধ্যে একটি ছিল, কোনো অপরাধ ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না, যা বর্তমান পরিভাষায় নিরপরাধ গ্রেফতারের নীতি বলা হয়। এই চুক্তিতে আরেকটি বিষয় ছিল জনগণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা। যেই কমিটির কাজ হবে শুধু জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদশাহকে পরামর্শ দেওয়া। ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ এটাকে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ মনে করে। বাস্তবে এমনটাই হয়েছিল, কারণ এক শতাব্দীর ভেতরেই বাদশাহ জন-এর পৌত্র এডওয়ার্ড প্রথম পার্লামেন্টের ভিত্তি স্থাপন করে। এটা শুধু ইংল্যান্ড নয়; বরং পুরো ইউরোপের প্রথম পার্লামেন্ট ছিল। মেঘনা কার্টা চুক্তি বাদশাহ উইলিয়ামের সেই চুক্তিকেও বাতিল করে দেয়, যেখানে বাদশাহ একটি বিরান ভূমিকে নিজ এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

মোটকথা মেঘনা কার্টা চুক্তি ইউরোপীয় বিশ্বে পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মেঘনা কার্টাকে আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকা প্রত্যেকটা আইন এবং মানুষের বানানো নীতিমালার উৎস ও ভিত্তি মনে করা হয়। এই মেঘনা কার্টাই আজকের মানবাধিকার আন্দোলনের শুরু, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে পশ্চিমাদের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আজও হচ্ছে। মেঘনা কার্টাই ছিল পশ্চিমে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে দেওয়ার মূল উৎস।

মধ্যযুগে সেক্যুলারিজমের সূচনা

মধ্যযুগে ধর্মহীনতার বিষাক্ত কীটগুলো ইউরোপে জন্ম নিতে শুরু করে। ঐতিহাসিকরা এর তিনটি কারণ উল্লেখ করে থাকে। প্রথমটি মেঘনা কার্টা চুক্তি, দ্বিতীয়টি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়টি প্যারিস ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রিক দর্শনের শিক্ষকদের বহিষ্কার, যারা পরবর্তী সময়ে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে এসে শিক্ষকতা শুরু করে। কিছু ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, মেঘনা কার্টা চুক্তির অধীনে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে অনাবাদি জমি সাধারণ মানুষরা ব্যবহার শুরু করে। এই সমস্ত ভূমি আবাদের ফলে নতুন সমাজাচার অস্তিত্বে আসা শুরু হয়। সাধারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীরা এখানে আসতে থাকে, যারা পোপ ও জাগিরদার ব্যবস্থার অধীনে অনেক নির্যাতিত হচ্ছিল। তেমনিভাবে বিভিন্ন শহর গড়ে ওঠে, যেখানে ব্যবসা ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কারিগরি ও ব্যবসায়িক পেশার জন্য তারা সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠান ও কারখানা বানাতে শুরু করে। এই আবাদিগুলো ইতিহাসে 'গিল্ড' নামে পরিচিত।

শুরুতে এই আবাদিগুলোর জনগণ বাদশাহ বা গির্জার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হয়নি। যেহেতু সেই সময় শিক্ষা দেওয়ার অধিকার শুধু গির্জার হাতেই ছিল, তাই গিল্ড আবাদিগুলোর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। সেই সময় জনগণের কাছে প্যারিস ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী কিছু ব্যক্তি আসে, যাদেরকে গির্জার পক্ষ থেকে ধর্মহীন ঘোষণা করা হয়েছিল। কারণ তারা গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা শিক্ষার পর খ্রিষ্ট ধর্মের কিছু মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের চিন্তাধারাকে গির্জা কর্তৃক ধর্মত্যাগ (heresy) নাম দেওয়া হয়েছিল। এই ধর্মহীন ব্যক্তিরা ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে আসে এবং সেখানের জনগণের মধ্যে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করে, যারা গির্জার চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা থেকে দূরে ছিল। এভাবেই গিল্ড সমাজে ধর্মহীনতা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী দুই শতকের মধ্যে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভার্সিটিগুলো ইউরোপে এমনভাবে প্রসিদ্ধি পায় যে, পুরো ইউরোপ সেখান থেকে জ্ঞানের পিপাসা মিটাতে বাধ্য হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় দেড়শ বছর যাবৎ মুসলিম ভূখণ্ডে মুনাফিক বাহিনী তৈরি করে পাঠাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাইন্টিফিক সোসাইটি গঠন করা হয়, যাদের বাহ্যিক

উদ্দেশ্য পুরো দুনিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও রিসার্চগুলো একত্রিত করে প্রচার করা। যাতে বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতিতে সাহায্য করা যায়। কিন্তু মূলত তারা এর আড়ালে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে, যা পরবর্তী সময়ে ইউরোপে বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্বের সূচনা করে।

পরবর্তী সময়ে এই সমাজগুলো থেকেই ইংল্যান্ডে ধর্মহীনতার আন্দোলন শুরু হয়। সরকার ও ধর্মহীন জনগণের মধ্যে মানবাধিকারের নামে অনেক মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সামরিক যুদ্ধ হয়। যার ফলশ্রুতিতে মেঘনা কার্টা চুক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর ইংল্যান্ড থেকে যখন এই বিষয়গুলো পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন গির্জা ফ্রান্সের ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে। ফ্রান্সের বাদশাহগণ—যারা নিজেরাই কট্টর খ্রিষ্টান ছিল, তারাও গির্জাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে।

ওয়াইক্লিফের সংশোধন আন্দোলন (১৩৮৪ খ্রি.)

মধ্যযুগে গির্জার অনেক দুর্নীতি সামনে আসা শুরু হয়। কিন্তু এই দুর্নীতি প্রতিরোধে সক্ষম কোনো শক্তি তখন ছিল না। এমনকি যারাই তাদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে কথা বলত, তাদেরই মুখ বন্ধ করে দেওয়া হতো। এমনই একটি আন্দোলন ছিল ওয়াইক্লিফের আন্দোলন। (১৩৩০-১৩৮৪ খ্রি.) ওয়াইক্লিফকে রিফরমেশন বা সংশোধন আন্দোলনের জনক বলা হয়। ওয়াইক্লিফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করে এবং পরবর্তী সময়ে সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করে। পাশাপাশি সে আলাদা স্থানে রোমের গির্জা থেকে স্বাধীন এক চার্চে পাদরির দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকে। যখন ব্রিটেনের বাদশাহ তৃতীয় এডওয়ার্ডের কাছে তাকে রোমের গির্জার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়, তখন সে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওয়াইক্লিফ পোপের বিরুদ্ধে ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা নিয়ে কয়েকটি ছোট বই প্রচার করেছিল। যার ফলে এই বিষয়টা সমাধানের জন্য বাদশাহ পোপের প্রতিনিধিদের সাথে হওয়া কনফারেন্সে তাকেও প্রতিনিধি বানায়।

যদিও কনফারেন্স ব্যর্থ হয়েছিল; কিন্তু পার্লামেন্টে ওয়াইক্লিফ অনেক প্রসিদ্ধি অর্জন করে ফেলে। এরপর ওয়াইক্লিফ এমন একটি বই লিখে, যার মধ্যে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের ওপর অসততার অভিযোগ তোলা হয়। সেই সাথে সে অক্সফোর্ডে তার সাথিদের নিয়ে ল্যাটিন বাইবেলকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রচার শুরু করে দেয়। যা সেই সময় গির্জার নীতিতে নিষিদ্ধ ছিল। এই কাজের ফলে তাকে খ্রিষ্টান আদালতে পেশ করা হয়। আদালত থেকে তাকে ধর্মহীন ঘোষণা করা হয় এবং অক্সফোর্ড থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু সে নিজের মিশন চালিয়ে যায় এবং নিজের চার্চে পাদরির দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকে। সে প্রচারকদের একটি দল তৈরি করে, যারা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে।

তার মৌলিক শিক্ষা ছিল—

- আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করার জন্য কোনো পাদরি বা গির্জার প্রয়োজন নেই।
- যে কেউ খ্রিষ্টানদের পবিত্র কিতাবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে নিজের জীবনকে আলোকিত করে নিতে পারবে।
- খ্রিষ্টান আলিমদের জন্য উচিত ইনজিলে আলোচিত মাসিহ ও হাওয়ারিদের মতো ফকিরি জীবনযাপন করা।
- খ্রিষ্টবাদের মধ্যে যোদ্ধাবাজ ও গোলামের মতো শ্রম দেওয়ার কোনো বৈধতা নেই।

১৩৮৪ সালে তার মৃত্যুর পর শাগরিদরা তার অনূদিত ইনজিলকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে; কিন্তু তাদের কেউই তার আন্দোলনকে ধরে রাখতে পারেনি। তারপর অনেক সংশোধনকারী ব্যক্তি জন্ম নেয়, যার মধ্যে 'বোহেমিয়া'-এর 'জন হাস' অনেক প্রসিদ্ধ। সে যখন ওয়াইক্লিফের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রচার করে, তখন তাকে গির্জার হুকুমে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি স্বয়ং ওয়াইক্লিফের লাশকে কবর থেকে বের করে জ্বালানো হয়। অতঃপর সর্বশেষ ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলন সফল হয়, যার আলোচনা আমরা সামনে করব। এমনকি মার্টিন লুথার পর্যন্ত স্বীকার করেছিল যে, সে এই ক্ষেত্রে ওয়াইক্লিফের কাছে ঋণী।

ক্রুসেড যুদ্ধ (১০৯৫-১২৭১ খ্রি.)

মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ক্রুসেড যুদ্ধ। মূলত মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে ক্রুসেড যুদ্ধ আল্লাহর নবির জীবদ্দশা থেকেই শুরু হয়। মুতার যুদ্ধ ছিল প্রথম যুদ্ধ, যা মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ প্রথমবার মুসলিমদের জেনারেল হিসেবে সামনে আসেন। নবি ﷺ-এর জীবনে তাবুক যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ, যেখানে আল্লাহর নবি ﷺ নিজেই অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু সেখানে কোনো লড়াই হয়নি। রোমান খ্রিষ্টানদের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় উমর ﷺ-এর যুগে, যেখানে সাহাবায়ে কিরামের বিজয় অর্জিত হয়। বনু উমাইয়্যা ও বনু আব্বাসের সাথে কনস্টান্টিনোপলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ চলমান থাকে। কুসতুনতিনিয়া বিজয়ের প্রতি মুসলিমদের সর্বদাই আগ্রহ ছিল। কারণ কুসতুনতিনিয়া বিজয়কারী বাহিনীর জন্য আল্লাহর নবি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এই ফজিলত অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের বৃদ্ধ বয়সেও কুসতুনতিনিয়ার ওপর হামলাকারী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতেন। এমনই এক যুদ্ধে আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই তাঁর অফাত হওয়ায় তাঁকে কুসতুনতিনিয়া দুর্গের দেয়ালের পাশে কবর দেওয়া হয়।

পরবর্তী যুগে সেলজুক সুলতানরা বাইজেন্টাইনের ওপর আক্রমণ করে। এই সমস্ত যুদ্ধকেও ক্রুসেড যুদ্ধ বলা হয়। তবে ইতিহাসে দশম শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু হয়ে এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলমান যুদ্ধগুলো ক্রুসেড যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্ভবত এর কারণ ছিল ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করা। প্রথমবার আকসা মুসলিমদের হাত থেকে ছুটে যাওয়া ছিল ইতিহাসের অনেক বড় একটি ঘটনা। সেই সাথে ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ-এর নেতৃত্বের প্রসিদ্ধিও এর একটি কারণ হতে পারে, যারা মুসলিমদের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন। আবার এই ক্ষেত্রে সুলতান জাহির বাইবার্সের ব্যক্তিত্বও একটি কারণ হতে পারে, কেননা তিনি আইনে জালুতের যুদ্ধে শুধু হালাকু খানকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং খ্রিষ্টানদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে পৌনে দুইশ বছরের চলমান যুদ্ধকে সমাপ্ত করেন।

ক্রুসেড যুদ্ধ এখানেই শেষ হয়নি, উসমানি খিলাফতের সময় সংঘটিত পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের যুদ্ধগুলোও ক্রুসেড যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক মুসলিম উম্মাহর ওপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করাও ক্রুসেড যুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ভিন্ন অবস্থান ও ভিন্ন ধরনের যুদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই যুদ্ধগুলোকে ক্রুসেড-জায়োনিস্ট যুদ্ধ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সেই যুদ্ধগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আমরা এই কিতাবের দ্বিতীয় অংশে করব। এখানে আমরা মধ্যযুগের পৌনে দুইশ বছরের ক্রুসেড যুদ্ধগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ (১০৯৫-১০৯৯ খ্রি.)

প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় ১০৯৫ সালে রোমের পোপ উরবান ২য়-এর ঘোষণার মাধ্যমে। রোমের পোপ খ্রিষ্টান-বিশ্বে ছোটাছুটি করে সমস্ত বাদশাহকে আকসা ও ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করে। অতঃপর ইউরোপের সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী ধীরে ধীরে হামলা করে ফিলিস্তিন ও শামের বিশাল অংশ দখল করে নিতে সক্ষম হয় এবং ১০৯৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাসকে দখল করে নেয়। এরপর মুসলিমদের সাথে এমন পশুত্বের আচরণ করে, যার উদাহরণ ইতিহাসে অনেক কম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিষ্টানদের ঘোড়ার খুর পর্যন্ত মুসলিমদের রক্তে ডুবে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ (১১৪৭-১১৪৯ খ্রি.)

দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয় হালাবের আমির ইমামুদ্দিন জিনকি ﷺ খ্রিষ্টানদের শহর এডেসা দখলের মাধ্যমে। সে সময় যখন দুর্ভাগ্যবশত মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়, সেলজুক বাদশাহ—যাদেরকে মুসলিমদের উত্থান ও উন্নতির নিদর্শন মনে করা হতো—তারা তখন পতনের দিকে ধাবিত হয়। বাগদাদের খলিফা ও সেলজুকিদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে পড়ে। সেলজুকিদের মধ্যে যদিও তখন সুলতান সানজার

ও সুলতান মাসুদ জীবিত ছিলেন, যাদেরকে অনেক শক্তিশালী সুলতান মনে করা হতো; কিন্তু তারাও গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ ভুল বোঝাবুঝির ফলে মুসলিমদের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না। তখনই আল্লাহ তাআলা আতাবাকি বংশ থেকে ইমাদুদ্দিন জিনকি ﵀-কে শামের মসুল অঞ্চলে উত্থান ঘটান।

ইমাদুদ্দিন জিনকির অন্তর খ্রিষ্টানদের ফিলিস্তিন দখলের ফলে সর্বদা অস্থির থাকত। তিনি শাম ও ফিলিস্তিনকে খ্রিষ্টানদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য সুসংগঠিত কার্যক্রম শুরু করেন। তার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল শামের এডেসা শহর বিজয় করা। যা সেই সময় খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। এডেসা বিজয়ে পুরো ইউরোপে আগুন লেগে যায়। ফ্রান্সের বাদশাহ লুই অষ্টম ও রোমের প্রতিনিধি কনরাড তৃতীয় রোমের পোপের আদেশে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হয়। সেই সময় ইমাদুদ্দিন ﵀-এর ছেলে নুরুদ্দিন জিনকি ﵀ মাসুলের বাদশাহ ছিলেন। খ্রিষ্টানরা এসে দামেস্কে হামলা করে। দামেস্কে তখন একটি স্বাধীন হুকুমত ছিল এবং তারা নিজেদের প্রতিরোধে সক্ষম ছিল না। নুরুদ্দিন জিনকি দামেস্কের প্রতিরক্ষা করার পাশাপাশি এই অঞ্চলকে নিজের হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর এভাবেই দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের মুখে লাগাম পরিয়ে দেন।

তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৭-১১৯২ খ্রি.)

তৃতীয় ক্রুসেড সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀-এর ফিলিস্তিনে হামলা ও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর থেকে শুরু হয়। নুরুদ্দিন জিনকি ﵀ শিরকুহকে মিশরের গভর্নর বানান। তার অফাতের পর তার ভাতিজা সালাহুদ্দিন মিশরের গভর্নর হন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়কে নিজের জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেন। হিত্তিনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵀ ক্রুসেডার বাহিনীকে পরাজিত করে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করে নেন। ফিলিস্তিনে পরাজিত হওয়ার খবর শুনে পুরো ইউরোপে মাতম শুরু হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির বাদশাহ নিজেদের বাহিনী নিয়ে বের হয়ে আসে, যা ছিল তৃতীয় ক্রুসেড। ইংল্যান্ডের বাদশাহ রিচার্ড আক্কা ও জাফা বিজয় করে নেয়; কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে পারেনি। পরবর্তীকালে সালাহুদ্দিন ﵀-এর সাথে চুক্তি করে ফিরে যায়।

চতুর্থ ক্রুসেড (১১৯৭ খ্রি.)

১১৯৭ সালে রোমের পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্য কাজ শুরু করে। ১২০৬ সালে ফ্রান্সসহ অনেক রাষ্ট্র নিজেদের বাহিনী প্রেরণ করে। ফয়সালা হয় এই বাহিনী ইতালির শহর ভেনিস থেকে সমুদ্রপথে মিশরের দিকে রওয়ানা হবে। এই সফরের জন্য ৮১ হাজার রুপার মুদ্রা প্রয়োজন ছিল; কিন্তু খ্রিষ্টানদের কাছে ছিল মাত্র ৫১ হাজার রুপার মুদ্রা। ফলে খ্রিষ্টানদের যুদ্ধ-কার্যক্রম শুরু থেকেই অর্থনৈতিক সমস্যার শিকার হয়ে যায়। এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য তারা হাঙ্গেরির খ্রিষ্টান রাজ্য জারা

বিজয় করে নেয়। অতঃপর বাইজেন্টাইনিদের কুসতুনতিনিয়া দখল করে সেখানে এত পরিমাণ হত্যা-লুণ্ঠন করে যে, খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা বলেছে, যদি মুসলিমরা সেই অঞ্চল দখল করত, তাহলে এমন কিছুই করত না, যা খ্রিষ্টানরা করেছিল। এই কাজের ফলে তারা জেরুজালেমের দিকে রওয়ানা হতেই পারেনি; বরং খ্রিষ্টানদের এলাকাতেই মতানৈক্যের শিকার হয়ে দমে যায়।

পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৭-১২২১ খ্রি.)

পঞ্চম ক্রুসেডে হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার বাদশাহ অংশগ্রহণ করে। তারা মিশরের সুলতানুল কামেলের ওপর হামলা করে কিছু প্রাথমিক সফলতা অর্জন করে। কিন্তু সবশেষে খ্রিষ্টানরা পরাজিত হয় এবং তারা আট বছরের নিরাপত্তা চুক্তি করে ফিরে আসে।

ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২২৮-১২২৯ খ্রি.)

রোমান সাম্রাজ্যের বাদশাহ দ্বিতীয় ফ্রেডরিক বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের শপথ করে। সেই সময় সুলতান কামেলের হুকুমত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। অনেক যুদ্ধের পর বাদশাহ কামেল ফ্রেডরিকের সাথে দশ বছরের চুক্তি করে। এই চুক্তির অধীনে জেরুজালেম, নাসেরা ও বাইতুল লাহম দশ বছরের জন্য খ্রিষ্টানদের দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মাসজিদুল আকসা ও কুব্বাতে সাখরা মুসলিমদের হাতেই রয়ে যায়। ১২৪৪ সালের মধ্যে মুসলিমরা এই সমস্ত এলাকা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যার ফলে সপ্তম ক্রুসেড শুরু হয়।

সপ্তম ক্রুসেড (১২৪৮-১২৫৪ খ্রি.)

১২৪৮ সালে তাতারদের হামলা থেকে পিছপা হয়ে মিশর-ফেরত খাওয়ারিজম বাহিনী জেরুজালেমে থাকা খ্রিষ্টান বাহিনীকে পরাজিত করে শহরকে দখল করে নেয়। তার জবাবে ফ্রান্সের বাদশাহ লুই নবম মিশরে হামলা করে। ফ্রান্সের বাদশাহ তোরান শাহের হাতে পরাজিত হয় এবং নিজেও গ্রেফতার হয়। পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে মুক্ত হয়। এই যুদ্ধের বিশেষ বিষয় ছিল, এই যুদ্ধ জহির বাইবার্সের উত্থানের যুদ্ধ ছিল। যিনি পরবর্তী সময়ে হালাকু খানের বাহিনীকে পরাজিত করার সাথে সাথে খ্রিষ্টান বাহিনীকেও চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন।

অষ্টম ক্রুসেড (১২৭০ খ্রি.)

ফ্রান্সের বাদশাহ লুই নবম ১২৭০ সালে অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধের দামামা বাজায়। সেই সময় খ্রিষ্টানরা উত্তর আফ্রিকা থেকে ক্রুসেড হামলা শুরু করে। লুই নবম তার সেনাবাহিনী নিয়ে তিউনিসিয়া পৌঁছে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। ফলে এই হামলা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

নবম ক্রুসেড (১২৭১-১২৭২ খ্রি.)

লুইয়ের মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডের বাদশাহ নবম ক্রুসেড যুদ্ধ শুরুর চেষ্টা করে। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। সেই সময় মিশরের মামলুক সুলতান বাইবার্স আইনে জালুত স্থানে হালাকু খানের বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করার পর খ্রিষ্টান অধিকৃত অঞ্চলসমূহ—যার মধ্যে আন্তাকিয়া, আক্কা, তারাবুলুস ও জাজায়ির রোড অন্তর্ভুক্ত ছিল—দখল করে পৌনে তিনশ বছরের চলমান ক্রুসেড যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়।

মহামারি বা ব্ল্যাক ডেথ (১৩৪৭-১৩৫১ খ্রি.)

মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেই ঘটনা ইউরোপের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, তা হচ্ছে ভয়ংকর মহামারি, যা ইতিহাসে ব্ল্যাক ডেথ নাম প্রসিদ্ধ। ১৩৪৭-১৩৫১ সালে ইউরোপে মহামারি ছড়িয়ে গিয়েছিল; যার ফলে ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ আবাদি খতম হয়ে গিয়েছিল। তখনকার সময় এই মহামারিকে বিশাল ধ্বংস (Great Mortality) বলা হতো। ইউরোপের বিভিন্ন অবস্থা থেকে এই ঘটনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর একটি ফলাফল ছিল, খ্রিষ্টান অধিবাসীরা নিজেদের রাগ-দুঃখ ইহুদি ও অন্যান্য বহিরাগত দুর্বল শ্রেণির ওপর প্রয়োগ করতে শুরু করে। তারা অপবাদ দেয় যে, তারা পানি ও বাতাস খারাপ করে দিয়েছিল। যার ফলে এই মহামারি ছড়িয়ে গিয়েছে। এর ফলে অনেক স্থানে খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের একত্রিত করে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এর দ্বিতীয় প্রভাব ছিল, ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। শ্রমিকের ভাড়া কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং জাগিরদারদের আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে ইউরোপের জাগিরদার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। মানুষ রোজগারের আশায় কৃষি জমি ফেলে শহরের দিকে আসতে শুরু করে। সেই সাথে জাগিরদার ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে অধিকারের আন্দোলনে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার আরও কিছু প্রভাব দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, ইউরোপের জনশক্তি এতটাই কমে গিয়েছিল যে, সেখানে সব ধরনের ভাড়াটে শ্রমিক দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। যার দরুন যেসব শ্রমিক ছিল তাদের পারিশ্রমিক এতটাই বেশি হতো যে, কোনো জিনিস তৈরির পর তা অনেক দামি হয়ে যেত। কেউ তা খরিদ করতে পারত না। দ্বিতীয়ত, জনশক্তি কমে যাওয়ার ফলে বাজারে ক্রেতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এই অবস্থাই ইউরোপের সব রাষ্ট্রকে বিশ্বের নতুন নতুন বাজারের তালাশে বের হতে বাধ্য করে। সেই সময় হিন্দুস্থান পুরো দুনিয়াতে কাপড় ও বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করত; তাই সমস্ত রাষ্ট্রের আগ্রহ হিন্দুস্থানের দিকে ঘুরে যায়। সর্বপ্রথম পর্তুগাল অতঃপর হল্যান্ড-ফ্রান্স সর্বশেষ ব্রিটেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুস্থানে ব্যবসা শুরু করে। জাতীয় পর্যায়ে কোম্পানির ব্যবসার ক্ষেত্রে যখন অধিক অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ব্যাংক ও নতুন

কারেন্সির প্রচলন ঘটে। এখান থেকে নতুন এক ধরনের বাণিজ্য শুরু হয়। আর এর মাধ্যমে একদিকে পেপার কারেন্সি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর উন্নতি হতে থাকে। যা পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে ব্যবসার আড়ালে ব্রিটেন হিন্দুস্থানের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে বসে। হিন্দুস্থানের ওপর ব্রিটেনের দখল ছিল পুরো বিশ্বে পশ্চিমাদের উত্থানের উৎস। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু ঐতিহাসিকের মতানুযায়ী মহামারির আরেকটি প্রভাব হলো, এর ফলে ধর্মহীনতা ও সেক্যুলারিজম জনগণের মাঝে গ্রহণীয় হতে শুরু করে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেক্যুলার দার্শনিকরা ধর্মের ওপর কঠিন অভিযোগ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে যে, গির্জা এই বিপদকে কাবু করার পরিবর্তে শুধু ধৈর্যের পরামর্শ দিয়েছে। যদি মানুষ ধর্মের আনুগত্য না করে এই বিপদ থেকে মুক্তির চেষ্টা করত, তাহলে এই বিপদ থেকে অনেক আগেই মুক্তি মিলে যেত। এই চিন্তা পরবর্তী শতাব্দীতে শক্তিশালী হতে থাকে, যা সর্বশেষ ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে গির্জার পরাজয় ও ধর্মহীনতার বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

মধ্যযুগ ও ইহুদিবাদ

ইউরোপের ইহুদিদের সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছিল মধ্যযুগে। তখনকার যুগে ইহুদিরা মুসলিমদের আন্দালুসে বসবাস করত। তারা নিজেরাই সেই সময়কে ইহুদিদের সোনালি যুগ হিসেবে গণ্য করে। এখানে তারা উত্তর আফ্রিকার মুসলিম এলাকাগুলো থেকে এসেছিল। ইহুদিরা ইউরোপে আসার দ্বিতীয় রাস্তা ছিল তুর্কি হয়ে। কিন্তু এই পথে অনেক কম ইহুদি ইউরোপে এসেছিল, কেননা তারা মুসলিম-বিশ্বে জিম্মি হিসেবে নিরাপদে বসবাস করতে পারলেও খ্রিষ্টানদের হাতে গণহত্যার শিকার হতো। এই দুই রাস্তা দিয়ে আসা ইহুদিদের আজ সাফার্ডিক ইহুদি বলা হয়, তারা আজকের সমস্ত ইহুদির বিশ শতাংশ। এরাই বনি ইসরাইলের মূল বংশধর।

ইউরোপের মধ্যে ইহুদিদের সবচেয়ে বেশি আগমন ঘটে মোঙ্গলদের রাশিয়ার ওপর হামলার পর। তখন তারা রাশিয়া থেকে পলায়ন করে পোল্যান্ড এবং ইউরোপের পূর্বাংশে চলে আসে। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, কাফকাজের খিসার গোত্রের শাসক অষ্টম শতাব্দীতে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। ইহুদিরা খিসার গোত্রের মধ্যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জীবনযাপন করছিল। কিন্তু রাশিয়ার ওপর তাতারদের আক্রমণের ফলে সেখান থেকে পলায়ন করে পূর্ব ইউরোপে চলে আসতে বাধ্য হয়। অতঃপর এখান থেকে পুরো ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া ও পোল্যান্ড থেকে ছড়িয়ে পড়া ইহুদিদেরকে আশকানাজি ইহুদি বলা হয়, যারা আজকের সমস্ত ইহুদির আশি শতাংশ। এই আশি শতাংশ হচ্ছে মূলত ইহুদি দাবিদার, তারা আসল ইহুদি নয়; বরং খিসার গোত্রের ইহুদি।

মধ্যযুগ ছিল ইউরোপের ইহুদিদের জন্য বিপদের যুগ। ইউরোপের খ্রিষ্টানরা ইসা ﷺ-কে হত্যার চেষ্টার অপরাধের দরুন তাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই ইহুদিদের জন্য খ্রিষ্টান এলাকায় থাকা বা সরকারী চাকরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সেই সময়ের ইহুদিদের খ্রিষ্টান এলাকাগুলো থেকে দূরে নতুন আবাদি করে বসবাসের নির্দেশ ছিল। সেই ইহুদি আবাদিগুলোকে রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের বার (ghetto) বলা হতো। এই শব্দটাকে পশু ও বদ্ধভূমির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপে ইহুদিদের কয়েকবার গণহত্যা করা হয়। এগুলোর তিনটি বড় কারণ ছিল :

- প্রথম কারণ ছিল ইউরোপের ক্রুসেড যুদ্ধে বের হওয়া। যখন ইউরোপে ক্রুসেডার বাহিনী যুদ্ধের জন্য বের হয়, তখন এই ক্রুসেডাররা ইউরোপের যেই সমস্ত এলাকার ওপর দিয়ে অতিবাহিত হতো, সেখানে ইহুদিদের গণহত্যা করত।

- দ্বিতীয় কারণ ছিল মহামারি। যখন ইউরোপে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর জন্য ইহুদিদের দায়ী করে তাদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই এই গণহত্যা সংঘটিত হয়।

- তৃতীয় কারণ ছিল চক্রাকারে সুদি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে তারা ইউরোপের সমাজকে ঋণের চাপে জর্জরিত করে ফেলত। যখন তাদের জুলুম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাত, তখন সেই সমাজ তাদের গণহত্যা করত এবং তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করত। এই ধরনের একটি প্রসিদ্ধ গণহত্যা ও দেশান্তরের ঘটনা ফ্রান্সের বাদশাহ ফিলিপ দ্যা ফায়ারের শাসনামলে ফ্রান্সে হয়েছিল। আরেকটি গণহত্যা ইংল্যান্ডের বাদশাহ এডওয়ার্ডের সময় হয়েছিল এবং গণহত্যার পর বেঁচে যাওয়া বাকি ইহুদিদেরকে ইংল্যান্ড থেকে বের করে দেওয়া হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ইহুদিদের গণহত্যাকারী ব্রিটেন ও ফ্রান্সই পরবর্তীকালে ইহুদিদের জন্য উসমানিদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে বিজয় করার পাশাপাশি সেখানে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যও সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল।

আর এটাই সেই গোপন রহস্য, যা বোঝা আমাদের এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য।

ইউরোপের রেনেসাঁ (১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রি.)

ইউরোপের ইতিহাসের তৃতীয় যুগ, যা আজকের আধুনিক পশ্চিমের আকৃতি ধারণ করেছে, তাকে রেনেসাঁর যুগ বলা হয়। প্রথম যুগগুলোর মতোই এই নামের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। এই যুগে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের পতন এবং ধর্মহীনতার বিজয় শুরু হয়। তাই খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকগণ এই যুগকে রেনেসাঁর পরিবর্তে ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টির যুগ বলে থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগে যেহেতু ধর্মহীন ও সেক্যুলারদের শক্তি বেশি, তাই এই পরিভাষা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়। ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ এই যুগকে বোঝানোর জন্য রেনেসাঁ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার বাংলা অর্থ নতুন জন্ম। মোটকথা, এই নাম ও পরিভাষা নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের শুধু ইউরোপের ইতিহাস থেকে এতটুকুই জানা যথেষ্ট, যা দ্বারা আজ আমাদের দুশমনকে চিনতে ও বুঝতে পারব এবং উম্মতে মুসলিমার বিরুদ্ধে চলমান চক্রান্তগুলো অনুধাবন করতে পারব। তাই আমরা এই যুগের সেই ঘটনাগুলোই বর্ণনা করব, যা আমাদের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত।

যদি আমরা রেনেসাঁর যুগকে অধ্যয়ন করি, যা ১৪৫৩ সাল থেকে প্রায় ফরাসি বিপ্লব অর্থাৎ ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল, তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হবে, যা আজকের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই যুগের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ছিল ইউরোপের জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন। জনগণের মধ্যে এই চিন্তাগত পরিবর্তন দ্বীনের প্রতি অসন্তুষ্টি থেকেই হয়েছিল। যার ফলে তাদের মধ্যে ধর্মহীনতার চিন্তাধারা গ্রহণ করার হিড়িক পড়ে যায়। যা পরবর্তীকালে যুক্তিবাদের আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়। এই যুগে গির্জার সংশোধন আন্দোলন আরও অধিক শক্তিশালী হয়, যা মধ্যযুগে ব্যর্থ হয়েছিল। সর্বশেষ মার্টিন লুথারের প্রটেস্টান্ট আন্দোলন সফলতা লাভ করে এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রটেস্টান্ট নামে একটি নতুন দল তৈরি হয়। পরবর্তী যুগে এই দলটি ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে শক্তিশালী হয়, যা আজও একই অবস্থায় টিকে রয়েছে। এই দলটিকে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে সম্পর্ক ও ঐক্য স্থাপনকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। এই যুগেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় এবং এই রাষ্ট্রটি প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর এই রাষ্ট্রের মধ্যেই প্রথম ধর্মহীনতার বিপ্লব হয়, যাকে আমেরিকান রেভ্যুলেশন বলা হয়।

রেনেসাঁর যুগে ইউরোপের দেশগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে কোম্পানি পাঠায়। পরবর্তীকালে এই কোম্পানিগুলোই হিন্দুস্থানের ওপর ইংল্যান্ডের দখল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরিণত হয়। হিন্দুস্থানের ওপর ব্রিটেনের দখল ছিল আন্তর্জাতিকভাবে পশ্চিমাদের উত্থানের মূল উৎস। এই যুগেই ব্যাপকভাবে ব্যাংক ও কাগুজে নোটের প্রচলন ঘটে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 'মার্কেট

ইকোনমি' বলা হয়, যার ভিত্তি হচ্ছে এই ব্যাংক, কারেন্সি ও কোম্পানি। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হয়; যার ফলে আমেরিকা ও রাশিয়ার মাঝে ৪০ বছরের কোল্ড ওয়ার সংঘটিত হয়। রেনেসাঁর যুগে হোলি রোমান এম্প্যায়ারের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি যুদ্ধ শুরু হয়, যা ৩০ বছর পর্যন্ত চলমান ছিল। এই যুদ্ধ শেষ হয় ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে। আর এই চুক্তিই আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের থিউরি সামনে আনে। এই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের থিউরি থেকেই ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বণ্টন এই চুক্তির ভিত্তিতেই হয়েছে। আজকের জাতিসংঘ এই চুক্তির মূলনীতি অনুযায়ীই যেকোনো রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

সামনে আমরা এই ঘটনাগুলোই বিস্তারিত আলোচনা করব।

রেনেসাঁর যুগে ইউরোপে চিন্তাগত পরিবর্তন

ইউরোপের রেনেসাঁর যুগ শুরু হয় ১৪৫৩ সালে। এই যুগের শুরু হয়েছে উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কুসতুনতিনিয়া বিজয় থেকে। এই বিজয়ী বাহিনীর জন্য আল্লাহর রাসুল ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। এই বিজয় ইসলামি বিশ্বকে যেমন প্রভাবিত করেছিল, তেমনই ইউরোপের মধ্যে এই বিজয় অনেক গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

গ্রিক দর্শনের অনেক দক্ষ ব্যক্তিরা এবং মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক শিক্ষা অর্জনকারী খ্রিষ্টানদের অনেক বড় অংশ এই হামলার পর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে চলে যায়। এই ব্যক্তিরা প্রথমে ইতালিতে একত্রিত হয় এবং আস্তে আস্তে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাই রেনেসাঁর যুগের শুরু ইতালি থেকে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হচ্ছে, এই শিক্ষা অর্জনকারী ব্যক্তিরা আধুনিক শিক্ষা মুসলিমদের থেকেই অর্জন করেছিল; কিন্তু তারা ইউরোপে গিয়ে এই শিক্ষাকে ধর্মহীনতার চিন্তাধারার সাথে মিশ্রিত করে পেশ করতে থাকে। এর আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ এবং মুজাহিদদের জন্য ইউরোপের ইতিহাসের এই যুগকে বোঝা অনেক জরুরি। কেননা মুসলিম-বিশ্বের ধর্মহীন শ্রেণির একটি বিশেষ দলিল হচ্ছে ইউরোপের রেনেসাঁর যুগ। ধর্মহীন শ্রেণি এর দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করে, ইউরোপের উন্নতির মূল কারণ রেঁনেসার যুগে ধর্মহীন মতাদর্শকে গ্রহণ করা ও বিজ্ঞানে উন্নতি করা। কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিমদের পতনের একটি কারণ ছিল তাদের দ্বীনি শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্যাগ করে পশ্চিমাদের সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ করা, যা পশ্চিমারা রেনেসাঁর যুগে ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা মিশ্রিত করে তৈরি করেছিল। আমরা এই ব্যাপারে ইতিহাসের সারসংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

রেনেসাঁর যুগে যে সমস্ত চিন্তাগত পরিবর্তন হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল গ্রিকের সেই পুরাতন দর্শন গ্রহণ করে নেওয়া, যেখানে মানুষের বুদ্ধিকে ইলমে ওহির তুলনায় অগ্রগামী মনে করা হতো। মানুষের বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই থিউরিকে আজকের আধুনিক যুগে হিউম্যানিজম (Humanism) বলা হয়। আরেকটি চিন্তাগত পরিবর্তন, যা তখন পুরো ইউরোপের জনগণ গ্রহণ করে নিয়েছিল, তা ছিল ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মহীন আধুনিক শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার অধিকাংশটাই মুসলিম-বিশ্ব থেকে আমদানি হয়েছিল; কিন্তু পশ্চিমারা সেই শিক্ষাকে ধর্মহীনতার সাথে মিশিয়ে পড়ানো শুরু করে। অথচ তখন মুসলিম-বিশ্বে এই আধুনিক শিক্ষাকেই দ্বীনি মাদরাসাতে আলাদা শাস্ত্র হিসেবে পড়ানো হতো। এই সবকিছু মূলত মধ্যযুগে গির্জা ও বাদশাহদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ছিল, যারা ইউরোপের জনগণের ওপর জুলুমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ইউরোপে সেক্যুলারিজমের উত্থান

রেনেসাঁর যুগের সেক্যুলারিজমের উত্থান বোঝার পূর্বে জরুরি হচ্ছে স্বয়ং সেক্যুলারিজমকে বোঝা; যাতে আমরা এর উত্থানকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি। অভিধানের তথ্য অনুযায়ী সেক্যুলারিজমের অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা। বাহ্যিকভাবে সাধারণ মনে হওয়া এই শব্দের ভেতরে অনেক প্যাঁচানো দর্শন লুক্কায়িত রয়েছে। যাকে পশ্চিমা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা আলাদা একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়ে থাকে। যেন নিরপেক্ষতার নামে সে নিজেই 'ধর্মহীনতা'র একটি ধর্ম। এই দুর্বোধ্যতাই সেক্যুলারিজম-সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর একটি বড় সমস্যা।

দুর্বোধ্যতার প্রথম কারণ হচ্ছে, এটি মানুষের সেই অসম্পূর্ণ বুদ্ধি থেকে আবিষ্কৃত, যার দাবি সে সৃষ্টিকর্তা থেকেও বেশি জ্ঞানের অধিকারী। (নাউজুবিল্লাহ) অর্থাৎ যেন সে নিজেই নিজের রব। এই দৃষ্টিতে আপনি এটাকে আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীনের বিপরীতে মানবতৈরি ধর্ম বলতে পারেন।

দ্বিতীয় কারণ, সেক্যুলারিজম শুধু একজন ব্যক্তির একটি অসম্পূর্ণ বুদ্ধির ফল নয়; বরং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অসম্পূর্ণ বুদ্ধির সমষ্টি।

তৃতীয় কারণ, এ ধর্মের দার্শনিকরা অসম্পূর্ণ বুদ্ধির পাশাপাশি চারিত্রিক দিক থেকেও চরম অধঃপতিত ছিল। যার স্বীকৃতি তারা নিজেরাই দিয়েছে এবং যার ব্যাপারে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়।

চতুর্থ কারণ, সেক্যুলারিজম শুধু এক বা দুই যুগেই পূর্ণ আকৃতি ধারণ করেনি; বরং তা খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সালে রোমান ও গ্রিকের মুশরিক সমাজের গুহা থেকে বের হয়ে দুই হাজার খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের লম্বা সময়ে অনেক পরিবর্তনের ধাপ পাড়ি দিয়ে বর্তমান আকৃতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং এখনো তা ধারাবাহিক পরিবর্তনের ধাপ পাড়ি দিয়ে চলমান রয়েছে। এই ভিত্তিতে বলা যায় এটি ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল একটি ধর্ম।

পঞ্চম কারণ, সেক্যুলারিজমের উন্নতির সবচেয়ে বড় কারণ খ্রিষ্টান ধর্ম ও সমাজের জুলুমের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে 'পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ধর্ম'ও বলা যায়।

এই সমস্ত বাস্তবতাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদেরকে লম্বা ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সভ্যতা, পুরাতন ধর্ম, জটিল দর্শন ও অগণিত ব্যক্তির জীবনী অধ্যয়ন করতে হয়। এখানে আমরা দুর্বোধ্যতা দূর করে সেক্যুলারিজমকে সহজভাবে পেশ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন চেষ্টায় সফলতা দান করেন।

সেক্যুলারিজম একটি বুঝ ও চিন্তা-পদ্ধতির নাম, যেটি এমন বিষয়ে আলোচনা করে, যার ব্যাপারে নির্দেশনা কেবল নবিদের শিক্ষা থেকেই পাওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ কী? মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? দুনিয়াতে মানুষের কাছে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার অধিকার রয়েছে কি না? যদি অধিকার থাকে, তাহলে সেটা কতটুকু? এই বিশাল জগৎকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কে? এই বিশ্বজগতের মালিকের ইচ্ছা কী? মানুষ মারা যায় কেন? মারা যাওয়ার পর মানুষ কোথায় যায়? মানুষ মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হয় নাকি নিঃশেষ হয়ে যায়? এই প্রশ্নগুলোর জবাব শুধু নবিগণই ওহির ভিত্তিতে দিতেন এবং এই ওহি সমস্ত সৃষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসত।

কিন্তু যখন এই প্রশ্নগুলোর জবাব মানুষ নবিগণের পরিবর্তে নিজেরাই দেওয়া শুরু করে, তখন থেকেই এই ধর্মহীনতার জন্ম হয়। এখানে ইলমে ওহির পরিবর্তে মানুষের বুদ্ধিকে গ্রহণ করা হয় এবং এই প্রশ্নগুলোর জবাবের জন্য নবিগণকে ত্যাগ করে দর্শনকে ব্যবহার করা হয়।

সেক্যুলারিজমের কয়েকটি প্রকার রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রকার, যা বর্তমান যুগে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, হিউম্যানিজম বা মানবধর্ম।[৩১] এই হিউম্যানিজমই আজকের ধর্মহীনতার উৎস। এটিই সেই চিন্তা-চেতনা, যা ইউরোপের জনগণ, বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে জন্ম নিয়েছে এবং এটাই ইউরোপের রেনেসাঁ। আমরা যদি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বুঝে আসবে যে, তাদের গোমরাহির মূল কারণ ছিল নবিদের বর্ণিত নির্দেশনাগুলো ত্যাগ করে উলামায়ে সু'দের কথাকে গ্রহণ করে নেওয়া। উলামায়ে সু'দের কথাগুলো মানুষের অসম্পূর্ণ বুদ্ধি, চিন্তা ও যুক্তি-তর্ক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সেক্যুলারিজমও মানুষকে হুবহু এই বিষয়ের দিকেই আহ্বান করে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই

৩১. এখানে হিউম্যানিজমের অর্থ মানবধর্ম এবং হিউম্যানের অর্থ মানুষ এই জন্য করা হয়েছে যে, এটি ছাড়া বাংলায় পাঠককে বোঝানোর জন্য আর কোনো শব্দ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অন্যথায় হিউম্যানের শাব্দিক অর্থ কোনোভাবেই মানুষ হয় না। এর বিশেষ অর্থ আছে (যা সামনের অধ্যায়ে বিস্তারিত আসবে) এবং এই বিশেষ অর্থটি ব্যাপকভাবে মানুষ শব্দে কখনোই প্রবেশ করে না। এই বিষয়টি মাথায় রাখা আবশ্যক।

যে, সেখানে উলামায়ে সু'রা ছিল আর এখানে বুদ্ধিপূজারি দার্শনিক। এই দুটাই মানুষকে নিজের অসম্পূর্ণ বুদ্ধির গোলামে পরিণত করে এবং দুই দলের কথা একই পথে পরিচালিত করে, আর তা হচ্ছে গোমরাহির পথ।

হিউম্যানিজম মানবতাবাদ বা মানবধর্ম

খ্রি.পৃ. ৪শ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেক্যুলারিজমের বিভিন্ন আকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু পশ্চিমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে হিউম্যানিজম। এমনকি একসময় সেক্যুলারিজম ও হিউম্যানিজমকে একে অপরের সমার্থক মনে করা শুরু হয়। আনুমানিক খ্রি.পৃ. ৩শ সালে গ্রিক দার্শনিকরা বাহ্যিক দুনিয়া নিয়ে যুক্তি ও বুক্তিবৃত্তিক গবেষণা শুরু করে। এই দার্শনিকদের কসমোলজিস্ট (Cosmologist) বলা হতো। কসমোলজিস্টদের গবেষণা শুধু সূর্য, চন্দ্র ও তারকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েক বছর পর দার্শনিকদের আরও একটি দল তৈরি হয়, যাদের থিউরি ছিল, যেভাবে সূর্য, চন্দ্র ও তারকার গতি-প্রকৃতি জানা সম্ভব হয়েছে, তেমনিভাবে মানববুদ্ধির দ্বারাই রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা নির্ধারণ ও তৈরি করা সম্ভব। দার্শনিকদের এই দলটি সামাজিক বিষয়ে নিজেদের যুক্তিবৃত্তিক দর্শন পেশ করা শুরু করে। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে তাদের হিউম্যানিস্ট বলা শুরু হয়। সেই সময় হিউম্যানিস্ট সেই ব্যক্তিদের বলা হতো, যারা মানুষের বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দ্বীন ও ইলমে ওহি ব্যতীত শুধু বুদ্ধি দ্বারাই বের করার চেষ্টা করত। চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের প্রসিদ্ধ পাদরি সেন্ট অগাস্টিন এই মতাদর্শকে পরাজিত করে; ফলে এক হাজার বছর পর্যন্ত বুদ্ধিপূজার এই কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগে তা আবারও মাথা ওঠায় এবং রেনেসাঁর যুগে এই বুদ্ধিপূজা দ্বিতীয়বার পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামনে আসে।

শেষ শতাব্দীগুলোতে হিউম্যানিস্ট সেই ব্যক্তিদের বলা হতো, যারা বিশ্বাস করত, এখন দুনিয়াতে জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের কোনো রবের প্রয়োজন নেই। (নাউজুবিল্লাহ) যদি ইলাহ থেকেও থাকে, তাহলে এখন আর তার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং মানুষ নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নিতে সক্ষম হয়ে গেছে। আধুনিক যুগে হিউম্যানিজমের জনক হচ্ছে জন লক (John Locke), ডেভিড হিউম (David Hume), ফ্রিডরিখ নিৎশে (Nietzsche), ভলতেয়ার (Voltaire) ও রুশোর (Rousseau) মতো দার্শনিকরা। এখানে আমরা এই চিন্তাধারার মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করে এই চিন্তা ও শিরকের বিচার স্বয়ং পাঠকের ওপর ছেড়ে দেবো।

হিউম্যানিজমের সারসংক্ষেপ

আমরা এখানে পয়েন্ট আকারে হিউম্যানিজমের মূল বিষয়গুলো আলোচনা করব, যেগুলো তাদের দার্শনিকদের বক্তব্য থেকে নোট করা হয়েছে।

- মানুষ সৃষ্টির শুরুর দিকে তারা অনভিজ্ঞ এবং বাইরের দুনিয়ার ব্যাপারে ভীত ছিল। ফলে তারা কোনো আশ্রয়ের জায়গা খুঁজছিল। সেই সময়ে তারা নিজেদের মনের মধ্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের ঊর্ধ্বে এক অদৃশ্য সত্তার আবিষ্কার করে, যার কল্পনা করে তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিত। এই ধারণাকৃত সত্তাকে তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মনে করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিকর্তা তৈরি করে সেগুলোর পূজা করতে থাকে। এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম অস্তিত্বে আসে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত বিশাল সময়ে তারা এতটাই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে যায় যে, তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এখন কোনো ধর্ম বা রবের প্রয়োজন নেই।

- মানুষ যদিও স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু ধর্মের আবিষ্কারের পর তারা এর গোলামে পরিণত হয় এবং নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টিজীব হিসেবে কল্পনা করতে থাকে। অথচ মানুষের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই এবং তারা মাখলুকও নয়। বরং সে হচ্ছে হিউম্যান, যে অন্য হিউম্যানের সাথে মিলে হিউম্যানিটি অর্থাৎ মানবতাকে গঠন করে। আর এখান থেকেই এই চিন্তাধারাকে হিউম্যানিজম বলা শুরু হয়।

- এখন যেহেতু মানুষ থেকে বড় কোনো সত্তা নেই, তাই তারা কারও অধীন বা আনুগত্যশীল নয়। বরং তারা এখন স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিজেই নিজের মালিক ও একজন স্বেচ্ছাচারী সত্তা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের এখন হিউম্যান হিসেবে নিজ জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে গেছে। এখন সে কোনো ধর্মের আনুগত্যশীল নয় বা কোনো বাদশাহর প্রতি নত নয়। স্বাধীনতার এই অধিকারকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তার ওপর কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। বরং সব হিউম্যান—চাই সে পুরুষ হোক বা নারী—যেকোনো রং, বর্ণ, জাতি ও রাষ্ট্র; এমনকি হোক যেকোনো ধর্মের; নিজ ইচ্ছাকে পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সবাই সমান অধিকার পাবে।

- সমস্ত মানুষ এখন যেহেতু স্বাধীন, তাই তার সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে সে কোনো বহিরাগত শক্তি বা নিজের অভ্যন্তরীণ কোনো শক্তির অনুগত নয়। তবে সামাজিক জীবনযাপনের জন্য এক হিউম্যান অপর হিউম্যানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে একটি সমাজ গঠন করতে পারে। এই সামাজিক সমঝোতার অধীনে সমস্ত হিউম্যানের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকেই রাষ্ট্র বলা হয়, যা সকল হিউম্যানের সার্বিক স্বাধীনতা রক্ষার জিম্মাদারি গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে সমস্ত হিউম্যান শুধু প্রশাসনের আকৃতি ধারণকারী এই সামাজিক ঐক্যের সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

- আজ পর্যন্ত লিখিত মানব ইতিহাস যেহেতু ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাই এখন নতুন আঙ্গিকে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেখানে শুধু মানবসমাজের উন্নতি ও অগ্রগতিকে সামনে রেখে ঘটনাগুলো সাজানো হবে। প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসে লক্ষণীয় বিষয় শুধু এটাই হবে যে, তারা হিউম্যানের উন্নতির জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছে। সেই সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানুষের চাহিদাকে কত উঁচু স্তর পর্যন্ত পূর্ণ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ফিরআওনের বংশধর মানবচাহিদাকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকেই পুরো মানবজাতির মধ্যে হিউম্যানের জন্য মহান হিরো মনে করা হবে এবং তাকে কোনোভাবেই অত্যাচারী শাসক হিসেবে গণ্য করা হবে না।

হিউম্যানিজমের আবিষ্কারকদের চিন্তাধারা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, হিউম্যানের সংজ্ঞা শুধু সেই মানবসত্তার ওপর কোনোভাবেই প্রয়োগ হয় না, যার জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 'আবদ' (বান্দা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। বরং হিউম্যান হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা আবশ্যক। হিউম্যান হারাম ও হালালের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত এমন এক সত্তা, যে দুনিয়ার যেকোনো ধরনের ইলাহি ধর্ম বা আসমানি মানদণ্ড ব্যতীত নিজের চাহিদা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। আরও অগ্রসর হয়ে এই চিন্তা শুধু রব ও দ্বীনের অস্বীকার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং স্বয়ং মানুষ নিজেকেই নিজের রব ও ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়।

যেহেতু রেনেসাঁর যুগে ইউরোপের খ্রিষ্টান জনগণ, যারা পূর্বে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর ইবাদতকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য মনে করত, এখন তারা বান্দার সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে হিউম্যান হয়ে গেছে। তাই তারা গির্জার পরিবর্তে ইউরোপের দার্শনিকদের ইবাদত করা শুরু করে।

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা

হিউম্যানিজম বা মানবধর্ম গ্রহণের ফলে ইউরোপের দ্বিতীয় বড় পরিবর্তনটি ছিল গির্জার আধ্যাত্মিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্মহীন বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যা তাদের কিছু পয়সা কামাতে সাহায্য করত। ফলে লোকেরা তাদের বাচ্চাদের গির্জায় পাঠানোর পরিবর্তে আধুনিক স্কুলে পাঠাতে শুরু করে। সেই যুগে স্কুলগুলোতে দর্শন, বিজ্ঞান, গান, বক্তৃতা, অঙ্কন, কলা ইত্যাদি বিষয় পড়ানো শুরু হয়।

ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং খ্রিষ্টবাদের সাথে দ্বন্দ্ব

বিজ্ঞান[৩২] ছিল সেই বিশেষ বিষয়, যা ইসলামি বিশ্ব থেকে অনুবাদ হয়ে ইউরোপে পৌঁছে ছিল। ইউরোপ এই বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়; যার ফলে রেনেসাঁর যুগের বিশেষ ঘটনা ছিল বিজ্ঞানের উন্নতি। মুসলিম বৈজ্ঞানিক জাবির বিন হাইয়্যান, আল-বিরুনি, ইবনে হাইসাম, ইবনে সিনাদের কিতাব অনুবাদ হয়ে ইউরোপে পৌঁছেছিল। প্লেটো, এরিস্টটলের থিউরিকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য নতুন নতুন থিউরি সামনে আসছিল। যারা এই থিউরিগুলো পেশ করেছিল তাদের মধ্যে ছিল গ্যালিলিও (Galileo), নিউটন (Newton), উইলিয়াম হার্বে (William Harbey), ইয়োহানেস ক্যাপলার (Kepler), ডেভিড হিউম (Hume) এর মতো বিজ্ঞানীরা। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যেই বিষয়গুলোতে বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের মত পেশ করছিল, মুসলিম বৈজ্ঞানিকরা এই মতগুলোই অনেক পূর্ব থেকে বলে আসছিল। মুসলিম-দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকরা এই থিউরিগুলো বড় বড় আলিমদের সামনে পেশ করত, সেই সাথে অনেক মুসলিম বৈজ্ঞানিক নিজেই ছিল আলিম। ইসলাম ধর্ম ও বিজ্ঞানের কোনো দ্বন্দ্ব সেই সময় পর্যন্ত অস্তিত্বে ছিল না। কারণ তখনকার সময়ে আলিমগণ যদি ইসলামি আকিদার সাথে বৈজ্ঞানিক থিউরির কোনো বিরোধ দেখতেন, তখন তাতে আপত্তি তুলতেন; ফলে মুসলিম বৈজ্ঞানিকরা সেই আপত্তির আলোকে নিজেদের ভুল শুধরে নিতেন।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউই এই জ্ঞানকে ধর্মহীন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেননি; বরং নিজেদের থিউরি ও আবিষ্কারগুলোকে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও নিদর্শন মনে করতেন। কিন্তু এই জ্ঞান যখন ইউরোপে পৌঁছায়, তখন ধর্মহীন বৈজ্ঞানিকরা একে পরিপূর্ণ ধর্মহীন পদ্ধতিতে পেশ করে বা ধর্মহীন দর্শন মিশ্রিত করে পেশ করে। তারা বিজ্ঞানকে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকারের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। তারা এই

---

৩২. সাইন্স বা বিজ্ঞান দ্বারা আমরা এখানে প্রকৃতির জ্ঞান উদ্দেশ্য নিয়েছি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা এবং সৃষ্টিজগতের গোপনভেদ ও নিদর্শনগুলো বোঝা। এই জ্ঞানকে যদি এই অর্থে নেওয়া হয় এবং দ্বীনি বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম না করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞান ইসলামের বিরোধী নয়। পনেরো শতাব্দীর পর পশ্চিমা ধর্মহীন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার ও ধর্মহীন চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রণয়ন করে এবং বিজ্ঞানকে ধর্মের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যা, যা নিশ্চিত কুফুরি ধর্মবিরোধী দর্শন বা মানুষের চাহিদার সীমাহীন বাস্তবায়নকে নিজ লক্ষ্য বানিয়ে নেয়—সত্যপন্থী আলিমরা সর্বযুগে এতে বাধা দিয়েছেন এবং দলিলের মাধ্যমে এই বিষাক্ত জ্ঞান ও থিউরিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এই কথাও স্পষ্ট, লেখকের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুসলিমরাই বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছেন। কেননা, গ্রিক ও হিন্দে এরও পূর্বে এই জ্ঞান প্রচলিত ছিল। মুসলিমরা সেখান থেকে উপকারী ও কার্যকর বিষয়গুলো গ্রহণ করেছেন এবং পরে আরও গবেষণা বৃদ্ধি করেছেন। মুসলিমদের পরে পশ্চিমারা এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে এবং যেমনটা ওপরে বলা হয়েছে, তারা এটাকে ধর্মহীন বিশ্বাসের সাথে মিশ্রিত করে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়।

জ্ঞানকে খ্রিষ্টান ধর্মকে পরাজিত করার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। খ্রিষ্টবাদ যেহেতু ইলমে ওহির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাই তাদের কাছে বৈজ্ঞানিকদের থিউরিকে ভুল প্রমাণিত করা বা তা প্রতিরোধ করার কোনো জ্ঞান-ভিত্তিক দলিল ছিল না। তাই তারা এই থিউরিগুলোকে ধর্মহীনতা ঘোষণা দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। যাকে ইতিহাসে বিজ্ঞান ও ধর্মের যুদ্ধ বলা হয়।

ইউরোপে যুক্তিবাদের যুগ

ইউরোপে যুক্তিবাদের যুগ (Rationalism) মূলত রিফরমেশন আন্দোলনের পর শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমরা এটাকে চিন্তাগত পরিবর্তনের অধ্যায়ে এই জন্য আলোচনা করছি; যাতে ইউরোপের মধ্যে চিন্তাগত পরিবর্তনকে বোঝার ধারাবাহিকতা ঠিক থাকে। খ্রিষ্টান ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে দ্বন্দ্বের বাহ্যিক ফলাফল ছিল ইউরোপে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা মানুষের বিবেককে সকল সত্য-মিথ্যা ও শুদ্ধ-অশুদ্ধের মাপকাঠি ঘোষণা করে বসে। এমনকি তারা ধর্মকেও যুক্তির আলোকে পরখ করা শুরু করে দেয়।

এখানে যুক্তিবাদ বা যুক্তিপূজা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুক্তিকেই সঠিক-বেঠিক নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি বা ভিত্তি বানিয়ে ফেলা। অন্যভাবে বলা যায় যে, ধর্মের ভিত্তি ও উৎস মানুষের যুক্তি। এই মতবাদ প্রচারকারীদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিল। তাদের মধ্যে আছে ডেকার্ট, স্পিনোজা, লিবনিজ, জন লক-সহ আরও কিছু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। খ্রিষ্টানদের মধ্যে যুক্তিবাদের শুরু মূলত রিফরমেশন আন্দোলন থেকে হয়েছিল। সংশোধন আন্দোলনের ফলে বাইবেল ব্যাখ্যার অধিকার সকলের হাতে দিয়ে দেওয়ার পর খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন কিছু ধর্মবিরোধী ব্যক্তি সামনে আসে, যারা নিজেদের যুক্তিকে মাপকাঠি বানিয়ে বিকৃত ইনজিলের (যাতে অনেক মতানৈক্য, বাস্তবতা-বিরোধী মত ছিল) প্রত্যেকটি কথার ওপর প্রশ্ন তোলা শুরু করে। এমনিভাবে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি বাক্য—চাই সেটা সত্য হোক বা মিথ্যা—সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে।

যুক্তিবাদের এই চিন্তাধারা সাধারণ-বিশেষ সকল মানুষকেই প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তারা খ্রিষ্টানদের দ্বীনের সকল উৎস ও প্রত্যেকটি দলিলকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এই চিন্তাগত পরিবর্তনের স্বাভাবিক ফল হিসেবে ইউরোপের সমাজে জীবন পরিচালনার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা গির্জা অনেক শতাব্দী যাবৎ টিকিয়ে রেখেছিল, তা পূর্ণ ধ্বংস হওয়া শুরু হয়। তখন ইউরোপের জনসাধারণ গির্জার পাদরিদের বাদ দিয়ে ধর্মহীন দার্শনিকদের দিকে যাওয়া শুরু করে। আর ধর্মবিরোধী দার্শনিকরা শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে তাদের জীবনের সমস্যাগুলো সমাধান করা শুরু করে। মানুষের বুদ্ধি বা কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। যুক্তি বা কল্পনার বিরোধী সকল বিষয়কে অস্বীকার করা শুরু হয়। রেনেসাঁর যুগে ইউরোপের জনগণ নিজেদেরকে সৃষ্টি বা মাখলুক ও মানুষ থেকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বা হিউম্যান মনে করতে থাকে। মানবীয়

বিবেককে সমস্ত ক্ষেত্রে মূল দলিল ও উৎস হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়।[৩৩] এর ফলাফল এমন দাঁড়ায় যে, ইউরোপের সমাজ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, আখিরাতের ওপর ইমান ও গায়েবের বাস্তবতা যেগুলোর উৎস ছিল একমাত্র ইলমে ওহি, সেগুলোকে অস্বীকার করা শুরু করে। আস্তে আস্তে পরবর্তী দুই শতাব্দীতে পুরো ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ ধর্মহীনতাকে গ্রহণ করে নেয়। এটাই ছিল সেই রেনেসাঁর যুগ, যা পূর্ব থেকেই গোমরাহিতে লিপ্ত খ্রিষ্টানদের আরও বেশি গোমরাহিতে ফেলে দেয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এই চিন্তাগত পরিবর্তনগুলো জনগণ পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা গির্জার বিরুদ্ধে রিফরমেশন আন্দোলনই পালন করেছিল।

মার্টিন লুথারের (রিফরমেশন) সংশোধন আন্দোলন

আমরা ওপরে বলে এসেছি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে একদিকে পূর্ব ইউরোপের ইতালি থেকে শুরু হওয়া হিউম্যানিজম আন্দোলন আস্তে আস্তে পুরো ইউরোপে আদর্শগত পরিবর্তন আনতে শুরু করে এবং জনগণ গির্জা ও বাদশাহদের জুলুমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পরিবর্তনগুলো গ্রহণ করে নিতে থাকে। অপরদিকে রেনেসাঁর যুগে গির্জার সংশোধন আন্দোলনের নামে একটি বিপ্লব জন্ম নিতে থাকে। হিউম্যানিজম আন্দোলন গির্জা ও বাদশাহদের শাসনব্যবস্থার বাইরের আন্দোলন ছিল। আর রিফরমেশন আন্দোলন গির্জার অভ্যন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। রেনেসাঁর যুগে ইউরোপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে রিফরমেশন আন্দোলন হিউম্যানিজম থেকেও বেশি প্রভাব ফেলেছিল।[৩৪] বরং এটা বলা ভুল হবে না যে, সংশোধন আন্দোলন ইউরোপে ধর্মহীনতার পথ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল।

---

৩৩. এখানে এই বিষয়টিও স্পষ্ট, যেভাবে ইসলামে ধর্ম ও বিজ্ঞান (বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞান) এর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, তেমনিভাবে বুদ্ধি ও ওহির মাঝে দ্বন্দ্বের কোনো ধারণা বাস্তবে ইসলামে নেই। বুদ্ধি মানুষের নিজের বানানো নয়; বরং আল্লাহ তাআলার দানকৃত নিয়ামত এবং কুরআনে আকলকে নিয়ামত হিসেবেই পেশ করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করার জন্য বারবার আদেশ দিয়েছে। এখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা শিক্ষার সাথে আল্লাহ তাআলারই দানকৃত বুদ্ধির দ্বন্দ্ব কীভাবে সম্ভব? সুতরাং বোঝার বিষয় হচ্ছে, মানুষের বুদ্ধি অনেক সীমাবদ্ধ এবং তা তখনই সঠিকভাবে ব্যবহার হবে, যখন অকাট্য জ্ঞানের উৎস ওহি অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। তাহলে এই বুদ্ধিই মানুষকে রবের পরিচয় প্রাপ্তির স্তরে নিয়ে যাবে। এই কথা আরও স্পষ্ট হয় কুরআনে জাহান্নামিদের যে বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে, তারা বলতে থাকবে যে, 'যদি আমরা শুনতাম বা বুদ্ধি ব্যবহার করতাম, তাহলে অগ্নিবাসীর মধ্যে হতাম না।' তাই বুদ্ধি ও ওহির দ্বন্দ্ব সেই সমস্ত বোকাদের কাছেই জন্ম নেয়, যারা বুদ্ধি দ্বারা সেই কাজ নিতে চায়, যা বুদ্ধিগতভাবেও আকলের সাধ্যের ভেতর নেই এবং যারা কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির নীতি দ্বারা অদৃশ্যের বিষয়গুলোর ব্যাপারে সঠিক-ভুলের নিশ্চিত ফয়সালা করতে চায়। যার ফলে সে নিজেই নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ দেয়।

৩৪. এর অন্যতম কারণ হলো, এটি ছিল ধর্মের নামে ধর্মহীনতার আন্দোলন। প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম-বিশ্বে যারা ইসলামকে সংস্কার করার দাবি তুলে কিংবা পোপতন্ত্রের জিগির তুলে ইসলামকে মনমতো ব্যাখ্যার দ্বার উন্মোচন করে দিতে চায়, তাদের আন্দোলনও মুসলিমদের জন্য রিফরমেশনের মতো ভয়ংকর। কারণ এর শেষ ফলাফল হলো দ্বীনের মূল আদর্শ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

গির্জার সংস্কার আন্দোলনের শুরু মধ্যযুগেই হয়েছিল; কিন্তু সেই চেষ্টাগুলো গির্জা কঠোর হস্তে দমন করে। এই আন্দোলনগুলো মধ্যযুগে সফল না হলেও অনেক বড় প্রভাব রেখে যায়। রেনেসাঁর যুগে বৃদ্ধি পাওয়া আন্দোলনগুলো মূলত মধ্যযুগের প্রচেষ্টাগুলোরই ধারাবাহিকতা। এই চেষ্টাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সফলতা পায় মার্টিন লুথারের সংস্কার আন্দোলন, যা পরবর্তী দুই শতাব্দীর ভেতর খ্রিষ্টানদের মধ্যে নতুন একটি দল তৈরি করে। মার্টিন লুথারের আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পাদরি ক্যালভিন ও সুইডেনের পাদরি জুইংলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ জন্য আমরা মার্টিন লুথানের আন্দোলনের আলোচনা একটু বিস্তারিত করব।

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রি.) জার্মানির এক শ্রমিক বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা তার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং তার ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সে আইনজীবী হবে। পরবর্তী সময়ে লুথার তার বইগুলো বিক্রি করে একটি গির্জার যাজক হয়ে যায়; কিন্তু সেখানে সে তার আত্মিক প্রশান্তি পাচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও গির্জায় তার দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকে এবং একসময় তাকে পাদরি হিসেবে মনোনীত করা হয়। একবার তাকে গির্জার পক্ষ থেকে রোমের প্রধান গির্জাতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়। সেখানে সে পাদরিদের বিলাসী জীবন দেখে প্রচণ্ড ধাক্কা খায় এবং এই ধাক্কা তাকে খ্রিষ্টান ধর্মের মূলনীতি নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বাধ্য করে। তার দাবি অনুযায়ী সেই সময় তার কাছে রবের পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল। ১৫১৭ সালে তার প্রসিদ্ধ 'নাইন্টি ফাইভ থিসিস' নামের আর্টিকেলটি প্রচার করে, যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় বৈঠকগুলোতে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এই আর্টিকেলে গির্জার পক্ষ থেকে পাপ মোচননামা বিলি করা ও দুনিয়াবি বিলাসিতার নিন্দা করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে এই আর্টিকেল প্রচারের কারণে বাদশাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু সে সেখানেও তার মত পাল্টাতে অস্বীকার করে। এই অবস্থায় বাদশাহর দরবারের তার এক বন্ধু তাকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অতঃপর তার বাড়িতে সে কিছু দিন পলাতক হিসেবে অবস্থান করে। সেখানে আশ্রয়ে থাকার সময় সে গ্রিক ও হিব্রু ভাষা থেকে বাইবেলকে জার্মানি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা শুরু করে। যা গির্জার নীতিবিরোধী হওয়ায় তার থেকে পাদরিত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাকে গৃহবন্দী করে ফেলা হয়।

১৫২৪ সালে জাগিরদার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন হয়, যেখানে শ্রমিক নেতারা তার কিছু কথাকে নিজেদের জন্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এখানে মার্টিন তার রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও এই সব কার্যক্রমের বিরোধিতা করে এবং নিজের নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য জাগিরদারদের সাথে অংশগ্রহণ করে। জীবনের শেষ সময়ে অসুস্থ হয়ে যায় এবং পোপতন্ত্রের চাপে সে মারা যায়।

সে প্রচলিত খ্রিষ্টবাদের মধ্যে যেসব সংস্কারের দাবি পেশ করেছিল, তা ওয়াইক্লিফের প্রস্তাবনার সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। তার গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো ছিল :

- মানুষের সাথে রবের সম্পর্কের জন্য গির্জা বা পাদরির প্রয়োজন নেই; বরং এই ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পর্ক সম্ভব।
- কোনো পাদরির এই ক্ষমতা নেই যে, সে কারোর গুনাহ ক্ষমা করে তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।
- আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাওরাত ও ইনজিল এই দুই কিতাবের মাধ্যমেই বিধান দিয়েছেন।
- তাওরাতের বিধানের ওপর আমলের মাধ্যমেই খ্রিষ্টানরা গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে পারবে।
- কিতাবুল মুকাদ্দাস পড়া ও বোঝার অধিকার সমস্ত খ্রিষ্টানেরই রয়েছে।
- খ্রিষ্টানদের মধ্যে ব্যাপ্টিজম, আশিয়ায়ে রব্বানি ও আরও কিছু আচার-অনুষ্ঠান ব্যতীত সমস্ত রুসম বিদআত। যার মধ্যে সেন্ট ও রাহিবদের কবরের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে অসিলা বানানোও অন্তর্ভুক্ত।

এটাই ছিল সেই মোড়, যেখানে ইহুদিদের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পুনরায় নতুন দিকে ঘুরে যায়। এ ছাড়াও চিন্তার বিষয় হচ্ছে, কয়েকটি বাস্তবতার কারণে প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের সাথে ইহুদিদের গভীর সম্পর্কের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়।

প্রথম কারণ ছিল, স্বয়ং মার্টিন লুথারের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল সে বংশীয় দিক থেকে ইহুদি।

দ্বিতীয়ত, তার বর্ণিত বিশ্বাসের মধ্যে পূর্বের কিতাব ও তাওরাতের শরিয়তের ওপরেও ইমান আনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ছিল। যাতে ইহুদিদের চিন্তাধারা প্রটেস্টান্ট ধর্মের অনুসারীরা সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারে।

তৃতীয়ত, এই দলটির আমেরিকাতে ছাপানো বাইবেলের শেষে সংযুক্ত ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে ইবরাহিম ﷺ থেকে নিয়ে বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

চতুর্থত, এই দলটি কার্যক্রমের দিক থেকেও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইহুদিদের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। এ ব্যাপারে ব্রিটেন ও আমেরিকার ইতিহাস সাক্ষী, যেখানে প্রটেস্টান্টদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এমনকি এই দলের রাজনৈতিক নেতাদের জায়োনিস্ট-খ্রিষ্টান বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে, মার্টিন লুথারের মূল ভূমিকা সেন্ট পৌলের থেকে ভিন্ন ছিল না; যদিও বাহ্যিকভাবে তার আন্দোলন সেন্ট পৌলের মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়।

খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিভক্তি ও প্রটেস্টান্ট দলের অস্তিত্ব

মার্টিন লুথারের আন্দোলন থেকে যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণ মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল; কিন্তু ক্যাথলিকদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের ফলে সেই সময় এই চিন্তাধারার বাস্তবায়ন শুরু হতে পারেনি। পরবর্তীকালে জুইংলি ও ক্যালভিন-সহ কিছু লোক এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। সর্বশেষ এই আন্দোলন প্রটেস্টান্ট দলের নামে রোমের গির্জার বিপরীতে একটি আলাদা ধর্মের আকৃতি ধারণ করে। এই দলের প্রতিষ্ঠা খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিশাল বিভক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। রোমের গির্জা তাদেরকে দমনের জন্য পুরো রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে এবং তাদেরকে ধর্মহীন ঘোষণা দিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। বন্দী ও হত্যা ছাড়াও অগণিত মানুষকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু ইউরোপের অবস্থা এতটাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল যে, এই আন্দোলন নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে আরও অধিক শক্তিশালী হতে থাকে।

১৫২৯ সালে যখন ক্যাথলিক চার্চ (Lutheran) লুথারিয়ানদের সাথে তিন বছরের সমঝোতা চুক্তির সময় শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়, তখন এই আন্দোলনকে প্রটেস্টান্ট নাম দেওয়া হয়। কারণ তখন লুথারিয়ান শাহজাদারা প্রোটেস্ট করে এবং প্রতিবাদী ইশতিহারে স্বাক্ষর করে। প্রোটেস্টান্টের শাব্দিক অর্থ প্রতিবাদকারী। এখন পারিভাষিক অর্থে এই নাম প্রত্যেক সেই সমস্ত দলের জন্য ব্যবহার করা হয়, যারা অর্থডক্স বা ক্যাথলিক গির্জার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রটেস্টান্টের প্রসিদ্ধ শাখা চারটি, প্রথমটি লুথারিয়ান গ্রুপ—যেটা ইউরোপে ইভাঞ্জেলিকা (Evangelical) নামে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় ক্যালভিনিস্ট (Calvinist), তৃতীয় আনাব্যপ্টিস্ট (Anabaptist) ও চতুর্থ এঙ্গালিকান (Angalican)। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী সামষ্টিকভাবে সমস্ত প্রটেস্টান্ট দলের সদস্য মিলে হয় খ্রিষ্টানদের পাঁচ শতাংশ। কিন্তু বর্তমান হিসাব মুতাবিক তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইংল্যান্ডে ইভাঞ্জেলিকা চার্চ প্রতিষ্ঠা (প্রটেস্টান্ট দলের উত্থান)

প্রটেস্টান্ট দলের উত্থান তখন হয়, যখন ইংল্যান্ড সরকারীভাবে প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। আর এই ঘোষণা হয়েছিল ইংল্যান্ডের বাদশাহ হেনরি অষ্টমের যুগে। হেনরির কোনো ছেলে-সন্তান ছিল না। তাই সে তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় বাধা ছিল, এই তালাক বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য রোমের পোপের অনুমতি আবশ্যক ছিল। কেননা, খ্রিষ্টানদের ধর্মের নীতি অনুযায়ী তালাক প্রায় হারামের পর্যায়ে ছিল। এমনিভাবে দ্বিতীয় বিয়েও হারাম ছিল। এ ছাড়াও আরও বড় সমস্যা হলো, এই রানি ছিল গির্জার অনুগত।

হেনরি ১৫৩২ সালে গির্জার অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয়। সেই বিয়েকে গির্জা অবৈধ ঘোষণা করে হেনরির ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং ইংল্যান্ডের সমস্ত ধর্মীয় ক্ষমতা

উঠিয়ে নেয়। হেনরি যেহেতু শক্তিশালী বাদশাহ ছিল; তাই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় গির্জা চার্চ অফ ক্যান্টারবারি—যা রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধীনে ছিল—আইন করে সেটাকে ইংল্যান্ডের বাদশাহর অধীনে নিয়ে নেয়। নিজেই এর প্রধান হয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চালু করে দেয়। বাদশাহ এই গির্জার বড় পাদরি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে। এই নতুন গির্জার নাম চার্চ অফ ইংল্যান্ড রাখা হয়। চার্চ অফ ইংল্যান্ড রোমের পোপের অধীনে ছিল না; কিন্তু সেই সময় যে আচার-অনুষ্ঠান সেখানে পালন হতো, তা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম অনুযায়ীই ছিল। চার্চ অফ ইংল্যান্ড রোম থেকে আলাদা হওয়া ইউরোপের ইতিহাসে বড় একটি ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আলাদা হওয়ার ফলে প্রটেস্টান্ট ধর্ম ব্রিটেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। হেনরি ও তার বড় মেয়ে মেরি ইংল্যান্ডের গির্জাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আলাদা করলেও তারা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ছাড়েনি। কিন্তু তার দ্বিতীয় মেয়ে এলিজাবেথ প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করে নেয়।

প্রশ্ন হচ্ছে এলিজাবেথ কেন প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল? কারণ ছিল রাজনৈতিক। রাজনৈতিক কারণে এলিজাবেথ প্রটেস্টান্ট হতে বাধ্য হয়েছিল। যেমনটা আমরা ওপরে বলেছি, হেনরি দ্বিতীয় বিয়ে গির্জার অনুমতি ব্যতীত করেছিল; তাই তার বিবাহকে গির্জা অস্বীকার করেছিল। এখন যেহেতু বিয়েই বৈধ হয়নি; তাই সেই স্ত্রীর ঘর থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। আর কোনো বাদশাহর সন্তানকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে সেই সন্তান বাদশাহির দাবিদার হতে পারে না। সুতরাং এলিজাবেথের পক্ষে ক্যাথলিক ধর্মানুযায়ী বাদশাহির দাবিদার হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রটেস্টান্ট ধর্মানুযায়ী কোনো সমস্যা ছিল না। তাই এলিজাবেথ প্রটেস্টান্ট ধর্মের দিকে ধাবিত হয়।

হেনরির পর তার মেয়ে মেরি রানি হয়ে চার্চ অফ ইংল্যান্ডকে পুনরায় রোমান ক্যাথলিক গির্জার সাথে মিলিত করার চেষ্টা করে। রোমান ক্যাথলিকদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহের কারণ ছিল যাতে এলিজাবেথ মেরির মোকাবিলায় বাদশাহির দাবিদার হতে না পারে। কিন্তু এলিজাবেথ প্রটেস্টান্ট দলের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে মেরিকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই ইংল্যান্ডের রানি হয়ে যায় এবং চার্চ অফ ইংল্যান্ডকে আবারও রোম থেকে আলাদা করে ফেলে। এলিজাবেথ একজন শক্তিশালী রানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সে-ই প্রথম রানি, যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসার জন্য অনুমতি দেয়। তার রাজত্ব প্রায় পঞ্চাশ বছর পরিব্যাপ্ত ছিল। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে প্রটেস্টান্টদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এলিজাবেথের ক্ষমতা রোমান ক্যাথলিক গির্জার শাসনব্যবস্থার জন্য অনেক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

১৬০৩ সালে এলিজাবেথের পর জেমস প্রথম ইংল্যান্ডের বাদশাহ হয়। জেমস রোমান গির্জার দিকে ধাবিত ছিল; কিন্তু ইংল্যান্ডের জনগণ এলিজাবেথের যুগে স্বাধীন হিসেবে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; ফলে জেমস তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কাবু করতে সক্ষম

ছিল না। তাই জেমস ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটু কৌশলে কাজ করার চেষ্টা করে। সেই কৌশল ছিল, প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের একসাথে নিয়ে চলা। ধর্মীয় পরিচয়ের এই কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জেমস সাতচল্লিশজন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। যাদের কাজ ছিল ধর্মীয়ভাবে উভয় দলকে একত্রিত করা। কিন্তু ইংল্যান্ডের রোমান ক্যাথলিকরা জেমসের এই কার্যক্রমকে ধর্মের মধ্যে বিকৃতি মনে করে বসে এবং তারা এই কার্যক্রমের বিরোধী হয়ে যায়। তারা বাদশাহকে হত্যার পরিকল্পনা করে। রোমান ক্যাথলিকরা চক্রান্ত করে যে, বাদশাহ যখন পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেবে, তখন পার্লামেন্টকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু এই চক্রান্ত প্রকাশিত হয়ে যায়; ফলে বাদশাহ ক্যাথলিকদের বিরোধী হয়ে যায়। যার পর প্রটেস্টান্ট দল ইংল্যান্ডে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়।

জেমসের মৃত্যুর পর চার্লস প্রথম বাদশাহ হয়। সে এই নীতি গ্রহণ করে যে, 'বাদশাহর সিদ্ধান্ত মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আদেশ'—যা ছিল রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস। অন্যদিকে প্রটেস্টান্ট দল মনে করত, পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার আদেশের বহিঃপ্রকাশ। চার্লসের যুগে ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রটেস্টান্ট ধর্ম অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। তারা চার্লসের চিন্তাধারাকে রোমান ক্যাথলিক আদর্শের ধারক মনে করে এবং প্রটেস্টান্টদের শাখা 'পিউরিটান' সেনাপতি অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের ফলে চার্লস প্রথম নিহত হয় এবং ক্রমওয়েল ইংল্যান্ড থেকে বাদশাহি প্রথাকে নিঃশেষ করে দেয়। ক্রমওয়েল ছিল ইংল্যান্ডের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এর মাধ্যমে একদিকে ইংল্যান্ডে রোমান ক্যাথলিকরা দুর্বল হয়ে প্রটেস্টান্টরা শক্তিশালী হয়ে যায়। অপরদিকে বাদশাহরা দুর্বল হয়ে পার্লামেন্ট শক্তিশালী হয়ে যায়। ক্রমওয়েলের এই বিদ্রোহ দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারেনি। ১৬৬০ সালে তার মৃত্যুর পর বাদশাহি শাসনব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ক্রমওয়েল ইতিহাসে যে প্রভাব ফেলার দরকার ছিল, তা সম্পন্ন করে যায়। সেই প্রভাবের মধ্যে ছিল, প্রটেস্টান্ট দলকে শক্তিশালী করা, পার্লামেন্টকে বাদশাহদের ওপর জয়ী করা। সর্বশেষ পরিপূর্ণভাবে এই বিষয়টি ১৬৮৮ সালে সম্পন্ন হয়, যাকে ব্রিটেনের ইতিহাসে '১৬৮৮ সালের মহান বিপ্লব' বলা হয়ে থাকে।

ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালের 'মহান বিপ্লব'
(খ্রিষ্টান-ইহুদি জোটের প্রথম পদক্ষেপ)

১৬৮৫ সালে জেমস দ্বিতীয় সিংহাসনে বসে। সে বাদশাহি বিশ্বাসের দিক থেকে ক্যাথলিক ছিল এবং বাদশাহের ইচ্ছাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রাখত। জেমস দ্বিতীয় ইংল্যান্ডকে আবারও ক্যাথলিকদের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের পার্লামেন্টসহ তার মেয়ে মেরি ও তার জামাতা উইলিয়াম ক্যাথলিকদের সাথে মিলিত হতে বাধা দেয়। যার ফলে জেমসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা করা হয়। তারপর মেয়ে মেরি, যে প্রটেস্টান্ট ধর্মের অনুসারী ছিল এবং তার স্বামী উইলিয়ামকে সম্মিলিতভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ১৬৮৮ সালের এই বিপ্লবকে 'মহান বিপ্লব' (Glorious Revolution) বলা হয়। ১৬৮৮ সালের এই বিপ্লব শুধু ব্রিটেন ও ইউরোপে নয়; বরং পরবর্তী দুইশ বছরের মধ্যে পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর অনেক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। গির্জা ও বাদশাহদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক ধর্মের লড়াই, যা মূলত মধ্যযুগ থেকে শুরু হয়েছিল, এখন তা আস্তে আস্তে নিজস্ব রং ধারণ করা শুরু করেছে। অতঃপর এই পরিবর্তন ব্রিটেন থেকে বের হয়ে ইউরোপের মধ্যে ছড়ানো শুরু করে। ১৬৮৮ সালের বিপ্লব থেকে সৃষ্ট পরিবর্তন ও প্রভাব আমরা নিচে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করছি :

ইংল্যান্ডের সেই বিপ্লবের ফলে সরকারীভাবে রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রভাব ব্রিটেন থেকে সর্বদার জন্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং চার্চ অফ ইংল্যান্ড একটি আলাদা গির্জার আকৃতি ধারণ করে। এই ঘটনাকে ব্রিটেনে ক্যাথলিকদের পরাজয় ও প্রটেস্টান্ট ধর্মের বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে ইংল্যান্ডের এই চার্চ পূর্ণভাবে ক্যাথলিকদের বর্জন করেনি, আবার পূর্ণভাবে প্রটেস্টান্টকেও আঁকড়ে ধরেনি। নিজেদের ব্যাপারে তাদের দাবি ছিল, 'এই চার্চ ক্যাথলিক ধর্মানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রটেস্টান্ট সংশোধনী বাস্তবায়িত হয়েছে।'

চার্চ প্রটেস্টান্ট নীতিমালা ও পরিভাষা গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে ব্রিটেনের মধ্যে বাদশাহদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কারণ 'মার্টিন লুথার' ও 'ক্যালভিন'-এর থিউরিতে 'বাদশাহর ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ন্যস্ত' এই বিশ্বাসের পরিবর্তে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বাদশাহির ধারণা উপস্থিত ছিল। ফলে শাসনক্ষমতা ক্যাথলিক ধর্মমতে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী পরিচালনার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়; বরং তার পরিবর্তে প্রটেস্টান্ট সংশোধনীর ভিত্তিতে সেক্যুলার থিউরি অনুযায়ী হুকুমত পরিচালনার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়, যেখানে খ্রিষ্টানরা সেক্যুলার নীতিমালা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে। শুধু এতটুকুই শর্ত ছিল যে, সেক্যুলার প্রশাসন কোনো খ্রিষ্টানকে তার ধর্মীয় অপরাধের দিকে ধাবিত করতে পারবে না।

তখনকার সময় পরিপূর্ণভাবে পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতা আসেনি; বরং ব্রিটেনের ক্ষমতা এক নতুন দিকে চলা শুরু করে। ব্রিটেনের পার্লামেন্টে দুটি অংশ হয়ে যায়। একটি টোরি পার্টি ও দ্বিতীয়টি হুইগ পার্টি। টোরি পার্টিকে বাদশাহদের পার্টিও বলা হয়। আর হুইগ পার্টিকে পার্লামেন্টের সংবিধানে বিশ্বাসীদের পার্টিও বলা হতো। সময়ের সাথে সাথে হুইগ পার্টির নাম লিবার পার্টি ও টোরি পার্টি আজকের কনজারভেটিভ পার্টি হয়ে যায়। এই দুই পার্টি আজও ব্রিটেনের ক্ষমতার নব্বই শতাংশ দখল করে আছে।

আমেরিকা-আবিষ্কার ও প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের আশ্রয়কেন্দ্র

আমেরিকা আবিষ্কার হয় ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের হাতে।[৩৫] আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপের দেশগুলো এই নতুন ভূখণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমেরিকা মহাদেশের স্বর্ণ ও রূপার ভাণ্ডার হিংস্র পশুর মতো লুটপাটের ফলে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয়। ব্রিটেনের পূর্বেই উত্তর আমেরিকাতে পর্তুগাল, ওলান্দাজ ও স্পেন অনেক ভূমি দখল করে নিয়েছিল; কিন্তু ১৬০৭ সালে ইংরেজরা তাদের আস্তে আস্তে উত্তর আমেরিকা থেকে বের করে দেয়। এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ এলাকার ওপর ব্রিটেনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সেই আবাদিগুলোতে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম ব্রিটেন সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হওয়ার আওয়াজ তোলে এবং বিশাল যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ১৭৭৬ সালে উত্তর আমেরিকার অঞ্চলগুলো ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে নেয়। আর এভাবেই আমেরিকাতে নতুন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬০৭ সালে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে ইভাঞ্জেলিকান চার্চ অফ ইংল্যান্ড নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে নেয়, যা ছিল প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের বৈশ্বিক চার্চ। অতঃপর অন্যান্য প্রটেস্টান্ট দলের খ্রিষ্টানরাও ইউরোপের নির্যাতন থেকে পলায়ন করে সময়ে সময়ে আমেরিকাতে আসতে থাকে। এদের মধ্যে প্রটেস্টান্টদের কট্টর শাখা পিউরিটানও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা ১৬২০ সালে ধর্মীয় সফরের মাধ্যমে প্লেমাথ ও ম্যাসচুস্টেস এলাকাতে আবাদ হয়।

---

৩৫. আমেরিকা মূলত মুসলিমদের আবিষ্কার। কলম্বাসের বহু আগেই মুসলিম নাবিকরা সেখানে পৌঁছেছিল। এমনকি কলম্বাস মুসলিম ভূগোলবিদদের তৈরি মানচিত্র অনুসরণ করেই আমেরিকার সন্ধান পেয়েছিল। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে 'আমেরিকা মুসলিমদের আবিষ্কার' বইটি পড়া যেতে পারে।

আমেরিকাতে ইহুদিবাদী খ্রিষ্টানদের ঘাঁটি স্থাপন (ক্রুসেড-ইহুদি জোটের দ্বিতীয় পদক্ষেপ)

ইউরোপে গির্জার নির্যাতনের ফলে প্রটেস্টান্ট দলের সাথে ইহুদিরাও আমেরিকাতে চলে আসে। ১৬৩৫ সালে আমেরিকার রোহাড দ্বীপে তাদের সর্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে আমেরিকাতে ইহুদিদের ব্যাপকভাবে আগমন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হয়েছিল। বিশেষ করে ১৮৮১ থেকে ১৯২৪ খ্রি. পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপ থেকে ইহুদিরা ধারাবাহিক আমেরিকাতে আসছিল। হলোকাস্ট থেকে বাঁচার জন্য ইহুদিদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। বাস্তবতা হলো, আমেরিকার ক্ষমতা প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের হাতে আজও পর্যন্ত অটল রয়েছে।

যদি সেই যুগের ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা করে ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনা করা হয়, তাহলে কয়েকটি ফলাফল স্পষ্টভাবে সামনে আসবে :

- ইউরোপে জন্ম নেওয়া মতাদর্শগুলো আমেরিকাতে আরও অধিক শক্তিশালী হতে থাকে। কেননা, সেখানে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা ছিল না। আমেরিকাতে ইউরোপের সেই সমস্ত ব্যক্তি একত্রিত হয়েছিল, যারা ক্যাথলিক গির্জার সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও কঠোরতা থেকে পলায়ন করেছিল।
- আমেরিকাতে প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা পারস্পরিক চিন্তাগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য শূন্য ময়দান পেয়ে যায়। যার ফলে আমেরিকাতে ইহুদিবাদী ক্রুসেড স্কুল অফ থট প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে 'নিও কনসারভেটিভ' (Neo Conservatives) বা 'নিও কন' (Neo Con) বলা হয়।
- আমেরিকাতে ইউরোপের তুলনায় ধর্মহীন সেক্যুলার বিশ্বাস আরও অধিক উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। পক্ষান্তরে ইউরোপে এখনো প্রচলিত ধর্মের ঝলক দেখা যায়।
- আমেরিকাতে শুরু থেকেই বাদশাহি শাসনব্যবস্থা প্রতষ্ঠিত ছিল না।

ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রি.)

ইউরোপের মধ্যে একদিকে সেক্যুলার চিন্তার বিপ্লব মানুষের মন-মস্তিষ্ক পরিবর্তন করছিল, অপরদিকে সংশোধন আন্দোলন গির্জাকে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল করে দিচ্ছিল। তৃতীয় দিক থেকে প্রটেস্টান্ট নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ বাদশাহদের থেকে বিমুখ হয়ে পার্লামেন্টের দিকে ছুটছিল। অপরদিকে ইউরোপে আরও একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা পরবর্তী যুগে বিশ্বের ইতিহাসে খুব গভীর প্রভাব রেখেছিল। এটা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের

রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংঘটিত ৩০ বছরের যুদ্ধ এবং যার ফলে হয় ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি। আর এটা ছিল রেনেসাঁর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ৩০ বছরের যুদ্ধের পর নতুন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের থিউরি সামনে আসে। এই থিউরির গর্ত থেকেই আজকের (দ্বীনের ঊর্ধ্বে) জাহিলি দেশপ্রেমের মতাদর্শ ও আধুনিক জাতীয়তাবাদী বাহিনীর মধ্যে (দ্বীনের পরিবর্তে) দেশের জন্য যুদ্ধের আদর্শ অস্তিত্বে আসে।

যেমনটা মধ্যযুগের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, খ্রিষ্টানদের ইউরোপে উত্থান হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই সাম্রাজ্য ৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের ভৌগলিক সীমা সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছিল। এর মধ্যে আজকের জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া, সুইডেন, হাঙ্গেরি, বুহেমিয়া ও স্পেনের অনেক এলাকা অন্তর্গত ছিল। এগুলো ছাড়াও অনেক শহর ও রাষ্ট্র আলাদাভাবে যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সময়ের সাথে সাথে হোলি রোমান এম্প্যায়ার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার অধীন রাষ্ট্রগুলো নিজে নিজেই স্বাধীন হয়ে যায়।

১৭১৮ সালে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। এই যুদ্ধকে ইউরোপের ইতিহাসে 'থার্টি ইয়ারস ওয়ার' বলা হয়। এই যুদ্ধের কারণগুলো অনেক দুর্বোধ্য। এখানে রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের বাইরের রাষ্ট্রগুলোও অংশগ্রহণ করেছিল। ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের বড় দুটি কারণ বলেছেন, ধর্মীয় ও ভৌগলিক সম্প্রসারণ। ধর্মীয় এই জন্য ছিল, কারণ, এই যুদ্ধ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে হয়েছিল। এ ছাড়াও রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের ভৌগলিক সীমা বৃদ্ধি করাও লক্ষ্য ছিল। এই যুদ্ধ শেষ হয় 'ওয়েস্ট ফেলিয়া' নামক প্রসিদ্ধ চুক্তির মাধ্যমে।

ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তির অধীনে অনেক প্রটেস্টান্ট রাষ্ট্রের নিজেদের ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে যায়। ফলে এটা ছিল প্রটেস্টান্টদের আরও একটি বিজয়। অপরদিকে এই চুক্তির অধীনের হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, মালান, সুয়াই, গিনি, মানছুয়া, ঠাসকেনি, লোকা, এডমিনা, পারমা রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে নেয়। এই চুক্তি শুধু ইউরোপ নয়; বরং আধুনিক পুরো বিশ্বের ভৌগলিক বিভক্তির উৎস ছিল। এই চুক্তি থেকেই নতুন রাষ্ট্র, শহর, ভৌগলিক সীমা নির্ধারণ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, দেশাত্ববোধ এবং জাতীয়তাবাদী বাহিনীর থিউরি ও মতাদর্শগুলো সামনে আসে। অতঃপর যখন খিলাফতে উসমানির পতন হয়, তখন এই সূত্রই আরব ও তুর্কি জাতীয়তাবাদের চেতনা মুসলিমদের মধ্যে তৈরি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন উসমানি সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়, তখন এই থিউরির ভিত্তিতেই নতুন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অস্তিত্বে আসে। আজ মুসলিম উম্মাহ সাতান্নটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। সাতান্নটি বাহিনী ও সাতান্নটি জাতীয়তা। এই সবের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আজকের নতুন দেশীয় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, যা জাতিসংঘে গ্রহণযোগ্য, সেখানে চারটি শর্ত রয়েছে। সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব, আবাদি, ভৌগলিক সীমানা এবং প্রশাসন। এই সবগুলোর ভিত্তি এই অভিশপ্ত ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি।

ব্রিটেনে পার্লামেন্টের উন্নতি ও উত্থান

ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্রিটেনে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া শুরু হয়। মেঘনা কার্টা চুক্তি ব্রিটেনে পার্লামেন্ট-ব্যবস্থার যেই ভিত্তি রেখেছিল, রেনেসাঁর যুগে এই ব্যবস্থা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। যার কয়েকটি কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। ১২১৫ সালে সম্রাট জন প্রথমের সময় মেঘনা কার্টা চুক্তি হয়েছিল; যার ফলে জনগণের জন্য একটি পরামর্শ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু যখন তার ছেলে হেনরি তৃতীয় সিংহাসনে বসে, তখন তার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের এক জাগিরদার সাইমন ডি মন্টফোর্ট বিদ্রোহ করে বসে। এই বিদ্রোহের পর সাইমন ইংল্যান্ডের একটি এলাকাতে নিজস্ব স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই হুকুমতের প্রশাসন পরিচালনার জন্য সে জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। হেনরি তার বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠায়; ফলে সাইমন যুদ্ধে মারা যায়। কিন্তু সে ইংল্যান্ডে এমন একটি নতুন রীতি চালু করে দিয়ে যায়, যাকে উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না। এই প্রথার ফলেই পরবর্তী সময়ে এডওয়ার্ড প্রথম ১২৯৫ সালে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। সরকারীভাবে ইংল্যান্ডের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম পার্লামেন্ট।

১৩৪১ সালে এই পার্লামেন্টকে দুটি অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়। নবাব ও জাগিরদারদের জন্য একটি অংশ, যাকে প্রভুদের ঘর বলা হতো। আর যেখানে জনগণের ফয়সালা হতো, তাকে প্রজাদের পরিষদ বলা হতো। ১৫৪৪ সালে প্রভুদের পরিষদের নাম 'হাউজ অফ লর্ডস' রাখা হয়, অন্যদিকে জনগণের পরিষদকে 'হাউজ অফ কমন্স' রাখা হয়। বর্তমানেও ব্রিটেনের পার্লামেন্টে এই দুটি হাউজ উক্ত নামেই রয়েছে।

এডওয়ার্ড তৃতীয় এর সময় পার্লামেন্টের শক্তি তখন বৃদ্ধি হয়, যখন পার্লামেন্ট বাদশাহর অনুমতি ছাড়াই জনগণের ওপর কিছু ট্যাক্স বসিয়ে দেয়। পার্লামেন্ট ও বাদশাহদের এই রেষারেষি কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত চলমান ছিল। যখন বাদশাহ দুর্বল হয়ে যেত, তখন পার্লামেন্ট শক্তিশালী হয়ে যেত। আর যখন বাদশাহ শক্তিশালী হয়ে যেত, তখন পার্লামেন্ট দুর্বল হয়ে যেত। বাদশাহ ও পার্লামেন্টের মাঝে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে, যখন ক্রমওয়েল বাদশাহিকে খতম করে পার্লামেন্টকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অতঃপর ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালের মহান বিপ্লবে পার্লামেন্টের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়।

জানা থাকা জরুরি যে, ব্রিটেনের এই পুরাতন পার্লামেন্ট ও ব্রিটেনের আজকের গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পুরাতন পার্লামেন্ট ধর্ম থেকে স্বাধীন ছিল না এবং তা সমাজের নেতাদের কথা ও নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হতো। অর্থাৎ তার সদস্য হওয়ার পদ্ধতি আজকের মতো অধিকাংশের রায় ছিল না; বরং গ্রহণযোগ্যতা ছিল সদস্য হওয়ার মাপকাঠি। তেমনই সদস্য নির্বাচন 'এক মানুষ এক ভোট' এই নীতিতে ছিল না; বরং জাতির বড় বড় ব্যক্তিত্বরা সরকার নির্বাচন করত। ফরাসি বিপ্লবের পর এই পার্লামেন্ট পূর্ণভাবে নতুন সেক্যুলার গণতান্ত্রিক আকৃতি ধারণ করে। এই বিষয়ে সামনে আরও অধিক আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থান ও উন্নতি

ইউরোপের মধ্যে রেনেসাঁর যুগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসার মৌলিক কারণ ছিল ইউরোপের গির্জা, বাদশাহ ও জাগিরদার ব্যবস্থার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া। গির্জার মূল শিক্ষা ছিল আত্মীয়তার বন্ধন এবং সমাজের মধ্যে সত্যবাদিতা ও কল্যাণকামিতা। কিন্তু বাস্তবে গির্জার পাদরি, বাদশাহ ও জাগিরদার নিজেরাই জনগণের সম্পদ লুটে নেওয়া ও জমা করার মধ্যে ব্যস্ত ছিল। তাদের জীবনযাপন দেখে এমনটা মনে হতোই না যে, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের কোনো সম্পর্ক আছে। গির্জা ও তাদের কাজের বৈপরীত্য তাদের ধর্মীয় প্রভাব নষ্ট করে ফেলে। আর এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রেনেসাঁর যুগে ইউরোপের জনগণ এমন বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে নেয়, যা গির্জা ও তার শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, ইউরোপের মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর মহামারি যাকে 'ব্ল্যাক ডেথ' বলা হয়। এই মহামারির ফলে ইউরোপে শ্রমিক, ক্রেতা ও উৎপাদনকারী জনগণের পরিমাণ অনেক কমে যায়। যার ফলে জনগণ শহরের দিকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে এবং শহরের জনগণ নতুন ভূমির তালাশে হিন্দুস্থান ও আমেরিকার দিকে সফর করতে শুরু করে। এই মহামারিতে প্রভাবিত হয়ে সেই সময় ইউরোপের প্রশাসনগুলো হিন্দুস্থানের দিকে নিজ নিজ ব্যবসায়িক কোম্পানি পাঠানো শুরু করে।

ইউরোপের সামাজিক নীতিমালা পরিবর্তনের তৃতীয় কারণ ছিল, প্রটেস্টান্টদের সংশোধন আন্দোলন ইউরোপে সফলতা লাভ করা। যার ফলে খ্রিষ্টানদের মধ্যে বস্তুবাদ ও দুনিয়াপূজার চিন্তা বৈধতা পেয়ে যায়। বাদশাহরা সম্পদ জমা করার অনুমোদন পেয়ে যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল দর্শন

পুঁজিবাদী চিন্তাধারার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা এখানে শুধু তার মৌলিক থিউরিগুলো উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল থিউরি হচ্ছে, মানুষ সকল কাজ নিজের বস্তুগত ফায়দা ও ব্যক্তিগত চাহিদার পূর্ণতার জন্য করে। এর জন্যই সে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পেশা ও কাজ গ্রহণ করে নেয়। তাই সবারই অধিক থেকে অধিক ফায়দা অর্জনের জন্য কাজ করার অধিকার লাভ করা উচিত। মানুষ নিজের লাভের জন্য (সেলফ ইন্টারেস্ট) অধিক কাজ করার দ্বারা সমাজ অধিক লাভবান হবে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে, পুঁজি বৃদ্ধি করা ও জমা করা। এই পুঁজি তখনই বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব, যখন মানুষ অধিক থেকে অধিক উৎপাদন করা বা ব্যবসা করা এবং পণ্য প্রচারের সুযোগ পাবে।

উৎপাদন ও ব্যবসার কাজ হচ্ছে, কেউ উৎপাদন বা ব্যবসার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করবে। আর অন্য কেউ পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রম দেবে এবং কেউ উৎপাদন ও ব্যবসার জন্য ভূমি দেবে। অতঃপর উৎপাদিত দ্রব্য ও ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রির ফলে লাভ অর্জিত হবে। এই লাভ থেকে শ্রমিক, পুঁজিদাতা, ভূমিদাতা ও ব্যবসায়ী সবাই নিজের অংশ গ্রহণ করবে।

এই সব কাজের জন্য এমন এক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, যেখানে প্রশাসনের প্রভাব অনেক কম থাকবে। অর্থাৎ প্রশাসনের ট্যাক্স কম হবে এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রাইভেটভাবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থার অধীনে মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিক থেকে অধিক সুযোগ লাভ করবে। ফলে তা প্রতিযোগিতার এক বিশাল ময়দান তৈরি হবে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি অধিক থেকে অধিক লাভ অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং পুঁজি বৃদ্ধি করতে পারবে। এই ব্যবস্থাকেই বর্তমানে স্বাধীন বাণিজ্য বা ফ্রি ইকোনমি বলা হয়ে থাকে।

এই দর্শন ও থিউরির ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপের মধ্যে কোম্পানির ব্যবসা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং কারেন্সি নোট প্রচলিত হয়, যাকে আজ পেপার কারেন্সি বলা হয়ে থাকে। তাই আমরা কোম্পানি, ব্যাংক ও কারেন্সির ইতিহাসে একবার দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করছি।

আন্তর্জাতিক কোম্পানির ইতিহাস

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার দরুন সেখানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। যা ইউরোপের জাগিরদার ব্যবস্থার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। শ্রমিক শ্রেণি কমে যাওয়ার ফলে জাগিরদারদের উৎপাদন কমে আসে এবং শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অনেক বেড়ে যায়। জনগণ কমে যাওয়ার ফলে আমদানি ও রপ্তানি কমে আসে। যার ফলে ইউরোপের মধ্যে বাজার কমে যেতে শুরু করে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ইউরোপের জন্য আবশ্যক হয়ে যায় যে, তারা নিজেদের সম্পদ বিক্রির জন্য নতুন বাজার ও প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য সস্তা উপনিবেশ খুঁজে বের করবে। যার ফলে ইউরোপের জাগিরদাররা সামুদ্রিক পথে নতুন বাজার ও বাণিজ্যিক এলাকা তালাশে বের হয়, কেননা স্থলভূমির রাস্তাগুলো সব উসমানিদের অধীনে ছিল। ইউরোপের জাগিরদাররা সামুদ্রিক সফরে ব্যবসার থেকে বেশি ঝগড়া-ফাসাদেই লিপ্ত ছিল। যাদের মধ্যে পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স, ওলন্দাজ, স্পেন এবং ইংরেজ সবাই শামিল ছিল। তারা সেসব ক্ষুধার্ত ভেড়ার মতো ছিল, যারা নিজেদের শিকারকে গাফিল দেখে কেবল তাকেই আহার করে না; বরং পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে।

এখান থেকেই কোম্পানির উত্থান হয়, যা মূলত তখনকার সময় ইউরোপের জাগিরদাররা ব্যবসার উদ্দেশ্যে গঠন করেছিল। তার মধ্যে একটি কোম্পানি উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই যুগকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইউরোপে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার যুগ' নাম দেওয়া যায়। এই যুগে বিশ্বের সমস্ত সম্পদ এসে পশ্চিমাদের কাছে

জমা হয়ে যায়। অতঃপর এই কাঁচামাল ও সম্পদ দিয়ে ব্যবসার জন্য নতুন বাজারের খোঁজে ইউরোপের ব্যবসায়ীরা তিনটি এলাকার দিকে অভিমুখী হয়। একটি আফ্রিকা মহাদেশ, দ্বিতীয়টি পূর্ব ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ ও তৃতীয়টি পাক-ভারত উপমহাদেশ। শুরুতে আফ্রিকার দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। কেননা, সেই সময় আফ্রিকার বাসিন্দারাও সেখানের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে জানত না। কিন্তু তেল, সোনা, হীরা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের পর পশ্চিমারা সেখানে এতটাই শক্তিশালী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে যে, আজও সেখানে সরকার বসানো ও নামানোর ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি হাত থাকে। আফ্রিকার মতো আমেরিকাও তাদের লক্ষ্য ছিল না। আমেরিকা তো হিন্দুস্থানের সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে যায়; তাই সেখানের আদি বাসিন্দাদের রেড ইন্ডিয়ান বলা হয়। যদিও আফ্রিকা বা আমেরিকাকে ইউরোপীয়রা কম লুটপাট করেনি; কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুস্থান। যেখানের শিল্প, অর্থ ও খনিজ সম্পদের ব্যাপারে তাদের খুব ভালোভাবেই জানা ছিল।

ইউরোপ থেকে হিন্দুস্থানে আসার দুটি রাস্তা ছিল। প্রথমটি সংক্ষিপ্ত রাস্তা রোম উপসাগর পাড়ি দিয়ে মিশর, সেখান থেকে লোহিত সাগর ও আরব সাগর হয়ে হিন্দুস্থান পৌঁছানো। এই রাস্তা পুরোটাই উসমানিদের অধীন ছিল। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউন ঘুরে আরবসাগর হয়ে হিন্দুস্থান পৌঁছানো। প্রথমটি দিয়ে দুই মাসে আসা-যাওয়া করা যেত; কিন্তু দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে আট মাসের অধিক সময় লেগে যেত। দ্বিতীয় রাস্তাটিকে 'আশার রাস্তা' বা ক্যাপটাউনকে 'উত্তমাশা অন্তরীপ' বলা হয়। কেননা, এখান থেকে ইউরোপীয়রা নিজেদের কোম্পানি সমুদ্রপথে রওয়ানা করিয়ে দিত। এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে সমস্ত মাঝি সর্বপ্রথম বিলাতিদের হিন্দুস্থান পৌঁছার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল, তারা ছিল আরব মুসলিম। সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানে এসেছিল পর্তুগাল, ওলন্দাজ ও ফ্রান্স এবং সর্বশেষ এসেছিল ব্রিটেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা বাকিদের তাড়িয়ে একাই হিন্দুস্থানের ওপর কব্জা করে নেয়। যদি বলা হয়, ব্রিটেনের হিন্দুস্থান দখল পশ্চিমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়, অতঃপর পুরো বিশ্ব দখলের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শক্তি সঞ্চয় ও সাহায্যের ভূমিকা পালন করেছিল, তাহলে ভুল হবে না।

মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলিমদের থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপ ও আমেরিকাতে শিল্প-বিপ্লব হয়। এই সম্পদের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো ইউরোপে নতুন নতুন কারখানা চালু করা শুরু করে। এই কারখানাগুলোতে সস্তা শ্রমিকের জন্য আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকাগুলোতে হামলা করে লক্ষ লক্ষ কালো মানুষকে গোলাম বানিয়ে এনে তাদের দিয়ে ফ্রি কাজ করিয়ে নিত। বাস্তবে পশ্চিমাদের বস্তুগত উন্নতি হিন্দুস্থানের সম্পদ ও আফ্রিকার শ্রম এবং আমেরিকার ওপর অবৈধ দখলের ফলেই হয়েছিল। এই উৎপাদিত পণ্যকে বৈশ্বিক বাজার পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে খিলাফতে উসমানিয়ার আকৃতিতে একটি বড় বাধা বাকি রয়ে গিয়েছিল। শুধু স্থল ও জলের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাই নয়; বরং উসমানিদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুরো

ইসলামি বিশ্বও একটি বড় বাজার ছিল। পশ্চিমারা ষড়যন্ত্র করে ১৯২৪ সালে খিলাফতকে ধ্বংস করার পর এই বাধাও দূর হয়ে যায়। তারপর নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনে মুসলিম উম্মাহকে পঞ্চাশের অধিক ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেয় এবং সেই রাষ্ট্রগুলোর বাজার পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা তৈরি করে নেয়। আর এভাবেই ইউরোপ বৈশ্বিক বাজারের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

এই সময়ে এসে পশ্চিমাদের সামনে কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়। পশ্চিমাদের পরিভাষা অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের বাজারে বহিরাগত পণ্য আমদানির ওপর শক্তিশালী বাধা ও মোটা অংকের ট্যাক্স বসিয়ে রেখেছিল। যার ফলে ১৯২৯ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই পণ্যগুলো বিক্রি না হওয়াতে পশ্চিমা কারেন্সির মূল্য-স্ফীত হয়ে যায়। তখনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো এই সমস্যা থেকে বের হতে পারেনি, এর মধ্যেই রাশিয়ার সমাজ-বিপ্লব এবং ইউরোপে জার্মানির ফ্যাসিবাদী নাজি বিপ্লব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আঘাত করে। অতঃপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যেখানে জার্মানি পরাজিত হয়। এই সব সমস্যার ফলে ইউরোপ বিশ্বের নেতৃত্বের দৌড়ে পিছিয়ে যায়। এরপর আমেরিকা ও রাশিয়া বিশ্বের দুটি বিশাল পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

রাশিয়া ও আমেরিকার কোল্ড ওয়ার ছিল মূলত এক প্রকারের বাণিজ্যিক যুদ্ধ। এই বাণিজ্যিক যুদ্ধে পুঁজিবাদী পশ্চিমা কোম্পানিগুলো অগ্রগামী হয়ে যায় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে তারা নিজেদের এতটাই শক্তিশালী করে ফেলে যে, তারা তখন উৎপাদিত পণ্যকে বৈশ্বিক বাজার পর্যন্ত পৌঁছানোর সব সুবিধা ও মাধ্যমের ওপর পরিপূর্ণ কব্জা প্রতিষ্ঠা করে নেয়। এই শত বছরে কোম্পানির কাজের পদ্ধতি ও ধরনের মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক কোম্পানি, আন্তর্জাতিক কোম্পানি ও সরকারী কোম্পানি ইত্যাদি কাঠামো এই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আজকের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের যুগে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো দেশীয় কোম্পানিগুলো থেকে অনেক বড় হয়ে গেছে। এর বিস্তারিত আলোচনা বইয়ের দ্বিতীয় অংশ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মধ্যে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যাংকের ইতিহাস

বৈশ্বিক বাণিজ্যে ইউরোপের উন্নতির লক্ষ্যে কোম্পানিগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য একটি সুসংহত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। আর এই প্রয়োজন থেকেই ব্যাংক ও কারেন্সির নতুন পদ্ধতি জন্ম হয়। ইউরোপে ব্যাংকের শুরু মূলত ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে হয়েছে, যখন খ্রিষ্টান বাহিনীর সেনাদের বেতন পৌঁছানোর জন্য গির্জার পক্ষ থেকে নাইটদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাদের নাইট টেম্পলার বলা হতো। এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক ইউরোপে ব্যাংক ও কারেন্সির শুরু ইহুদি মুদ্রাব্যবসায়ীদের থেকে হয়েছিল, যাদের ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো পেশা গ্রহণের অনুমতি ছিল না। ব্যবসায়ীরা তাদের স্বর্ণ, রূপার কয়েন ও দামি বস্তুগুলো এদের কাছে গচ্ছিত রেখে তাদের থেকে রশিদ নিয়ে নিত। যখন ব্যবসায়ীরা কোনো কিছু ক্রয় করত, তখন মুদ্রাব্যবসায়ীরা সেই রশিদ দিয়ে

দিত। বিক্রেতা ব্যবসায়ীর এই রশিদ নিয়ে মুদ্রাব্যবসায়ীর কাছে গেলে সে তাকে সেই পরিমাণ স্বর্ণ আদায় করে দিত।

একসময় ইহুদি মুদ্রাব্যবসায়ীরা দেখল, অনেক কম লোকই নিজেদের স্বর্ণ ওঠানোর জন্য তাদের কাছে আসে। কারণ তারা যখন ব্যবসার ক্ষেত্রে এই রশিদ ব্যবহার করে, তখন রশিদ হাসিলকারী স্বর্ণ না উঠিয়ে এই রশিদকেই আরও সামনে বাড়িয়ে দিত, তথা আরেকজনের কাছে হস্তান্তর করে দিত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এভাবে একের পর এক হস্তান্তর হতেই থাকত।

যার ফলে আস্তে আস্তে মুদ্রাব্যবসায়ীদের কাছে অনেক বেশি স্বর্ণ জমা হয়ে যায়। কেননা, শুধু ২০% বা তার থেকে কম ব্যক্তিরা স্বর্ণ নিতে আসত। তাই মুদ্রাব্যবসায়ীরা ২০% ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ রেখে বাকিগুলো সুদি লোন বা ঋণের জন্য ব্যবহার শুরু করে। এভাবেই একসময় মুদ্রাব্যবসায়ীরা একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করে এবং সেটাই ছিল বর্তমান ব্যাংকের প্রাথমিক রূপ।

সময়ের সাথে সাথে প্রশাসনও এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা শুরু করে। প্রশাসন তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ এই ব্যাংকগুলোতে জমা করত এবং প্রয়োজনের সময় সেখানে তাদের মূল সম্পদের থেকেও বেশি যত ইচ্ছা ঋণ নিত। যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনগত বৈধতা অর্জিত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রে ব্যাংকের শাখা খুলে দেওয়া হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলো মুদ্রাব্যবসায়ী থেকে ব্যাংকে পরিবর্তন হয় এবং মুদ্রাব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ছিল ইহুদি, তাই আজ বিশ্বের ৮০% এর বেশি ব্যাংকের মালিক ইহুদি। এই ব্যাংকগুলো বিশ্বের সমস্ত জাতি, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে গোলাম বানানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৬০৯ সালে সর্বপ্রথম ব্যাংক হল্যান্ডে খোলা হয়। ১৬৯৫ সালে ইংল্যান্ডে ব্যাংক খোলা হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়াসহ সব রাষ্ট্রেই ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

কারেন্সির ইতিহাস

পরিভাষায় কারেন্সি বলা হয় কোনো জিনিস ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমকে। ইসলামি শরিয়াহতে এটাকে সামান বা মূল্য বলা হয়ে থাকে। পূর্বযুগে স্বর্ণ ও রূপা কারেন্সি বা মূল্য হিসেবে ব্যবহার হতো। ইসলামি ফকিহরাও এই দুটিকে হাকিকি সামান বা মূল্য হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ যেকোনো জিনিসের মূল্য স্বর্ণ বা রূপার পরিমাণের দ্বারা নির্ধারণ হতো। ইসলামি সমাজে প্রকৃত মূল্য হিসেবে স্বর্ণ ও রূপার কয়েন দিরহাম ও দিনার প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জাতি স্বর্ণ ও রূপা জমা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করত। বনি ইসরাইল মিশর থেকে বের হওয়ার সময় স্বর্ণ ও রূপা অলংকারের আকৃতিতে জমা করেছিল। এখনো এগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য অলংকার বা ইটের আকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে।

ইউরোপে স্বর্ণের কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট মুদ্রাব্যবসায়ীরা প্রধানত ইহুদিরা ছিল। তারা অধিকাংশই ব্যবসাকে পেশা হিসেবে নিত; ফলে অন্য জাতির প্রভাবশালীদের মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারত। মুদ্রা ও প্রভাবশালীদের মধ্যে সম্পর্ক খুব গভীর ছিল। জনগণ নিজের উপার্জিত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য মুদ্রাব্যবসায়ীদের কাছে অতিরিক্ত স্বর্ণ জমা রাখত। যার প্রমাণস্বরূপ মুদ্রাব্যবসায়ীরা তাদেরকে এই স্বর্ণের রশিদ দিত। একসময় ব্যবসায়ীরা মূল্য আদায়ের জন্য স্বর্ণের পরিবর্তে এই রশিদ পেশ করা শুরু করে। রশিদের মালিকের উচিত ছিল মুদ্রাব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে রশিদের বিনিময়ে জমাকৃত স্বর্ণ নিয়ে নেওয়া। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সহজতার জন্য এই রশিদকেই ব্যবসার ক্ষেত্রে পরবর্তী লেনদেনে ব্যবহার করে ফেলত। আর এভাবেই রশিদগুলো স্বর্ণ-রূপার পরিবর্তে প্রচলিত কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার হওয়া শুরু হয়। এই রশিদগুলো বর্তমানের কারেন্সি নোটের প্রাচীন রূপ ছিল। এই রশিদ মুদ্রাব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যকার স্মারক হিসেবে ব্যবহার হওয়ার কারণে 'নোট' বলা শুরু হয়। পূর্বে যেহেতু এই কারেন্সির বিপরীতে স্বর্ণের মজুদ থাকা আবশ্যক ছিল, তাই আপনি আজও অধিকাংশ নোটের মধ্যে এই লেখা দেখতে পাবেন, 'রাষ্ট্রীয় ব্যাংক চাহিবামাত্রই ইহার বাহককে ৫০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে।' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জামানত থেকে এই কারেন্সি জারি হয়েছে। যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের দস্তখত আছে। লেখাটিতে 'ইহা' দ্বারা উদ্দেশ্য নোট এবং 'টাকা' দ্বারা উদ্দেশ্য স্বর্ণ বা রূপার কয়েন।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন (১৬৭৫-১৭৮৯ খ্রি.)

ইউরোপে মধ্যযুগে সংগঠিত হিউম্যান রাইটস এবং বিজ্ঞান বনাম ধর্মের দ্বন্দ্বে যুক্তিকে ইলমে ওহির বিপরীতে দলিল হিসেবে গণ্য করা হতো। এখন ইউরোপের দার্শনিকরা নিজেদের অসম্পূর্ণ বুদ্ধির ভিত্তিতে এই ফয়সালা দেয় যে, মানুষ স্বাধীন হিসেবে জন্ম নিয়েছে; কিন্তু ধর্ম ও বাদশাহরা এদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। ধর্ম একটি অন্ধকার, যা মানুষকে গুনাহ-সাওয়াব, হারাম-হালাল এবং আখিরাতের জবাবদিহির কথা বলে আবদ্ধ করে রাখে। এই অন্ধকারকে অস্বীকার করাই আলোকিত চিন্তা বা বুদ্ধির মুক্তি। American History (by James Henretta and others ১৯৯৩) বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠায় লেখক (Enlightenment) এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের ব্যাপারে লিখেছে :

'এই আন্দোলনের সমস্ত দার্শনিক চারটি মূলনীতির ওপর ঐকমত্য হয়েছিল :

- প্রথমত, এই কথার ওপর বিশ্বাস রাখা যে, মানুষের যুক্তিই চূড়ান্ত দলিল।
- দ্বিতীয়ত, এই দুনিয়া প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নীতিমালার ওপর চলমান। (এখানে অদৃশ্য কারও হস্তক্ষেপ নেই)

- তৃতীয়ত, রাষ্ট্র শাসনে সব ধরনের ইলাহি বিধানের ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করা।
- চতুর্থত, সমাজের ধারাবাহিক উন্নতি।'[৩৬]

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই সমস্ত চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি ধাবিত হওয়া, যা ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকাতে চালু হয়েছিল। এই পরিভাষা সেই সময়ের চিন্তাবিদরা তৈরি করেছিল—যারা মনে করত, তারা মূর্খতা ও অন্ধকারকে দূর করে বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও মানবতার সমন্বয়ে গঠিত আলোকিত যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের শুরু সপ্তদশ শতাব্দীতে ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতো যুক্তিবাদী দার্শনিক, থমাস হবস ও জন লকের মতো রাজনৈতিক দার্শনিক এবং পিয়ার বেইলারের মতো সন্দেহবাদী থিউরি প্রচারকদের হাতে হয়েছিল। এই সমস্ত দার্শনিক সামষ্টিকভাবে মানববুদ্ধির শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখত।

এই যুগের দার্শনিকরা আইজ্যাক নিউটনের গতিসূত্র আবিষ্কারের ফলে অনেক প্রভাবিত হয়েছিল। কারণ তাদের যুক্তি ছিল, 'মানুষ যদি বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তা করত, তাহলে তারা সমস্ত সৃষ্টিজীব ও মানুষের জীবনযাপনের নীতিমালা আবিষ্কার করতে পারত। সেই সাথে বুদ্ধিকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, এমনকি নৈতিক মানদণ্ডের ভেদ জানাও সম্ভব।' জন লকের দর্শন যুক্তিবাদের মধ্যে এই কথা বৃদ্ধি করে যে, বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো বাদিহি (প্রকাশ্য সত্য) নয়; বরং তা স্পষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে কল্পনা ও অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। অতঃপর এর থেকে অর্জিত সঠিক জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজের প্রকৃতিকে উন্নতি করতে সক্ষম। অর্থাৎ ধর্মীয় কিতাবের পরিবর্তে মানবপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে সার্বিক সত্য অর্জন করা সম্ভব।

এই সমস্ত দার্শনিকদের দৃষ্টিতে গির্জা, বিশেষ করে ক্যাথলিক গির্জা হচ্ছে সেই শক্তি, যারা সমস্ত বুদ্ধিকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। এই দার্শনিকদের কয়েক জন ধর্মকেও মেনে নিয়েছিল এবং আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখত। কিন্তু এই ধর্ম গ্রহণ আল্লাহ তাআলার আদেশ কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থের নির্দেশনার কারণে ছিল না; বরং যেহেতু এই বিষয়গুলো তাদের যুক্তিতে ধরেছিল, তাই সেগুলো গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাদের কয়েক জন এমন প্রভুর ওপর ইমান রাখত, যিনি মাখলুকাতকে সৃষ্টি করার পর কোনো বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে মুক্ত ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের কাছে আখিরাতের ধারণাও এমন যে, আখিরাতের সফলতার সাথে দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আখিরাতের সফলতা দুনিয়ার জীবনের ওপর নির্ভর নয়। এখানে পার্থিব সফলতাই সবকিছুর মূল।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন মূলত আলাদা কোনো বিশেষ চিন্তার নাম নয়; বরং এটি একটি চিন্তাপদ্ধতি। আর তা হচ্ছে, মানুষের সমস্ত বিশ্বাস ও চিন্তা এবং নৈতিকতাকে বিবেক

---

৩৬. উন্নতি দ্বারা এখানে উন্নতির পশ্চিমা ধারণা উদ্দেশ্য। যার মূল কথা হলো, নফসকে খুশি করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া। সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ করতে পারা।

দিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ের ওপর প্রশ্ন ওঠানো হবে; যাতে বিভিন্ন দিক থেকে নতুন নতুন চিন্তা তৈরি হয়। তাই সেই যুগের লিখিত বই-পুস্তকে অসংখ্য বৈপরীত্য পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দার্শনিকরা বড় কোনো দার্শনিক ছিল না; বরং তারা শুধু জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য বিকৃত চিন্তা প্রচার করত। তারা নিজেরা নিজেকে হিউম্যানিস্ট দলের সদস্য মনে করত। তারা জনমতকে নিজেদের থিউরির দিকে ধাবিত করার জন্য অপরিচিত লেখকদের বই এবং অধিক প্রচারিত মিডিয়া মাধ্যমগুলোকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছিল।

এই দার্শনিকদের অধিকাংশের সম্পর্ক ছিল ফ্রান্সের সাথে। সম্ভবত এর কারণ ছিল সেই সময় ফ্রান্স রোমান ক্যাথলিকদের সবচেয়ে মজবুত কেন্দ্র ছিল। এখানে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও আইনবিদ চার্লস ডি মন্টেস্কু (Charles de Montesquieu) নিজের লিখিত বই প্রচার শুরু করে, যেখানে তখনকার সময়ের বাদশাহি ও পোপতন্ত্রের দুর্নীতির সমালোচনা করা হয়েছিল। রাজনৈতিক সংস্থাগুলো এই বিষয়ে বিশাল গবেষণা পেশ করতে থাকে। যা The Spirit of Laws নামক বইয়ে সংকলন করা হয়েছিল। এমনিভাবে প্যারিসে এক দার্শনিক 'ডেনিস দিদেরো' (Denis Diderot) অন্যান্য দার্শনিকদের সাথে মিলে সবার লেখাকে একত্রিত করে একটি বিশ্বকোষ প্রচার করা শুরু করে। যেখানে এনলাইটেনমেন্টের ব্যাপারে লিখিত সকল বইয়ের সারসংক্ষেপ একত্রিত করার পাশাপাশি এর বিরোধীদের জবাব দেওয়ার জন্য সকল উত্তর যুক্ত করা হয়েছিল।

এই আন্দোলনে সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিল ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী কবি ভলতেয়ার (Voltaire)। সে তখন এনলাইটেনমেন্টের দর্শনকে নিজের লিখিত আক্রমণাত্মক সমালোচনা, অরুচিকর বিভিন্ন প্রবন্ধ, ছোট ছোট উপন্যাস, বিভিন্ন লেখক ও বাদশাহদের নামে অসংখ্য কাব্য লেখার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর তার থেকেও বেশি লেখালেখি করেছিল আরেক দার্শনিক রুশো (Jean Jacques Roussea)। রুশো ছিল ফ্রান্সের সেই দার্শনিক, যার দর্শনের ভিত্তিতে আজকের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সে এমন দার্শনিক ছিল, যে তার লেখার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার সাথে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও খোলামেলা অশ্লীল আলোচনা করত। ভলতেয়ারের উপন্যাস 'ক্যান্ডিড' (Candide) এবং 'দর্শনের অভিধান' (Dictionnaire Philosophique), রুশোর বই 'সামাজিক সম্পর্ক' (Social Contract) ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই দার্শনিকদের চিন্তাধারা গিল্ড সমাজ, মার্টিন লুথারের সংস্কার আন্দোলন, পোপতন্ত্র ও বাদশাহির বিরুদ্ধে বিপ্লবের পথকে সহজ করে দিয়েছিল।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের কার্যক্রম ছিল অনেক বিস্তৃত, যা পুরো পশ্চিমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জার্মানিতে 'কান্ট', ব্রিটেনে 'ডেবিড হিউম', ইতালিতে 'চেসারে বিক্কারিয়া' ও আমেরিকাতে 'থমাস জেফারসন' এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের নেতাদেরকে বিভিন্ন আদর্শের আক্রমণের বিরুদ্ধে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। তাদের লেখালেখির ফলে অনেক সদস্য বন্দী হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং চার্চের পক্ষ থেকেও এগুলোর সমালোচনা হচ্ছিল। কিন্তু সেই শতাব্দীর শেষার্ধে সফলতার পালা এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে যেতে থাকে। এমনকি ১৭৭০ সালে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রজন্মের দার্শনিকরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাহায্য পেতে শুরু করে এবং তাদের হাতে থিংকট্যাঙ্ক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেওয়া হয়। বই, মিডিয়া, পত্রিকা ও প্রকাশনার মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা আরও অধিক পরিসরে ছড়িয়ে দেয়। এমনকি শাসকশ্রেণি, ধর্মীয় আলিম এবং রাহিবরাও তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হতে শুরু করে। তাদের সংস্কারগুলোকে সমাজের প্রতিটি শ্রেণি কিছু অংশ হলেও গ্রহণ করে নিয়েছিল। ভলতেয়ারের আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল 'বাদশাহির দর্শন'। এই থিউরি বাদশাহদের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসা শুরু হয়। রুশোর থিউরির ভিত্তিতে মানুষের আবেগ এবং অনুভূতিকেও তার বুদ্ধির মতো গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া শুরু হয়। আরও একটি পরিবর্তন ছিল, দার্শনিকরা সব বিষয়কে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ও সমালোচনা করার এই পদ্ধতিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। আস্তে আস্তে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের প্রভাব আমেরিকাতেও পৌঁছে যায়। সর্বশেষ এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনই ১৭৭২ সালে আমেরিকান বিপ্লবের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণা' ও বিপ্লবের যুদ্ধকে ইউরোপেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়। কেননা আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমেরিকাতে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন শুধু আলোচনা-পর্যালোচনার সীমা পাড়ি দিয়ে বাস্তবায়নের স্তরে চলে এসেছে। অতঃপর ইউরোপেও শাসকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের আমেরিকাতে সফলতা ফরাসি বিপ্লবের উদ্বুদ্ধকারী কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের যুগ যদিও ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের পর শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের আরও অগ্রগতি ঘটে। কারণ এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন গির্জার পতন, আধুনিক সেক্যুলারিজমের উত্থান, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং মানবীয় সংশোধনগুলো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। আর এভাবেই পাশ্চাত্য 'উন্নতি'র বিশ্বাস আরও দৃঢ় হতে থাকে।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও আমেরিকার বিপ্লব

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের প্রভাব বইয়ের মাধ্যমে ইউরোপ থেকে আমেরিকাতে পৌঁছে যায়। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় সমস্ত নেতা এই চিন্তার ধারক-বাহক ছিল। যাদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাংলিন ও জেফারসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬২-১৭৭৪ সালে ব্রিটেন আমেরিকাতে নিজেদের দখলকৃত এলাকাগুলোতে দশটি নতুন ট্যাক্স লাগায়। এগুলোর মধ্যে চা, চিনি ও সম্পদের ওপর ট্যাক্স ছিল অন্যতম। জনগণ এই ট্যাক্সকে জুলুম আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে। এই শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা আস্তে আস্তে স্বাধীনতা-যুদ্ধে রূপ নেয়। এবং একটি মহাদেশীয় বাহিনী গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে ছিল আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন। এই আন্দোলনে স্বাধীনতাকামী আমেরিকান রাজাকারদেরকে ভর্তি করা হতে থাকে। এই বাহিনী ও অন্যান্য আমেরিকান জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য একটি 'ঘোষণানামা' প্রদান করা হয়, যাকে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণানামা (Declaration of Independence) বলা হয়। স্বাধীনতার এই ঘোষণানামাটি লিখেছে আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট জেফারসন। এই বিষয়ে তার বক্তব্য হলো, সে এই ঘোষণা লেখার জন্য অনেক বইপত্র অধ্যয়ন করেনি; বরং এখানে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দার্শনিকদের চিন্তাগুলোই লিখে দিয়েছে। এভাবেই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ধর্মহীন রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসে।

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রি.)
(ইউরোপে ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন)

'ইংল্যান্ড বিপ্লব' ও 'আমেরিকার বিপ্লব' এরপর 'ফরাসি বিপ্লব' ছিল রেনেসাঁর যুগের সর্বশেষ ঘটনা। যার পর পশ্চিমা বিশ্বে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে পশ্চিমারা নতুন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ফরাসি বিপ্লব ছিল ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের শুরু। ১৭৮৯ সালের ৪ জুলাই ফরাসি বিপ্লবকে ধর্মীয় এবং বাদশাহি শাসনের ভাগ্যে সর্বশেষ পেরেক হিসেবে গণ্য করা হয়। যার ফলে পোপতন্ত্র ও বাদশাহির জায়গায় ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক সংবিধান ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিপ্লবের কারণ ছিল বিশেষ শ্রেণির পক্ষ থেকে জনগণের ওপর জুলুম; কিন্তু মৌলিকভাবে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর যুগের পুরো ইতিহাসের সাথে এর সম্পর্ক ছিল।

তখন ফ্রান্সের বাদশাহ লুই ১৮তম এর হুকুমত চলছিল। ১৭৮৮ সালে ফ্রান্সে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষরা এই দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারা ক্ষতিপূরণ ও ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়ার জন্য বাদশাহর কাছে দাবি জানায়; কিন্তু বাদশাহ তাদের দাবিতে কোনো ভ্রুক্ষেপ তো করেইনি, উলটো বাদশাহ ও তার সঙ্গীরা আরও বিলাসী জীবনযাপন করতে থাকে। ফ্রান্স ছিল সেই সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ঘাঁটি। এই আন্দোলনের

চিন্তাধারা ও দর্শন এবং রুশো ও ভলতেয়ারের লেখাগুলো তাদের মধ্যে আগে থেকেই অগ্নি প্রজ্বলিত করে রেখেছিল। ফলে জনগণ বাদশাহদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। বাস্তিল নামক দুর্গ, যা একটি জেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তা দখল করে বন্দীদের মুক্ত করে নেয়। এরপর ধারাবাহিক বিদ্রোহ চলতে থাকে। ১৭৮৯ সালের ৪ জুলাই এই আন্দোলনগুলো মানবাধিকারের নামে একটি ঘোষণা জারি করে। এই ঘোষণার মধ্যে মানুষকে স্বাধীন ও আইনকে মানুষের স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়। জনগণের 'সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব'কে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই বিপ্লবের ফলে শুধু ইউরোপে নয়; বরং পুরো দুনিয়াতে চিন্তাগত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর বিশ্বের অধিকাংশ এলাকাতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সামরিক দখল এই বিপ্লবকে বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে ইউরোপের পরিবর্তনগুলোর প্রভাব নতুন উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোতেও প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। তবে তার পাশাপাশি ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সমাজে তিনটি শূন্যতা তৈরি হয়।

ফরাসি বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা

ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সমাজে তিনটি শূন্যতা তৈরি হয় :

- এক. গির্জার নির্দেশনা ও ঐশী বিধান বিলুপ্তের ফলে বিধানদাতার দৃষ্টিভঙ্গিতে শূন্যতা।
- দুই. বাদশাহি বিলুপ্তের ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শূন্যতা।
- তিন. দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার ফলে নৈতিক মানদণ্ডের ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতা।

এই তিনটি শূন্যতাকে পূরণের জন্য সেক্যুলারিজম সামনে এগিয়ে আসে এবং পূর্বের চারশ বছরের শ্রমের ফল দ্বারা দুনিয়াকে নতুনভাবে শৃঙ্খলিত করে। বিধান প্রদান ও প্রণয়নের জন্য হিউম্যানিজমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। নৈতিকতা নির্ধারণের জন্য মানুষের বুদ্ধিকেই মূল মাপকাঠি বানায় এবং সমাজ পরিচালনার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মানুষের সাথে পরিচিত করায়। এই ছিল সেই মাইলস্টোন, যেখানে ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ইতিহাস শেষ হয় এবং যা এই আধুনিক বিশ্বকে বোঝার সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সময়।

পশ্চিমাদের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা

যেভাবে আমরা পূর্বের অধ্যায়ের শেষে ইহুদিদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পেশ করেছিলাম, এখানেও আমরা পশ্চিমাদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরব। পশ্চিমাদের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হবে, পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা বা ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার কীভাবে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে পরিবর্তন হয়।

খ্রিষ্টবাদের স্বরূপ

খ্রিষ্টবাদ মূলত আপসপূর্ণ দরবারি এক ধর্ম ছিল। প্রথমে তারা ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ করে নেয়। যার ফলে তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে, ইসা ﷺ প্রভুর সন্তান, যিনি মানুষের গুনাহের কাফফারা আদায়ের জন্য নিজেই নিজেকে ক্রুশে চড়িয়েছিলেন। এখন মানুষের মুক্তির মাধ্যম হলো, তারা এই ঘটনার ওপর ইমান আনবে এবং নিজেকে আল্লাহ তাআলার জান্নাতের উপযুক্ত মনে করবে। মানুষকে গুনাহ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তারা মিশনারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াতে খ্রিষ্টবাদের দাওয়াত শুরু করে। আফ্রিকা ও আমেরিকাসহ কয়েকটি মহাদেশে তারা এই বিশ্বাস সেখানের বাসিন্দাদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। তাদের দাবি অনুযায়ী যখন পরিবেশ প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন ইসা ﷺ পুনরায় দুনিয়াতে এসে সমস্ত বেইমানকে খতম করবেন। আর তখন দুনিয়াতে রবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

খ্রিষ্টবাদ প্রটেস্টান্টিজমে রূপান্তর

ইহুদিদের চক্রান্তে খ্রিষ্টবাদ আরও একবার নিজের বিশ্বাস পরিবর্তন করে। নতুন খ্রিষ্টানদের প্রটেস্টান্ট বলা হয়। এদের সদস্যরা পশ্চিমে পরিবর্তনের নতুন রাস্তা করে দেয়। তারা একদিকে খ্রিষ্টান ইউরোপে সেক্যুলার ধর্মহীনতার দরজা খুলে দেয় এবং অপরদিকে ইহুদিদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে তাদের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সাহায্য করতে থাকে। তারা খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই বিশ্বাস ব্যাপক করে দেয় যে, ইহুদিদের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের পরেই ইসা ﷺ আগমন করবেন। কেমন যেন এই আধুনিক খ্রিষ্টানরা ইহুদি ও খ্রিষ্টান দুই ধর্মের বিশ্বাসকে একীভূত করে ফেলে।

পশ্চিমাদের মধ্যে সেক্যুলারিজমের উত্থান ও তার কারণসমূহ

পশ্চিমে সেক্যুলারিজমের উত্থানের কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. মানবাধিকার আন্দোলন

মানবাধিকার আজকের সমাজে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং মুখরোচক স্লোগান। মানবাধিকার আন্দোলনের শুরু মেঘনা কার্টা থেকে হয়েছে। কিন্তু পাঁচশ বছরের ইতিহাসে এই আন্দোলন বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কখনো এই যুদ্ধ ছিল শুধু গির্জার বিরুদ্ধে, আবার কখনো ছিল বাদশাহর বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ কখনো ইউরোপের জনগণের পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত হতো, আবার কখনো হতো ইহুদিদের স্বাধীনতার জন্য। এই আন্দোলনের ফলে পুরো বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনকেই মুসলিম ও উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে খুব কঠিনভাবে ব্যবহার করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার আন্দোলন আধুনিক পশ্চিমাদের খুব প্রভাবশালী মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়।

২. ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে জন্ম নেওয়া, গিল্ড সমাজে শুরু হওয়া ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের চিন্তাগুলো সেক্যুলারিজমের পক্ষে অনেক উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ফরাসি বিপ্লবে বিজ্ঞান খ্রিষ্টান ধর্মকে পরাজিত করে ফেলে। অতঃপর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশ বিজ্ঞানকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গাদ্দার তৈরিতে ব্যবহার করতে থাকে। স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, যে যুদ্ধ খ্রিষ্টান ও বিজ্ঞানের মধ্যে হয়েছিল, তার সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

৩. খ্রিষ্টান ধর্মের শরয়ি উৎসে পরিবর্তন

ঠিক এই সময়টাতেই রিফরমেশন আন্দোলনের উত্থান হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য বাহ্যিকভাবে গির্জার সংশোধন হলেও তার ফলে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎস পরিবর্তন হয়ে যায়। কিতাবুল মুকাদ্দাসের ব্যাখ্যার অধিকার পাদরিদের সাথে সাথে এখন জনগণের বিবেকের কাছেও অর্পণ করা হয়। এই আন্দোলনই খ্রিষ্টানদের মাঝে নতুন বিভাজন তৈরি করে এবং এনলাইটেনমেন্ট যুগের একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়।

৪. আধুনিক অর্থব্যবস্থার উত্থান

এমনিভাবে মহামারি থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতির ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈশ্বিক কোম্পানি, কারেন্সি ও ব্যাংকের উত্থান হয়। যা পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অতঃপর যখন ধর্মহীনতা ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে, তখন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মানুষ জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এবং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই পরিচালনার জন্য গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক সংবিধান বানিয়ে পেশ করা হয়।

খ্রিষ্টান-ইহুদি জোট

ইহুদিরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য খ্রিষ্টান-দুনিয়াতে এমন কিছু আন্দোলন ঘটায়, যার দ্বারা খ্রিষ্টান ধর্মে নতুন গ্রুপ তৈরির পাশাপাশি পুরাতন গ্রুপগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। পুরাতন ও নতুন গ্রুপগুলো বিভিন্নভাবে ইহুদিদের রক্ষা করতে থাকে। এখানে আমরা সেই গ্রুপগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি, যার ইতিহাস আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

প্রটেস্টান্ট 'জায়োনবাদী' খ্রিষ্টান

ইহুদিরা প্রথমে এই পদক্ষেপ নিয়েছিল যে, তাদের দুশমনদেরই কিছু লোককে নিজেদের লক্ষ্যের পথে সাহায্যকারী বানিয়ে নেবে। এই লক্ষ্যে গির্জার পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলনকারী মার্টিন লুথারের প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের সাথে ইহুদিদের খুব গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়, যা আজও টিকে রয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা দুই অংশে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটি ছিল মৌলবাদী পুরাতন খ্রিষ্টান ও আরেকটি ছিল সংস্কারপন্থী মডারেট খ্রিষ্টান। দ্বিতীয় দলের একটি বিশেষ বিশ্বাস ছিল, পুরাতন আসমানি কিতাব এবং শরিয়াহগুলোও গ্রহণ করে নিতে হবে। এই চিন্তা প্রটেস্টান্ট দলকে ব্যাপকভাবে ইহুদিদের নিকটবর্তী করে দেয়। এমনকি প্রটেস্টান্ট গ্রুপের অনেকেই বিশ্বাস করে, ফিলিস্তিন ভূমিকে জবরদস্তির মাধ্যমে দখল করার পূর্ণ অধিকার ইহুদিদের রয়েছে। যখন ক্যাথলিক চার্চ এই দলের বিরোধিতা করে, তখন এই দলের অনেক গ্রুপ গির্জার জুলুমের শিকার হয়ে আমেরিকা চলে যেতে থাকে। যা তাদের স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত হয়। আস্তে আস্তে ইহুদিদের সাথে এই দলটির নৈকট্য এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তাদের বিরোধীরা তাদেরকে 'ইহুদিবাদী খ্রিষ্টান' বলা শুরু করে।

ধর্মহীন খ্রিষ্টান

মর্ডানিস্ট খ্রিষ্টানরা কিতাবুল মুকাদ্দাসের ব্যাখ্যার অধিকার সাধারণ-বিশেষ নির্বিশেষে সকল জনগণকে প্রদান করে খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মহীন শ্রেণি সৃষ্টি করে। যারা দ্বীনের বিধানগুলোর সমালোচনা করত এবং সেগুলোকে নিয়ে বিদ্রুপ করত। যার ফলে পুরাতন ধারার খ্রিষ্টানদের বিশেষ অংশ আলাদা হয়ে যায় এবং অন্যদের বিদ্রুপ ও হাস্যরসের পাত্র হয়ে যায়। কারণ তারা ধর্মহীনতার স্রোতের মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর অনেক মানুষ এমন ছিল, যাদের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এ সত্ত্বেও তারা নিজেদের খ্রিষ্টান মনে করত। এই শ্রেণি পরবর্তী শতাব্দীতে ইউরোপের পার্লামেন্টে ইহুদিদের জন্য মানবাধিকারের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে এবং তাদেরকে সমান নাগরিক অধিকার দিয়ে দেয়। এভাবেই দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ রোমান গির্জার কাছে আবদ্ধ ইহুদিরা মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজেদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার পথে আর বড় কোনো বাধা তাদের জন্য ছিল না।

রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান

যদিও এদেরকে ইহুদিদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করা হতো; কিন্তু এদের ও সাধারণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে দূরত্ব এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ইহুদিদের শক্তি অর্জিত হওয়ার পর তারাও নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অবস্থা শুধু পরিবর্তনই হয়নি; বরং সম্পূর্ণভাবে উলটে যায়। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রোমের পোপ জন দ্বিতীয় রেখেছিল। সে ইহুদি-বংশের প্রতি ঘৃণাকে প্রভুর সাথে ঘৃণার সমপর্যায়ের সাব্যস্ত করে এবং ইহুদিদের ধর্মীয় বড় ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৩ সালে সে রোমের গির্জাকে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে। পরবর্তী সময়ে সে নিজেই ইসরাইল গিয়ে পবিত্র দেয়ালের নিচে ইহুদিদের জন্য দুআ করে এবং লিখিত একটি মাগফিরাতনামা দেয়ালের চিড়ের মধ্যে রেখে আসে। এই দেয়াল মাসজিদুল আকসার পশ্চিম দিকে রয়েছে। যেখানে ইহুদিরা এসে ইবাদত ও তাওরাত তিলাওয়াত করে। তাদের ধারণামতে এই দেয়াল হাইকালে সুলাইমানির ধ্বংসাবশেষ, যেখানে আবার তা তৈরি করা হবে। এভাবেই ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের মধ্যে নিজেদের সমর্থক পেয়ে যায় এবং কম-বেশি সকল খ্রিষ্টানকে এই কথা বোঝাতে সফল হয় যে, এখন ফিলিস্তিনের ওপর ক্ষমতার অধিকার শুধু ইহুদিদের। এমনকি খ্রিষ্টানরাও ইহুদিদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে শামিল হয়ে যায়। এখানে এই কথা জেনে রাখা উচিত যে, ইহুদিরা যেভাবে খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে নিজেদের এজেন্ট বানিয়ে নিয়েছিল, তেমন চক্রান্ত তারা আজ নতুনভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে করছে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট তিনটি শূন্যতা এবং হিউম্যানের জেনারেল উইল (আধুনিক শিরক)

পশ্চিমাদের ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে এই কথা বুঝে আসে যে, এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন পুরো ইউরোপে এই বিষয়টি প্রচার করে যে, 'মানুষ আল্লাহ তাআলার বান্দা নয়; বরং নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী জীবনযাপনকারী হিউম্যান। তাকে ধর্মের অন্ধকার চিন্তাধারা থেকে বের করে নতুন আলোকিত চিন্তা গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।' এনলাইটেনমেন্টের দর্শন মানুষকে এই কথা বোঝায় যে, তাকে নিরাপদ ও সুখী থাকা চাই। এই নিরাপত্তা ও সুখের জন্য তাকে বস্তুগত উন্নতি অর্জন করতে হবে। বস্তুগত এই উন্নতির পথে ধর্মের হালাল-হারামের বাধা বিলুপ্ত করা জরুরি। এ ছাড়া বাদশাহরাও এই পথে বড় একটি বাধা; তাই তাদের থেকেও স্বাধীনতা চাই। এই স্বাধীনতা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাম্যের ভিত্তিতে হবে। এই এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাধারার প্রভাবে পশ্চিমাদের মধ্যে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ফরাসি বিপ্লবের অধীনে আমরা আলোচনা করেছি যে, এটি সমাজের মধ্যে তিনটি শূন্যতা তৈরি করে। প্রথমত, গির্জার দাবি ছিল, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। তারা ইউরোপের বাদশাহদের খ্রিষ্টবাদ গ্রহণের পর তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ছায়া হিসেবে ঘোষণা দিত। এখন গির্জার হুকুমত বিলুপ্তির পর হঠাৎ সার্বভৌমত্বের স্থান খালি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, অতীতকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত বাদশাহি ব্যবস্থা বিলুপ্তির ফলে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়। তৃতীয়ত, সমাজে দ্বীনহীনতার ফলে মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে শূন্যতা তৈরি হয়। এই শূন্যতাগুলো পূরণের জন্য ধর্মহীনতার ধর্ম, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় খণ্ড

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপে বাহ্যিকভাবে অনেক পরিবর্তন আসে। কিন্তু কোনো সাধারণ বুদ্ধির ব্যক্তিও ইউরোপের অবস্থাদৃষ্টে আন্দাজ করতে পারবে যে, 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' মূলত মানুষের বানানো একটি ধর্ম থেকে মানুষেরই বানানো আরেকটি ধর্মের দিকে গমন করা, অর্থাৎ 'খ্রিষ্টবাদ' থেকে 'হিউম্যানিজম' (সেক্যুলারিজম)-এর দিকে যাওয়া। খ্রিষ্টবাদ ছিল সেন্ট পৌলের বানানো ধর্ম, যেখানে শাসনব্যবস্থা 'সেন্ট অগাস্টিন'-এর থিউরি 'আল্লাহর হুকুমত ও মানুষের হুকুমত' অনুযায়ী এক হাজার বছর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন ইউরোপের রাজনীতি ও ধর্মের ধারকবাহক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ও বাদশাহদের জায়গায় প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান, ইহুদি ও ধর্মহীন খ্রিষ্টানরা বিজয়ী হয়ে গিয়েছে। ১৭৮৮ সালে ইংল্যান্ড সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রটেস্টান্ট হয়। ১৭৭২ সালে আমেরিকান বিপ্লবের পর আমেরিকাতে প্রটেস্টান্ট, ইহুদি ও ধর্মহীন খ্রিষ্টানরা ক্ষমতায় চলে আসে। ফরাসি বিপ্লবের পর অন্যান্য প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোও ক্যাথলিক গির্জা ও বাদশাহদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। প্রটেস্টান্টরা না বাদশাহকে প্রদত্ত খোদায়ি বিশ্বাসকে মানত আর না বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থাকে অস্বীকার করত। প্রটেস্টান্ট আদর্শ ইহুদি, ধর্মহীনতা ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল। এই সেতু 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'[৩৭] গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে যেমনটা আলোচনা করেছি, সমস্ত কাজে উদ্দেশ্যের দিক থেকে দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। প্রথমত, যারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিজ কাজের প্রতিদানের আশা করে। দ্বিতীয়ত, যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা ব্যতীত আমল করে। প্রটেস্টান্ট গ্রুপ এই দুই দলকেই এক পথে পরিচালিত করেছিল। যারা আল্লাহ তাআলার প্রতিদানের আশা করে কাজ করত না, তারা ছিল ধর্মহীন ও মুশরিক। যাদের জন্য ধর্মহীনতা বা শিরকি আদর্শ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না, কারণ তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বস্তুগত উন্নতি। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলা থেকে প্রতিদানের আশায় আমল করত, যেমন : দৃঢ় বিশ্বাসের খ্রিষ্টানরা। প্রটেস্টান্টরা তাদের রাস্তাকেও পরিষ্কার করে দেয়। ফলে বস্তুবাদী জীবনদর্শন তখন শুধু মূল ধর্মের অংশই নয়; বরং দুনিয়াতে উন্নতি করে

---

৩৭. বর্তমানে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার পরিভাষাটির আলোচনা অনেক ব্যাপক হয়ে গেছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন আঙ্গিকে এটা নিয়ে কথা বলছেন। এর সূচনা ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই হয়েছে। এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রথমে পশ্চিমাদেরকে নিজের আয়ত্তে নিয়েছে, অতঃপর উসমানিদের পতনের পর পুরো দুনিয়ার ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে এবং এটাই আজ আমাদের মাথার ওপর গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রূপে চেপে বসেছে। এই বিষয়টা স্পষ্ট করা এই জন্য জরুরি, কারণ আজ কিছু ব্যক্তি, যারা (বাস্তবতা থেকে বেড়ে) গোপন চক্রান্তকে বিশ্বাস করেন, তারা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পরিভাষা ব্যবহার তো করেন; কিন্তু এটাকে ভবিষ্যতে ঘটা পরিবর্তন মনে করেন এবং সেই পরিবর্তনটা কী হবে—সেটাও স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। এগুলো নিছকই চিন্তাবিভ্রাট। বাস্তবতা হচ্ছে পশ্চিমারা দুনিয়ার মধ্যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে বাস্তবায়ন করে ফেলেছে, যার কার্যক্রম ফরাসি বিপ্লব থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা আমরা প্রথম অংশে করে এসেছি।

বস্তুগত সাফল্য অর্জনই জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। দুনিয়ার সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিদর্শন হয়ে যায়।

মুসলিম উম্মাহর জন্য কোনো কিছু পরিবর্তন হয়নি। শুধু এক শত্রুর স্থানে অপর শত্রু এসেছে। এসবই ছিল পুরাতন শিকারি; খ্রিষ্টান, ইহুদি ও ধর্মহীন মুশরিক। কিন্তু এখন তারা নতুন জাল নিয়ে সামনে এসেছে। এই নতুন জালকে 'হিউম্যানিজম' বলা যায় আবার 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড বা স্বাধীন বিশ্ব'ও বলা যায়। গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও এই জালের অন্তর্ভুক্ত। এই ফাঁদকে ভালোভাবে প্রয়োগের জন্য নতুন পরিভাষাও ব্যবহার করা হয়। শিরককে 'হিউম্যানিজম' বা 'মানবতার ধর্ম' বলা হয়। সুদকে 'ব্যবসা' নাম দেওয়া হয়। হারাম-হালালকে 'স্বাধীনতা বা মুনাফা অর্জনের জন্য সবকিছু বৈধ' এই নীতিতে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। অশ্লীলতা ও উলঙ্গতাকে 'আর্ট বা শিল্প' ঘোষণা দেওয়া হয়। 'গণতন্ত্র'কে 'খিলাফত'-এর সমার্থক বানানো হয়। বস্তুপূজা ও নিজের চাহিদামতো চলাকে 'উন্নতি ও সফলতা' মনে করা হয়।

মোটকথা এই সিস্টেম ছিল সেই পুরাতন শিরক, সেই পুরাতন সুদি ব্যবস্থা, সেই পুরাতন অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা, সেই পুরাতন বস্তুপূজা এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও মনের চাহিদার আনুগত্য করা। যা অনেক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপের জনগণকে মূর্খতার অন্ধকার ও আল্লাহ তাআলার বিদ্রোহে লিপ্ত রেখেছিল। পূর্বে যা ক্যাথলিক গির্জা ও পোপদের বানানো নীতিতে সংঘটিত হতো, এখন তা হিউম্যানিজমের বানানো ধর্ম অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সিস্টেমের মধ্যে সেই খ্রিষ্টান, ইহুদি, ধর্মহীন ও মুশরিকরাই ছিল, যারা বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইহুদি, খ্রিষ্টান, ধর্মহীন ও মুশরিকরা পূর্ব থেকেই গোমরাহ ছিল এবং এই ব্যবস্থা আসার পরে তারা গোমরাহই রয়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য, যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়া ও আল্লাহ তাআলার কিতাব সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সেই বিকৃত ও বাতিল মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সফলতা মূলত মুসলিম উম্মাহর পতনের কাহিনি। যেখানেই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বিজয়ী হয়েছিল, সেখানেই মুসলিম উম্মাহর পতন হয়েছিল। এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এক-দুই দিনের মধ্যে বিজয়ী হয়নি; বরং এই পর্যন্ত পৌঁছাতে অনেক শতাব্দী অতিবাহিত করতে হয়েছে। এই কিতাবের দ্বিতীয় অংশে আমরা এই বিষয়গুলোই আলোচনা করব। দেখব, এরা কীভাবে বিজয়ী হয়েছিল এবং মুসলিম উম্মাহর কীভাবে পতন হয়েছিল?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গঠন

ফরাসি বিপ্লবের পর যখন ইলাহি হুকুমত ও মানুষের হুকুমতের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন ইউরোপের জনসমাজে কয়েকটি শূন্যতা তৈরি হয় :

- যদি মানুষের হুকুমতে আল্লাহ তাআলা বিধানদাতা না হন, তাহলে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে কে?
- যদি বাদশাহ ইলাহি বিধান মুতাবিক মানুষের ওপর হুকুমত না করে, তাহলে এখন কার বিধান চলবে?
- আল্লাহ তাআলার হুকুমতের মধ্যে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন, জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে বাঁচা। এখন যেহেতু আল্লাহ তাআলার হুকুমত নেই, তাহলে মানুষের জীবনের লক্ষ্য কী হবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গঠন এবং এর চিন্তাগত ভিত্তি। আজকের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন থেকে সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ ও আলাদা ধর্ম। এখানে বিধান প্রণয়ন ও বাদশাহদের ক্ষমতার শূন্যতা পূরণের জন্য গণতন্ত্রের থিউরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অপরদিকে মানুষের জীবনের লক্ষ্য বা মাকসাদের শূন্যতা পূরণের জন্য পুঁজিবাদের থিউরি পেশ করা হয়; যেখানে মানুষ তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা ছেড়ে শুধুই বস্তুগত উন্নতি করতে থাকবে। তৃতীয় দিকে এই ব্যবস্থায় বাদশাহি সেনাদের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নতুনভাবে 'দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী বাহিনী' হিসেবে গঠন করা হয়। এই সমস্ত থিউরি ও সিস্টেমের বাস্তবায়ন ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের পর এক-দুই দিনে হয়ে যায়নি। বরং এই পর্যন্ত পৌঁছার জন্য কয়েক যুগ পার হতে হয়েছে এবং কয়েকটি বিপ্লব ঘটেছে। তাই আমরা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে কয়েকটি অংশে ভাগ করব :

- প্রথম যুগ : ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত
- দ্বিতীয় যুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত
- তৃতীয় যুগ : রাশিয়া ও আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার
- চতুর্থ যুগ : প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে বর্তমান পর্যন্ত
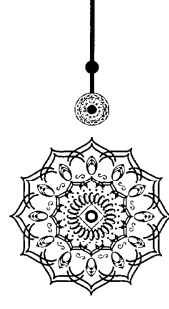
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম যুগ

ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৭৮৯-১৯২৪ খ্রি.)

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম যুগকে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা 'স্বাধীন দুনিয়ার বাদশাহদের সাথে যুদ্ধ'-এর যুগ হিসেবে গণ্য করে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই যুগকে মুসলিম উম্মাহর পতনের শুরু হিসেবে গণ্য করেন। একদিকে ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপের সমস্ত বাদশাহ নিজ নিজ সাম্রাজ্য নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি ও রাশিয়াও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়াকে বাধা প্রদান ও ফ্রান্সের বাদশাহকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেয়। অপরদিকে ভৌগলিকভাবে আমেরিকা আবিষ্কার ও হিন্দুস্থানের ওপর ইংরেজদের দখলের ফলে ইউরোপে কাঁচামাল আমদানি অনেক বেড়ে যায়। এই কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপ ও বিশেষত ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়। যার আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। এই শিল্প-বিপ্লব ইউরোপীয়দের মধ্যে নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যার ফলে প্রত্যেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র মুসলিম উম্মাহর সম্পদ লুণ্ঠনের পাশাপাশি সেই সব অঞ্চল থেকে একে অপরকে বঞ্চিত করার জন্য নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

অপরদিকে উসমানি সাম্রাজ্যে নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশিত হতে থাকে। ইউরোপ ও রাশিয়া তাদের দুর্বলতা অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা সর্বদা উসমানিদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোর ওপর লোভের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। রাশিয়ার দৃষ্টি ছিল মধ্য এশিয়া, ককেশাস ও বলকানের দিকে। অন্যদিকে ব্রিটেন সরকার রোম উপসাগর ও লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানের রাস্তা দখলের পরিকল্পনা তৈরি করছিল। ফ্রান্সের দৃষ্টি ছিল আল-জাজায়ির ও তিউনিসিয়াসহ উসমানিদের পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার দিকে। এই রাষ্ট্রগুলো নিষ্ক্রিয় ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে তারা উসমানিদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বোনা শুরু করে। প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রগুলো একেক করে মুসলিম অঞ্চলগুলো দখল করতে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের পতন হয়ে মুসলিম উম্মাহর ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এই চক্রান্ত ও যুদ্ধগুলোকে পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ 'গ্রেট গেইম' নাম দিয়ে থাকে। ব্রিটেন তাদের চক্রান্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন করে এবং হিন্দুস্থান দখল করে নেয়। হিন্দুস্থান দখলের মাধ্যমে তাদের সেই সরঞ্জাম, সম্পদ ও জনবল অর্জিত হয়ে যায়, যা দিয়ে তারা উসমানিদের পরাজিত করে ব্রিটেনকে সুপার পাওয়ার বানাতে সক্ষম ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে যদি ইহুদিদের উত্থানের শতাব্দী বলা হয়, তাহলে ভুল হবে না। কারণ ফরাসি বিপ্লবের পর যে রাষ্ট্রেই পার্লামেন্ট-ভিত্তিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেখানেই ইহুদিদেরকে ইউরোপীয় নাগরিকদের মতো সমান অধিকার দেওয়া হতো। সমান অধিকার প্রাপ্তির সাথে সাথেই ইহুদিরা তাদের জায়োনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলে, যা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিল। ১৯১৭ সালে ব্রিটেনের প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিন বিজয় করে দেয়। এই শতাব্দীতে ইহুদিরা ইউরোপে ব্যাংকের মুকুটহীন বাদশায় পরিণত হয় এবং তারা ইউরোপের অর্থনীতিকে পরিপূর্ণভাবে দখল করে নেয়।

সারকথা হলো, ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপে নতুন যুগ শুরু হয়। এই যুগকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার যুগ বলার সাথে সাথে ইহুদিদের উত্থান ও মুসলিমদের পতনের যুগ বলা হয়। কেননা, এই সব একই যুগে হয়েছিল। এখানে আমরা ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ১৩০ বছরের ইতিহাসকে দুটি অংশে বর্ণনা করব। প্রথম অংশে বিপ্লবের ফলে ইউরোপে সংঘটিত পরিবর্তনগুলো বোঝার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় অংশে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের প্রভাবে ঘটা আন্তর্জাতিক পরিবর্তন অর্থাৎ গ্রেট গেইমের আলোচনা করব।

ইউরোপে বিপ্লবের যুগ (১৭৮৯-১৮৭৫ খ্রি.)

১৭৮৯ সালে একদিকে ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপে বিশাল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। অপরদিকে ১৭৬৪ সালে হিন্দুস্থানে বক্সার[৩৮] যুদ্ধে ব্রিটেন বাংলাকে দখল করতে সক্ষম হয়ে যায়। এই দুটি ঘটনার ফলে ইউরোপে তিন ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়। এক. রাজনৈতিক বিপ্লব, দুই. অর্থনৈতিক বিপ্লব, যাকে পুঁজিবাদী বিপ্লব বলা যায় এবং তিন. সামরিক বিপ্লব। এই বিপ্লবগুলো সর্বপ্রথম ইউরোপে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর ইসলামি বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলের ওপর তাদের দখল ছিল, সেই সমস্ত অঞ্চলেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপে রাজনৈতিক বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের ফলে স্বয়ং ফ্রান্স অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। বিপ্লবীরা চাচ্ছিল ফ্রান্সে মানব-আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে বাদশাহ চাচ্ছিল নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে। বিপ্লবের শক্তি দেখে প্রথমে ফ্রান্সের বাদশাহ লুই পার্লামেন্টের অধীনে নিজের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে ইউরোপের অন্যান্য বাদশাহর সাথে মিলে নিজের হারানো ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তার স্ত্রী ছিল অস্ট্রিয়ার বাদশাহ ফ্রেডরিকের বোন; তাই সেও তার ভগ্নিপতির সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল। এ ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য বাদশাহ এই বিপ্লবকে ভালো দৃষ্টিতে দেখছিল না। এই বিপ্লবের প্রভাবে তাদের রাষ্ট্রগুলোও ঝুঁকির মুখে ছিল। তাই এই বিপ্লবকে দমন করা তাদের দৃষ্টিতে আবশ্যক ছিল। এত কিছু সত্ত্বেও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে পুরো ইউরোপে ছড়াতে থাকে। ইউরোপের জনগণ আধুনিক ধর্মহীন দর্শনকে গ্রহণ করতে থাকে। ফলে হল্যান্ড, জার্মানি, বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়াতে মানবাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। এই বিপজ্জনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অস্ট্রিয়া ও জার্মানি ফ্রান্সের বিপ্লবীদের ওপর হামলা করে বসে। এই যুদ্ধ 'ফ্রেঞ্চ রেভুলেশনারি ওয়ার' (French Revolutionary Wars) নামে প্রসিদ্ধ এবং এই যুদ্ধেই ফ্রান্সের জেনারেল নেপোলিয়নের প্রসিদ্ধি অর্জিত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স বিজয়ী হয় এবং নেপোলিয়নের নেতৃত্বে তারা প্রায় পুরো ইউরোপ কব্জা করে নেয়। নেপোলিয়নের বিজয়ের ফলে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শগুলো ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়ে।

তখন ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ইংল্যান্ড। নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে পরাজিত করার জন্য ১৭৯৮ সালে মিশরে হামলা করে বসে। মিশর সেই সময় উসমানিদের অধীন ছিল। মিশরের ওপর ফ্রান্সের কব্জার ফলে হিন্দুস্থানে ব্রিটেনের দখলদারিত্ব হুমকির মুখে পড়ে

৩৮. ১৭৬৪ সালে নওয়াব মীর কাসেম ও তার মিত্রশক্তির সাথে ইংরেজদের লড়াইকে বক্সার যুদ্ধ বলে।

যায়। এই বিষয়টি ব্রিটেনের জন্য মোটেও মেনে নেওয়ার মতো ছিল না। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের সামুদ্রিক এডমিরাল নেলসন (Admiral Horatio Nelson) এর হাতে ফ্রান্সের সামুদ্রিক বহর পরাজিত হয়। বাধ্য হয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসে।

মিশর থেকে ফিরে আসার পর নেপোলিয়ন ব্রিটেনকে অর্থনৈতিক অবরোধ দেওয়া শুরু করে এবং ব্রিটেনের উৎপাদিত পণ্য ইউরোপে আসাকে বন্ধ করে দেয়। এই অর্থনৈতিক অবরোধকে মহাদেশীয় ব্যবস্থা (Continental System) বলা হয়। এই অবরোধে পর্তুগাল ফ্রান্সের সাথে থাকতে অস্বীকার করে। এই অবরোধ মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটেন জেনারেল (Lord Wellington) লর্ড ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে স্পেনে বাহিনী পাঠায়। যেখানে নেপোলিয়ন ও ব্রিটেনের মাঝে সামনাসামনি যুদ্ধ হয়। রাশিয়া প্রথমে ফ্রান্সের সাথে ছিল; কিন্তু পরে রাশিয়া জোট থেকে বের হয়ে যায়। যার কারণে নেপোলিয়ন ক্রুদ্ধ হয়ে রাশিয়ার ওপর হামলা করে বসে, যা নেপোলিয়নের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ নেপোলিয়নের ৪৫ হাজার সেনাকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। অপরদিকে ব্রিটেনের কমান্ডার ওয়েলিংটন ও নেপোলিয়নের মধ্যে ধারাবাহিক এক যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮১৫ সালে ১৮ জুন 'ওয়াটার লু' (Waterloo) স্থানে ওয়েলিংটন নেপোলিয়নের বাহিনীকে পরাজিত করে এবং নেপোলিয়নকে গ্রেফতার করে সেন্ট হেলেনা (Island of Saint Helena) দ্বীপে নির্বাসিত করে। ওই দ্বীপেই সে ১৮২১ সালে মারা যায়।

১৮৩০ সালে বেলজিয়ামে বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবের ফলে বেলজিয়াম হল্যান্ড থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়াতে পার্লামেন্ট-ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ সালে মধ্য ইউরোপে আরও একটি বিপ্লব হয়, যা আজকের নতুন ইউরোপের গঠনকে পূর্ণ করে। এটাই সেই রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগ ছিল, যা ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল।

ইউরোপের গণতান্ত্রিক আইনি ব্যবস্থা

ফরাসি বিপ্লবের পর পোপতন্ত্র ও বাদশাহি বিলুপ্তির ফলে সর্বোচ্চ বিধানদাতা ও আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে রাষ্ট্র-শাসনে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। এই শূন্যতাকে পূরণের জন্য এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, যা হিউম্যানকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেবে। হিউম্যানকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি, স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা।[৩৯] অপরদিকে মধ্যযুগের রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংঘটিত '৩০ বছরের যুদ্ধ' এবং এর ফলে হওয়া 'ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি' এর

৩৯. এই শব্দগুলোকে আমাদের পরিভাষা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ প্রতিটি শব্দের পেছনেই পশ্চিমাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যার সাথে ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ বিদ্যমান। বিস্তারিত জানতে হিউম্যান বিয়িং বইটি পড়া যেতে পারে।

মাধ্যমে ইউরোপের জাতিগুলো নিজেদের জন্য আলাদা দেশ ভাগ করে নেয় এবং জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরে। এই চুক্তির ফলে পুরো ইউরোপের মধ্যে দেশাত্ববোধ[৪০] একটি বিশ্বাসে রূপ নেয়। ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তির ফলে ইউরোপে 'আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র' (Nation States)-এর দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়। সেসব রাষ্ট্রের গঠনের মধ্যে চারটি উপাদান থাকা মৌলিকভাবে আবশ্যক ছিল :

১. এমন ভূমি, যেখানে এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. এমন জনগণ, যারা এই রাষ্ট্রকে গ্রহণ করে নেবে।

৩. এমন প্রশাসন, যারা রাষ্ট্রকে চালাবে।

৪. সর্বোচ্চ বিধানদাতার বিশ্বাস, যা রাষ্ট্রকে সেই অঞ্চল ও তার বাসিন্দাদের ওপর ক্ষমতা প্রদান করবে।

ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি ইউরোপে উল্লেখিত শর্তগুলোর মধ্য থেকে ভৌগলিক সীমানা ও জনগণ তথা ১ ও ২ নং শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন ও বিধানদাতার প্রশ্ন বাকি রয়ে গিয়েছিল, যার উত্তর নির্ধারণ সহজ ছিল না। বিশেষ করে যেখানে বিধানদাতা হিসেবে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত পোপতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করা হতো। ফলে এর সমাধানে এমন জটিল এক দর্শন গ্রহণ করা হয়েছিল, যাকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা প্রায় শুরুদিন থেকেই অসম্ভব ছিল। এই দর্শনগুলো অনেক চেষ্টার পর কিছুটা বুঝে আসলেও পূর্ণ বুঝে আসে না। তাই আমরা এই ব্যবস্থাকে ধোঁকা ও মিথ্যাচার গণ্য করি এবং এই দর্শন আমাদের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ।

যাহোক, ইউরোপের শাসন-ক্ষমতার জন্য এমন থিউরি দরকার ছিল, যা ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের আদর্শ 'আল্লাহ তাআলার হুকুমত'-এর সমপর্যায়ের হবে এবং হিউম্যানের সেসব মৌলিক স্বার্থগুলো বাস্তবায়ন করবে, যা এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দার্শনিকরা 'মানবাধিকারের পবিত্র নীতি' হিসেবে প্রচার করেছিল। অর্থাৎ নিরাপত্তা, সুখ, উন্নতি, সমতা ও স্বাধীনতা। তাদের এই প্রয়োজন অর্থাৎ 'শাসনের থিউরি'র শূন্যতা এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দার্শনিক জন লক ও রুশো পূর্বেই সমাধান করে রেখেছিল। জন লকের তুলনায় ফরাসি বিপ্লবে রুশোর বর্ণিত গণতান্ত্রিক দর্শন অনেক প্রভাব রেখেছিল। তাই আমরা রুশোর দর্শনকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি। কারণ এটাই বর্তমান আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি।

'রুশোর থিউরির ভিত্তিতে ইউরোপে শাসন-ক্ষমতার যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হয়, তার সারকথা হচ্ছে : ফরাসি বিপ্লবের মৌলিক লক্ষ্য ও নীতিগুলো (নিরাপত্তা, সুখ, উন্নতি, স্বাধীনতা ও সমতা) সমস্ত হিউম্যানের সামষ্টিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ছিল, যাকে "জেনারেল

---

৪০. জাহিলি দেশাত্ববোধের মূল কথা হলো, দ্বীনি দায়িত্ব ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে পরিত্যাগ করে দেশপ্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া।

উইল” বলা হয়। অর্থাৎ সমস্ত হিউম্যান এই লক্ষ্যগুলো গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এখন যখন কোনো দেশ তাদের রাষ্ট্রীয় আইনে এই লক্ষ্যগুলো মূল হিসেবে গ্রহণ করে “উইল অফ অল” বাস্তবায়ন করবে, তখন স্বয়ং সেই রাষ্ট্র সর্বোচ্চ বিধানদাতার মর্যাদায় পৌঁছে যাবে।’

এই থিউরিকে আরও অধিক স্পষ্ট করার জন্য আমরা নিম্নে রুশোর দর্শনকে তুলে ধরছি :

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দর্শন

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল গণতান্ত্রিক থিউরি অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আর এর ভিত্তি ছিল গণতন্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত রুশোর দর্শন। রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করে এবং ফরাসি বিপ্লবের কিছু বছর পূর্বে ফ্রান্সে মারা যায়। তার বই (Social Contact) ‘সামাজিক সম্পর্ক’ এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এই বইয়ে রুশো আধুনিক গণতন্ত্রের পূর্ণ নকশা পেশ করে। বইয়ের শুরু হয় এই বাক্য দিয়ে, ‘মানুষ স্বাধীনভাবে জন্ম নিয়েছে; কিন্তু তাকে সমস্ত ক্ষেত্রে শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।’ রুশো মানুষকে একটি পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেশ করে। সে বলে যে, ‘মানুষের চাহিদা হলো স্বাধীনতা, নিজ চাহিদামতো চলা ও সমতার সাথে থাকা এবং জীবনে সুখের জন্য উন্নতি করা। এই সবই প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদা।’ এটাকে রুশো নাম দিয়েছে (general will) ‘সাধারণ ইচ্ছা’। কিন্তু ‘সাধারণ ইচ্ছা’ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকে, যাকে রুশো নাম দিয়েছে (Will of all) ‘সকলের ইচ্ছা’। সকলের ইচ্ছা এবং সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য রুশো একটি পূর্ণ নকশা পেশ করে, যাকে আজ ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা’ বলা হয়।

রুশোর দাবি অনুযায়ী মানুষ অতীতকালে একসময় সুন্দর ও উন্নত জীবনযাপন করত। যেখানে তারা সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধনকে আঁকড়ে ধরেছিল। সেই সমাজে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ছিল। অতঃপর বিভিন্ন এলাকায় বসতি গড়ে ওঠার ফলে মানুষের মধ্যে ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব থেকে বের হওয়া এবং বেঁচে থাকার জন্য মানুষ একে অপরের সাথে চুক্তি করা শুরু করে। একসময় মানুষের বসতি বাড়ার সাথে সাথে এই চুক্তিগুলোর সাথে সংযুক্ত পক্ষগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে আবারও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবস্থা তৈরি হয়। ফলে তখন মানুষ প্রয়োজন বোধ করে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে হওয়া চুক্তিগুলো কোনো এক যৌথ শক্তির অধীনে সোপর্দ করতে হবে; যাতে সেই শক্তি তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। কিন্তু সে জন্য আবশ্যক ছিল, এই শক্তিকে এমন হাকিমিয়্যাত বা বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা, যা সমস্ত মানুষ গ্রহণ করে নেবে। আর এখান থেকেই আইন প্রণয়নের প্রয়োজন সামনে আসে।

রুশোর মতে মানুষের এমন সংবিধান প্রয়োজন, যা সবার জন্য নিরাপত্তা, সুখ, সমতা, উন্নতি ও স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করবে। এই মূলনীতিগুলো অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাপন করাই সমস্ত মানুষের ইচ্ছা, যাকে রুশো নাম দিয়েছে 'সাধারণ ইচ্ছা বা মূল ইচ্ছা' (Real Will)। অতঃপর এই মূল ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য সবাই নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে 'সাধারণ ইচ্ছা'র অনুগামী করে নেবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে রুশো নাম দিয়েছে 'সবার ইচ্ছা' (will of all)। অর্থাৎ সকলের ইচ্ছাকে সাধারণ ইচ্ছার অনুগত করা আবশ্যক। সাধারণ ইচ্ছাকে মূল ইচ্ছার অনুগত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি বাছাই করবে। এই নির্বাচন দ্বারা 'সাধারণ ইচ্ছা' জনগণ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে চলে যাবে। তখন এই প্রতিনিধিরা একটি কমিটি বৈঠক প্রতিষ্ঠা করবে, যার নাম হবে পার্লামেন্ট। অতঃপর পার্লামেন্ট এমন আইন তৈরি করবে, যা সকলের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ সকলের ইচ্ছা প্রণীত আইন দ্বারা বাস্তবায়িত হবে এবং সাধারণের ইচ্ছা পার্লামেন্টের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর পার্লামেন্ট যখন তাদের প্রণীত আইনে স্বাক্ষর করবে, তখন এর দ্বারা মূলত সাধারণ জনগণের ইচ্ছা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে 'মূল ইচ্ছা বা সাধারণ ইচ্ছা'র অনুগত করে দেওয়া হয়।

'সাধারণ ইচ্ছা' যখন 'সকলের ইচ্ছা'র অনুগত হয়, তখনই মূলত সেই রাষ্ট্রের বিধান দেওয়ার অধিকার অর্জিত হয়, যা সমস্ত জনগণ 'নির্বাচন' এর মাধ্যমে গ্রহণ করে নিয়েছে। রাষ্ট্র সর্বময় বিধানদাতা হওয়ার পর জনগণকে তার আইন মেনে চলা আবশ্যক হয়ে যায়, কারণ তারা নিজেরাই এটাকে গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই আইনের আনুগত্যের দ্বারা মানুষ মূলত নিজেই নিজের গোলামি করে এবং আইনের বিরোধিতা করা মূলত নিজেই নিজের বিরোধিতা করার সমতুল্য হয়ে যায়। এই ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে কেমন যেন মানুষ অন্য কোনো সত্তার বান্দা বা গোলাম না হয়ে তার নিজের গোলাম হয়ে যায়। কেননা, বাস্তবে সে নিজেই নিজের আদেশ মেনে চলছে এবং নিজেই নিজের চাহিদাগুলো পূর্ণ করছে। এই আইন তৈরির ক্ষমতাকে গ্রহণ করে নেওয়াই মানুষকে আলোকায়ন, উন্নতি, স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও সমতার নিশ্চয়তা দেবে।'

এটাই সেই ফর্মুলা, যেখানে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে মানুষকেই সর্বোচ্চ বিধানদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা হয় (মাআজাল্লাহ)। এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এখন আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে মানুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে কেমন যেন মানুষ নিজেই নিজের রব হয়ে গেছে।[৪১]

---

৪১. এটাই সেই থিউরি, যার গর্ত থেকে গণতন্ত্র জন্ম নিয়েছে। আজ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই নিকৃষ্ট দর্শনের ভিত্তিতেই চলছে, যার প্রতিষ্ঠাতা দ্বীনবিরোধী এক জাহিল। আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অগণিত নিয়ামত যে, তিনি আমাদেরকে এমন পরিপূর্ণ হিদায়াত দান করেছেন, যার পরে আমাদের আর মানুষের বানানো দর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমাদের সমাজের লোকেরাই এই কথা বুঝতে প্রস্তুত নয় এবং তারা পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া এই গণতন্ত্রের ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

এর ফলেই রুশোর দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মীয় বা বাদশাহি শাসনে প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ভ্রান্ত ও জালিম সমাজ মনে করা হতো, কারণ সেখানে হিউম্যানের চাহিদাকে অবহেলা করা হয়। এভাবেই ইউরোপে পোপতন্ত্র ও বাদশাহদের ওপর রক্তাক্ত কলম চালানো হয়। এমনকি সমস্ত নবির সম্মিলিত দাওয়াহকেও বাতিল মনে করা হয় এবং ইসলামি খিলাফতকে ইতিহাসের অন্ধকার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয় (নাউজুবিল্লাহ)।

রুশোর দর্শন বর্ণনার পর আমরা এই বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, রুশোর দর্শনেও 'এরিস্টটলের দর্শন'-এর মতো উন্নত সমাজের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠা করাই নাকি মানুষের মূল লক্ষ্য। রুশোর কথামতো মানবজাতির শুরুতে এমন উন্নত সমাজের অস্তিত্ব ছিল, যেখান থেকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের থিউরি জন্ম নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক ও দক্ষ ভূগোলবিদরা অনেক খোঁজার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, মানুষের ইতিহাসে এমন উন্নত সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। তার বর্ণিত এই উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র কাল্পনিক। রুশোর এই মিথ্যা দাবি সত্ত্বেও পশ্চিমারা এই থিউরির ওপরেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে আবশ্যকীয়ভাবে এমন রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির পাশাপাশি এমন শক্তিও প্রয়োজন ছিল, যা এই মিথ্যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করবে। সেই শক্তির আলোচনা আমরা সামনে সামরিক দর্শনের অধ্যায়ে করব ইনশাআল্লাহ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

যেমনটা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, 'সবার ইচ্ছা' ও 'সাধারণ ইচ্ছা' মিলিত হয়ে গঠিত সর্বময় বিধানদানের ক্ষমতা অর্জনের ফলে রাষ্ট্রের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ পূরণ হয়ে যায়। মোটকথা ফরাসি বিপ্লবের পর পূর্বের বাদশাহি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সমস্ত পার্লামেন্ট এমন সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করে, যা ছিল 'সকলের ইচ্ছা'র বাস্তবায়ন। মূলত বিধান প্রণয়নের এই ফর্মুলা থেকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল, যার সামনে রাষ্ট্রের সব বাসিন্দা মাথা ঝুঁকিয়ে দেয় এবং এই সিজদাকেই তারা মানুষের আসল স্বাধীনতা মনে করে। বাস্তবতা হচ্ছে পশ্চিমা চিন্তাবিদরা 'রব' শব্দ ব্যবহার করা ব্যতীতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এমন সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে যে, কেমন যেন এই রাষ্ট্রই মানুষের রব।

যেহেতু হুকুম দেওয়া জীবিত সত্তার গুণ, তাই রাষ্ট্রকে বিধানদাতা বানানোর দ্বারা মূলত তাকে 'বৈধ সত্তা' (Legal Personality) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পূর্বের সমস্ত মুশরিক তো জীবিত বা অস্তিত্বশীল মূর্তির পূজা করত; কিন্তু এই আধুনিক মুশরিকরা কাল্পনিক অস্তিত্বহীন রাষ্ট্রের মধ্যে বিধানদাতার রুহ ফুঁকে দিয়েছে, অতঃপর এটাকে পূজা করা শুরু করেছে। এই রাষ্ট্রকে রবের বন্ধু বা নিকটবর্তী নয়; বরং সরাসরি রব মনে করে পূজা করতে থাকে। এমনকি এই সমস্ত রাষ্ট্রকে এরিস্টটল, রুশো ও হিগেল-সহ অন্যান্য

দার্শনিক প্রভুর মতোই সমস্ত ভুলের ঊর্ধ্বে দাবি করত। অর্থাৎ তাদের মতে রাষ্ট্র ভুল থেকে মুক্ত এবং এর ভুল হওয়াই অসম্ভব। কেমন যেন রাষ্ট্র মানুষের মতো এক সত্তা; কিন্তু কাল্পনিক ও সকলের ঊর্ধ্বে।

রাষ্ট্রের গঠন বোঝানোর জন্য দার্শনিকরা তাকে শরীরের সাথে তুলনা দিয়েছে। যার হাত, পা ও মাথা আছে। অতঃপর তারা এই সত্তাটির জন্য অধিকার ও করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। করণীয় দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রকে জনগণের সকল বিধান ও ফয়সালা দানের ক্ষমতা প্রদান করা, যা সংরক্ষণ ও প্রণয়নের দায়িত্বশীল রাষ্ট্র নিজেই। অপরদিকে জনগণকে সেই রাষ্ট্রের হক বা অধিকার আদায় করতে হবে। যদি কেউ রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে, তাহলে তাকে সেই রাষ্ট্রের সম্মানিত গোলাম বা নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি সে অবাধ্যতা করে, তাহলে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অপরাধী হয়ে যাবে, যার জন্য রাষ্ট্র কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন এই ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বোচ্চ বিধান প্রণয়নের এই ফর্মুলাকে গ্রহণ করে মানুষ রাষ্ট্রের কাল্পনিক সত্তার শিকল নিজের গলায় পরিধান করে সে মূলত কী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে? এর জবাব বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবে যে, মানুষ এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা থেকে, নবিদের আনুগত্য থেকে, দ্বীন থেকে, হালাল-হারামের মাপকাঠি থেকে, সাওয়াব ও গুনাহ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। একমাত্র রাষ্ট্রকেই 'সর্বময় ক্ষমতার' অধিকারী বিশ্বাস করা হচ্ছে ধর্মহীনতার সর্বোচ্চ চূড়া। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাস্তবতা বর্ণনার পর এটা থেকে জন্ম নেওয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্মানিত মুফতি ও আলিমগণের জিম্মাদারি। যেমন : এই রাষ্ট্রের কুফুরি ও শিরকের মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ রয়েছে কি? এই রাষ্ট্র কোনোভাবে ইসলামি রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব কি? যদি কোনো বাহিনী এই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করে, তাহলে সেই বাহিনী ও যুদ্ধের কী হুকুম হবে? যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য সর্বোচ্চ বিধান দেওয়ার উল্লেখিত আদর্শ ও বিশ্বাসকে সঠিক মনে করে, তাহলে শরিয়তে তার অবস্থান কী? এই রাষ্ট্রের শক্তি কীভাবে নিঃশেষ করা যাবে? এই রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের ভেতরে থেকেই এর সংশোধনে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করা হবে, নাকি বিদ্রোহ করে এর বৈশ্বিক ক্ষমতাবানদের সিংহাসন উলটে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে?

মোটকথা, ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপের জনগণ এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ভোট দিয়ে নিজেদের ইচ্ছাকে পার্লামেন্টের কাছে সোপর্দ করে দেয়। এখন পার্লামেন্ট আইন বানিয়ে মানুষকে তার সামষ্টিক ইচ্ছা অর্থাৎ সেই উন্নত যুগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা প্রস্তুত করে দিচ্ছে (যার কোনো বাস্তবতা নেই)। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, পরবর্তী বছরগুলোতে মুসলিম উম্মাহও এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। খিলাফতের চাদর ছিন্ন করে গণতন্ত্রের শিকল গলায় পরিধান করে নেয়। যার আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

মানুষের উন্নতি ও ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব
(পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থান)

নতুন বিশ্বব্যবস্থা অর্থাৎ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল শিল্প-বিপ্লব, যা আধুনিক ইউরোপের গঠনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিপ্লবে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো বস্তুগত উন্নতির ময়দানে এক নতুন রেকর্ড তৈরি করে। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার, যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের আবিষ্কার, রেলওয়ে ও মটরগাড়ির আবিষ্কার ইউরোপের উৎপাদিত পণ্যের আমদানি রপ্তানিকে এতটাই বৃদ্ধি করে যে, পুরো দুনিয়ার বাজারগুলো তাদের মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে যায়। অপরদিকে উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র বানানোর দ্বারা পশ্চিমারা অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়। আর এই বিপ্লব শুরু হয় ইংল্যান্ড থেকে।

এই বিপ্লবের দুটি যুগ ছিল। প্রথম শিল্প-বিপ্লব, যা ১৭৮০-১৮৫০ সালে সংঘটিত হয়েছিল। এই সময়টাতে পোশাক-শিল্পে অনেক উন্নতি হয়েছিল এবং যার মূল কারণ ছিল ব্রিটেন বাংলাকে দখল করে নেওয়া। ৭০ বছরের মধ্যেই ব্রিটেন পোশাক-শিল্পে হিন্দুস্থানকে পিছিয়ে দেয়। শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় যুগ ১৮৫০ খ্রি. থেকে শুরু হয়। এই বিপ্লবের মধ্যে মৌলিক ভূমিকা রাখে আমেরিকা। এই বিপ্লবের কারিগররা আধুনিক মেশিন ও আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদনে অনেক বৃদ্ধি ঘটায়, যার প্রভাব পুরো দুনিয়ার বাণিজ্যের ওপর পড়ে।

শিল্প-বিপ্লবের কারণসমূহ

পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা শিল্প-বিপ্লবের যে সমস্ত কারণ বর্ণনা করে থাকে, আমরা সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ উল্লেখ করছি :

ইংল্যান্ডের মহা বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রি.)

যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি, ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের মহা বিপ্লবের ফলে ব্রিটেন প্রটেস্টান্ট চিন্তাধারা গ্রহণ করে নেয়। প্রটেস্টান্ট ধর্মমতে মানুষ শুধু তার দুনিয়াদারি ও ব্যবসায়িক কাজেই পুরো জীবন ব্যয় করতে পারত। কিন্তু অন্যদিকে ক্যাথলিকরা দুনিয়া-ত্যাগের শিক্ষা দিত। যেহেতু প্রটেস্টান্ট ধর্মমতে দুনিয়া অর্জনের সমস্ত চেষ্টা ধর্মীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হতে থাকে, তাই ঐতিহাসিকদের মতে এই চিন্তাধারা শিল্প-বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কেননা, এই বিশ্বাস ইউরোপে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন তৈরি করে এবং ইউরোপীয় জাতি সংগঠিত হয়ে কাজ করা শুরু করে।

পুঁজিবাদী চিন্তাধারা

শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের পুঁজিবাদী থিউরি। যেখানে স্বাধীন ব্যবসা, ব্যক্তিগত লাভ অর্জন, ব্যবসায় প্রশাসনের কম অনুপ্রবেশ ও শ্রমিকদেরকে শ্রেণিবিন্যাস করার মতো দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এডাম স্মিথের থিউরি অনুযায়ী সবাই যেহেতু নিজের জন্য কামাই করে, তাই প্রত্যেকের উচিত অধিক থেকে অধিক কাজ করা এবং বিনিময়ে অধিক থেকে অধিক লাভ অর্জন করা। এই চিন্তার বিরুদ্ধে কার্ল মার্ক্স সমাজতন্ত্রের থিউরি পেশ করে।

ব্রিটেনের দখলকৃত অঞ্চল বৃদ্ধি

ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের তৃতীয় কারণ ছিল তাদের দখলকৃত উপনিবেশ বৃদ্ধি হওয়া। যার মধ্যে হিন্দুস্থান ও আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ভূমিসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিপ্লবের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানের ওপর ব্রিটেনের দখলদারিত্ব মূল ভূমিকা রেখেছিল। কারণ এই এলাকাগুলো থেকে তারা বিশাল পরিমাণে কাঁচামাল ব্রিটেনে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে, যা থেকে পণ্য উৎপাদনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল। যাতে কাঁচামাল নষ্ট না হয়ে যায়।

পেটেন্টের রেজিস্ট্রেশন

শিল্প-বিপ্লবের আরেকটি কারণ ছিল 'পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন'। এর অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিশেষ বস্তু বানায় বা আবিষ্কার করে, তাহলে এটাকে সে নিজের নামে গভর্মেন্টের কাছে রেজিস্ট্রেশন করবে; যার ফলে তার অনুমতি ছাড়া কেউ আর তা তৈরি করতে পারবে না। যদি কোনো ব্যবসায়ী বা কোম্পানি এটা বানাতে চায়, তাহলে মূল প্রস্তুতকারক বা তৈরিকারী থেকে অর্থের বিনিময়ে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এই নীতি জনগণের মধ্যে উদ্ভাবনের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

পুঁজি বিনিয়োগের নতুন সিস্টেম

শিল্প-বিপ্লবের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ব্যবসার নতুন সিস্টেম। সহজ কথায়, উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিক প্রয়োজন এবং এগুলোর জন্য পুঁজি প্রয়োজন। শিল্প-বিপ্লব ইউরোপের শাসকদেরকে ব্যবসা ও পুঁজি সহজলভ্য করার জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করতে বাধ্য করে। যার ফলে কোম্পানি, ব্যাংক ও স্টক মার্কেট সিস্টেম ব্যবস্থা পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। কারেন্সি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই সিস্টেম প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপের নাগরিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়।

এই সিস্টেমের ফলে তিন ধরনের সহজতা তৈরি হয়। কোম্পানিগুলোর জন্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশে গিয়ে তা ক্রয়ের জন্য যেকোনো ইউরোপীয় ব্যাংক থেকে পুঁজি নেওয়া

সহজ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এই কাঁচামালকে ইউরোপের নিজ নিজ দেশে পৌঁছানোর জন্য ব্যাংক থেকে পুঁজি নেওয়া সহজ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, নিজ দেশে এই কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে পুঁজি নেওয়া সহজ হয়ে যায়। কাঁচামাল আমদানি, কারখানা, পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসার এই নতুন সিস্টেম ইউরোপের নাগরিকদের ব্যক্তিজীবনেও অনেক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সবাই তখন নিজ নিজ সম্পদ বিক্রি করে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা শুরু করে। লোকেরা চাকরি ও রোজগারের তালাশে শহরের দিকে আসা শুরু করে। যার ফলে শহরে আবাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইউরোপের উৎপাদিত পণ্য এতটাই বেড়ে যায়, যা রপ্তানি করে তারা পুরো দুনিয়ার মার্কেটকে পেছনে ফেলে দেয়। এই ধারাবাহিকতা আজও চলমান রয়েছে। যার বিস্তারিত আলোচনা উপযুক্ত স্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গোলামের ব্যবসা

শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে গোলামের ব্যবসাও সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছিল। এখানে গোলাম এই অর্থে নয় যে, কোনো এলাকা বিজয় করে বা কোনো যুদ্ধের পর গোলাম হিসেবে ধরে আনা হয়েছে। বরং ব্রিটেন ও আমেরিকা নিজেদের কারখানায় বেতন ছাড়া শ্রমিকের জন্য আফ্রিকার চতুষ্পার্শ্বের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে বিশেষ কোম্পানি পাঠায়। যাদের সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যরা থাকত। এই কোম্পানিগুলোর কাজ ছিল মৌরিতানিয়া, এঙ্গোলা, নামিবিয়া, কঙ্গো, মাদাগাস্কার, মুজাম্বিক, কেনিয়া ও সোমালিয়ার উপকূলীয় এলাকাগুলোতে হঠাৎ হামলা করে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার করে জাহাজে তুলে এনে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারগুলোতে বিক্রি করে দেওয়া।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিমা জাতি এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস বানায়। যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তাতেই অসুস্থতার ফলে মারা যেত; ফলে তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হতো। যারা ভালো ও সুস্থ থাকত, তাদেরকে শিল্প ও খেত-খামারের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হতো। তারা আর কখনোই নিজের দেশে ফিরে যেতে পারত না। এদের অর্ধেকের বেশি মুসলিম ছিল, যাদেরকে বাধ্য করে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছিল (নাউজুবিল্লাহ)। আমেরিকায় বসবাসকারী সমস্ত কালো প্রজন্ম তাদের গোলামদের বংশ থেকে জন্ম নিয়েছে, শিল্প-বিপ্লবের সময় যাদেরকে কিডন্যাপ করে আমেরিকা ও ব্রিটেনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই প্রজন্ম এখন পূর্ণভাবে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। দাস-ব্যবসার এই কষ্টদায়ক কাহিনি স্বয়ং পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের বইয়ে আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

জাগিরদার ব্যবস্থার পতন

কিছু চিন্তাবিদের মতানুযায়ী পুঁজিবাদী সিস্টেমের উন্নতি জাগিরদার ব্যবস্থার প্রতিরোধস্বরূপ ছিল। এই ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জাগিরদার ব্যবস্থার পতন শুরু হয়। এখন জাগিরদারেরা নিজেদের ভূমি বিক্রি করে কারখানা ও ব্যবসায় অর্থ লাগানো শুরু করে।

শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব

শিল্প-বিপ্লব শুধু ইউরোপে নয়; বরং পুরো দুনিয়াতেই প্রভাব ফেলেছিল। যেমন :

বৈশ্বিক বাজারে পশ্চিমাদের ঠিকাদারি

এই বিপ্লবের ফলে ইউরোপের বস্তুগত উন্নতি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তারা পুরো দুনিয়াকে পেছনে ফেলে দেয়। এই উন্নতির মূল কারণ ছিল ইউরোপে পণ্য অধিক দ্রুত ও অনেক বেশি তৈরির সক্ষমতা ছিল। অধিক ও দ্রুত তৈরির সক্ষমতার ফলে তাদের সম্পদ বৈশ্বিক বাজারে অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোকে খুব দ্রুত পেছনে ফেলে দেয়। যার ফলে বৈশ্বিক বাজারে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, যা আজও প্রতিষ্ঠিত আছে।

মুসলিম উম্মাহর পতন

সেই সময় মুসলিমদের অধিকাংশ এলাকা ছিল পশ্চিমা দখলদারদের উপনিবেশের অধীনে। পশ্চিমা জাতি সেই এলাকাগুলোর সম্পদ সীমাহীনভাবে লুণ্ঠন করে নিজেদের রাষ্ট্রে নিয়ে যায়। যার ফলে মুসলিম এলাকাগুলোর বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুসলিমদের সম্পদ নিজেদের হাত থেকে ছুটে যেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেন ১৭৫৭ সালে বাংলা বিজয় করে। বাংলা বিজয়ের ফলে তুলা ও সুতার এক বড় বাজার তাদের হাতে এসে যায়। পূর্ব জমানায় খুব বেশি পরিমাণ কাঁচামাল রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হতো না; বরং কাঁচামাল থেকে সেই অঞ্চলেই পণ্য উৎপাদন করতে হতো। তাই সেই সময় হিন্দুস্থান ছিল পুরো দুনিয়ার পোশাক রপ্তানিতে একক ও সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। যখন ইংরেজরা বাংলার ওপর কব্জা করে, তখন তারা সর্বপ্রথম বাংলায় এই নীতি পরিবর্তন করে। যার ফলে কৃষকরা কোম্পানির কাছে কাঁচামাল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অতঃপর বাংলা ও হিন্দুস্থানের পোশাক-শিল্প ধ্বংস হতে থাকে। তুলা ও সুতা সোজা ব্রিটেনে যেতে থাকে। ফলে ব্রিটেনে অনেক কাঁচামাল জমা হয়ে যায়। অপরদিকে ব্রিটেন এমন মেশিন তৈরি করে, যা অল্প সময়ে অধিক সুতা কাটতে ও পোশাক তৈরি করতে সক্ষম ছিল। অন্যদিকে হিন্দুস্থানে পোশাক তৈরিতে তাদের থেকে বেশি সময় লাগত। যার ফলে ৭০ বছরের মধ্যেই হিন্দুস্থানের পোশাক ব্রিটেনের পোশাকের বিপরীতে অনেক কমে যায়। এমনকি ব্রিটেনের পোশাক হিন্দুস্থানের মার্কেটে বিক্রি হতে থাকে।

অস্ত্র-ব্যবসা ও যুদ্ধের সক্ষমতা বৃদ্ধি

ইউরোপের মধ্যে এই শিল্প-বিপ্লব সামরিক বিপ্লবের ওপর খুব গভীর প্রভাব ফেলেছিল। লোহাশিল্পে উন্নতি খুব ভালো অস্ত্র বানানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে উন্নত বন্দুক, কামান ও মেশিনগান পশ্চিমাদের আক্রমণের শক্তিতে অনেক বৃদ্ধি ঘটায়। অপরদিকে রেলগাড়ি ও জাহাজের ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে অধিক থেকে অধিক সৈন্য এক জায়গা

থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা সহজ হয়ে যায়। গাড়ি, ট্রাক, ট্যাঙ্ক ও বিমান আবিষ্কার বাহিনীর চলাচলের সক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

নতুন শহর প্রতিষ্ঠা

শিল্প-বিপ্লবের একটি সামাজিক প্রভাব ছিল নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠা। যে সমস্ত এলাকায় কারখানা ছিল সেগুলো শহরে পরিবর্তন হতে থাকে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ শহরের দিকে আসতে থাকে, যা শহরের আবাদি বৃদ্ধি করতে থাকে। এর একটি ক্ষতিকর প্রভাব ছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও বংশ ধ্বংস হতে থাকা এবং সমাজব্যবস্থা দুর্বল হতে থাকা।

সমাজতন্ত্রের বিপ্লব

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও শিল্প-বিপ্লবের বিপরীতে সমাজতন্ত্রের থিউরি সামনে আসে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভাবক ছিল এডাম স্মিথ, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবক ছিল কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক ইঞ্জেল। কার্ল মার্ক্স ছিল জার্মানির ইহুদি দার্শনিক। সে শিল্প-বিপ্লব ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণের পর সমাজতন্ত্রের থিউরি পেশ করে। সমাজতন্ত্র ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীত। কার্ল মার্ক্সের দাবি অনুযায়ী পুঁজিবাদ শুধু এক শ্রেণির সম্পদ বৃদ্ধি করে; যার ফলে সমস্ত পুঁজি একটা শ্রেণির কাছে জমা হয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় গরিব আরও গরিব হয় এবং ধনী আরও ধনী হতে থাকে। কার্ল মার্ক্সের দাবি অনুযায়ী যেই লাভ পুঁজিদাতা অর্জন করে, এটা মূলত শ্রমিকদের মেহনতে অর্জিত হয়। পুঁজিদাতা শ্রমিককে মজুরি দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং সমস্ত লাভ শুধু নিজেই নিয়ে যায়। অথচ এই লাভের মধ্যে এই শ্রমিকেরও অংশ রয়েছে। যদি এই অবস্থা চলমান থাকে, তাহলে পুঁজিবাদ পুরো দুনিয়ার ওপর এমন দখল প্রতিষ্ঠা করবে, যা বাদশাহদের ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যার মধ্যে গরিব ও শ্রমিক শ্রেণিকে গোলামের মতো ব্যবহার করা হয়। কার্ল মার্ক্স এর সমাধান এভাবে দিয়েছিল, দুনিয়ার সমস্ত শ্রমিক মিলে পুঁজিবাদীদের থেকে ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নেবে। অতঃপর পুঁজি ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কন্ট্রোলের মাধ্যমে লভ্যাংশ পুরোটাই সবার মাঝে হিসাব করে বণ্টিত হবে।

কার্ল মার্ক্সের এই থিউরি ইউরোপে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। ১৮৬৪ সালে লন্ডনে প্রথম সমাজতন্ত্রের কনফারেন্স হয়, যার পর এই আন্দোলনের অনেক প্রচার-প্রসার শুরু হয়। ১৮৯৫ সালে দ্বিতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মাঝে পার্থক্য

এখানে আমরা পাঠকের সামনে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরব। যাতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয় এবং এটাকে মাথায় রেখে পুঁজিবাদী সিস্টেমের মোকাবিলায় সঠিক কার্যনীতি প্রস্তুত করা যায়। চিন্তাগত অবস্থান থেকে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের উৎস একই। কেননা মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এই দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এই দুটি ব্যবস্থাই আল্লাহ তাআলার বিদ্রোহী। মানুষকে ধর্ম থেকে স্বাধীন করে দেয় এবং শুধু ব্যক্তিগত উন্নতিকেই জীবনের মাকসাদ হিসেবে গণ্য করে। দুটি সিস্টেমই রেনেসাঁর যুগের চিন্তা-চেতনা, এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন এবং ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। তবে স্বার্থ অর্জনের ক্ষেত্রে এই দুটির কার্যক্রমের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই এই দুটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করার সময় এই পার্থক্যগুলো মাথায় রাখা আবশ্যক। এটা স্পষ্ট হওয়া চাই যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োগকৃত কৌশল কার্যকর হবে না।

এখন চিন্তাগত ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক পার্থক্যসমূহ নিচে পেশ করছি :

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চিন্তাগত অবস্থান

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দুটিই এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও সেক্যুলারিজম অনুযায়ী মানুষকে হিউম্যান বানানো, মুক্তচিন্তাকে গ্রহণ করে বুদ্ধিকেই সর্ববিষয়ে দলিল বানানো এবং মানুষের উন্নতি ও পুঁজি বৃদ্ধিকে জীবনের লক্ষ্য বানানোর ক্ষেত্রে পরস্পর একমত। ঐতিহাসিক দিক থেকে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের ধারায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের আগে অস্তিত্বে এসেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ফরাসি বিপ্লবের পর মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্যের শূন্যতা পূরণের জন্য আসে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামনে এসেছে :

- প্রথম পার্থক্য : হিউম্যানের থিউরিতে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় হিউম্যান স্বাধীন সত্তা, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে হিউম্যান শুধু গরিব ও অক্ষম শ্রেণির মানুষ, যাদের অধিকার পুঁজিপতিরা মেরে খাচ্ছে। এই দুর্বল হিউম্যানদের অধিকার রক্ষার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এই মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তিতেই বাকি সব পার্থক্য তৈরি হয়েছে।
- দ্বিতীয় পার্থক্য : পুঁজি বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত সংখ্যা অর্থাৎ 'লাভ' (Surplus Value) -এর ক্ষেত্রে পার্থক্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লাভকে পুঁজিদাতার অধিকার মনে করা হয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে লাভকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার মনে করা হয়, যা সমাজে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে হবে।

- তৃতীয় পার্থক্য : পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রশাসনের ক্ষমতা সমস্ত জনগণের সম্মিলিত ক্ষমতা; চাই সে পুঁজিদাতা হোক বা শ্রমিক। এই জন্যই তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে সরকারী ক্ষমতা শুধুই শ্রমিক শ্রেণির অধিকার, যার জন্য তারা যুদ্ধ করে।
- চতুর্থ পার্থক্য : পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চায় সমাজে মালিকানার অধিকার, স্বাধীন ব্যবসা, ব্যবসায়িক উন্নতি, সম্পদের উন্নতির ক্ষেত্র সব ধরনের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকা। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র চায় প্রশাসনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে জীবনযাপনের সুযোগ সমানভাবে বণ্টন করতে।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কার্যক্রমে পার্থক্য

চিন্তাগত বৈপরীত্যের ভিত্তিতে কাজের ক্ষেত্রেও নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো তৈরি হয়েছে :

- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোম্পানিগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন (Privatization) হয়ে থাকে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের সংস্থাগুলো হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন (Nationalization)।
- পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্বাধীন বাণিজ্যের প্রবক্তা, যেখানে প্রশাসনের সবচেয়ে কম অনুপ্রবেশ থাকবে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র বিনিয়োগকারীকে (Non Commercial) বাজারের পরোয়া না করে ব্যবসার প্রবক্তা, যার নেগরানি প্রশাসন করবে।
- পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পেশাদার (Professional) মানুষকে সম্মান করা হয়, সমাজতন্ত্রে শুধু শ্রমিক শ্রেণিকে সহায়তা করা হয়।
- পুঁজিবাদী সমাজ 'কর্পোরেট সমাজ' (Corporate Society)-এর রূপ ধারণ করেছে।[৪২] অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে 'আইরন কার্টেন সমাজ' (Iron Curtain Society) হয়ে থাকে। আইরন-কার্টেন দ্বারা উদ্দেশ্য লৌহ-খাঁচায় বন্দী সমাজ।[৪৩]

---

৪২. কর্পোরেট সমাজের দ্বারা এমন সমাজ উদ্দেশ্য, যেখানে প্রত্যেক সদস্য শুধু কাজ আর কাজ করে এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক পেশার (*Professions*) সীমা পর্যন্তই হয়ে থাকে। এই সমাজে ভ্রাতৃত্বের কোনো স্থান থাকে না এবং বংশীয় সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আমেরিকা ও ইউরোপের সমাজগুলো এমনই সমাজ, যেখানে মানুষের সম্পর্ক শুধু পেশার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, যেন জানোয়ারের মতো তাদের মধ্যে শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্পর্ক থাকে। আফসোস হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্বের ওপর চেপে বসার পর এখন মুসলিম সমাজও এই পথে এগিয়ে চলছে।

৪৩. এই সমাজে জনগণ প্রশাসনের অধীনে আবদ্ধ হয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যেও প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে। এর স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের রাশিয়া। মুসলিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ইহসান যে, তিনি আমাদেরকে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত ভারসাম্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা দান করেছেন, যার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ তেরো শতাব্দী পর্যন্ত আমল করেছে, সর্বশেষ উসমানিদের পতন হয়। যার পরের অবস্থা সামনে আলোচনা হবে।

- পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রশাসন চালানো হয়। যেখানে নিয়ন্ত্রণের (Controls) মাধ্যমে সমস্ত শৃঙ্খলাকে টিকিয়ে রাখা হয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণির একচ্ছত্র সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত (Dictatorship), যেখানে (Commands) আদেশের মাধ্যমে শৃঙ্খলা পরিচালিত হয়।[88]
- দুটিই বৈশ্বিক (Global) শাসনের প্রবক্তা। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার নিজের জন্য কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক (Statesman) ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাদের দৃষ্টি শুধু স্বার্থের দিকে নিবদ্ধ থাকে; চাই তা যেই পদ্ধতিতেই অর্জন করা হোক। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র যুদ্ধকে কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে নিজের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে।

এই পার্থক্যগুলোকে অনুধাবনের ফলে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মোকাবিলায় শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তা। অন্যদিকে পুঁজিবাদ কেন্দ্রীয় না হওয়ার ফলে সব জায়গায় জোট বা অংশীদারের তালাশে থাকে। এই জোট অর্জনের পর এর আকৃতি অনেক বৃদ্ধি হতে থাকে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রে বাহ্যিক জোট থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কাজ নিজস্ব বলে পরিচালনা করে।

সামরিক চিন্তাধারায় বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের ফলে একটি বড় সমস্যা সৃষ্টি হয় বাদশাহদের নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী নিয়ে। শাহি বাহিনী তাদের বাদশাহকে আল্লাহ তাআলার ছায়া মনে করে লড়াই করত। তার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় বলে বিশ্বাস করত এবং তার জন্য জান কুরবান করাকে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করত। কিন্তু ধর্মহীন রাষ্ট্রে এমন কোনো থিউরির সুযোগ ছিল না। অথচ সর্বস্বীকৃত বিষয় হলো, কোনো বাহিনী দৃঢ় আদর্শ ও পরস্পর একতার সূত্র ছাড়া কখনো যুদ্ধে নামতে পারে না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জন্য এমন থিউরির প্রয়োজন হয়, যা তাদের একত্রিত ও উজ্জীবিত রাখতে পারবে। পশ্চিমাদের এই প্রশ্নের জবাব প্রুশিয়ার (Prussia) জেনারেল ক্লজউইজ (Karl Von Clausewithz) দিয়েছিল। ক্লজউইজের থিউরিকে পশ্চিমা রাষ্ট্রীয় বাহিনী গঠনের আদর্শ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাইবেলের মতো মূল্যায়ন করা হয়। ক্লজউইজকে আধুনিক সামরিক বিদ্যার জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৭৯৮ সালে ক্লজউইজ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রুশিয়ার জেনারেল ছিল, যে পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এটা ছিল সেই যুগ, যখন ইউরোপ ফরাসি বিপ্লবের ফলে পোপতন্ত্র ও বাদশাহি দুটা থেকেই মুক্ত ছিল। এই যুগেই কান্ট (Kant)

---

৪৪. আদেশ ও নীতির পরিভাষা মূলত ম্যানেজমেন্টের প্রসিদ্ধ পরিভাষা। বর্তমানে এই পরিভাষা বিশেষভাবে বাহিনীর শৃঙ্খলা ও নীতির জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। কমান্ড কোনো ক্ষমতাশালীর আদেশকে বলা হয়। আর কন্ট্রোল সেই নীতিকে বলা হয়, যা কাজের শৃঙ্খলার জন্য মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যার ফলে কাজ নিজে নিজেই সেই কন্ট্রোল অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

পুঁজিবাদ ও কার্ল মার্ক্স সমাজতন্ত্রের থিউরি পেশ করেছিল। ক্লজউইজ যদিও নিজে কার্ল মার্ক্সের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল; কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার থিউরিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদীরা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে। ক্লজউইজের থিউরি তার জীবদ্দশায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ১৮৩২ সালে অসুস্থতার ফলে সে মৃত্যুবরণ করে।

তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী এই চিন্তাধারাগুলো বই আকারে ছাপিয়ে প্রচার করে। শুরুতে তা তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কিন্তু ১৮৭১ সালে যখন ফ্রান্সের বাদশাহ নেপোলিয়ন তৃতীয় (Nepoleon III) প্রুশিয়ার ওপর হামলা করে, তখন এই যুদ্ধে প্রুশিয়ার বাহিনীর সেনাপতি ছিল ক্লজউইজের শাগরিদ জেনারেল মোল্টকি (General Moltke)। মোল্টকি প্রুশিয়ার বাহিনীকে ক্লজউইজের থিউরি অনুযায়ী সাজিয়েছিল। ফ্রান্স সেই যুদ্ধে কঠিন পরাজয়ের শিকার হয়। প্রুশিয়ার সফলতা দেখে সারা ইউরোপ চমকে গিয়েছিল। পরে যখন জানতে পারে, এটা ছিল ক্লজউইজের থিউরি বাস্তবায়নের ফল, তখন পুরো ইউরোপ তা গ্রহণ করা শুরু করে। তারা সকলেই নিজেদের বাহিনীকে তার থিউরি অনুযায়ী সাজাতে থাকে।

সেই সময় পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তারাও এই মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। উসমানিরা স্বয়ং জেনারেল মোল্টকিকে তাদের বাহিনী নতুনভাবে সাজানোর দায়িত্ব দেয়। অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তাদের বাহিনীগুলোকে এই থিউরি অনুযায়ী সাজিয়ে নেয়। হিন্দুস্থান দখলকারী ব্রিটেন ও মিশর দখলকারী ফ্রান্স তাদের বাহিনীকে এই থিউরি অনুযায়ী ঢেলে সাজায়। যার ফলে ৭০ বছরের কম সময়ে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ক্লজউইজের থিউরি অনুযায়ী নতুনভাবে সাজানো হয়ে যায়। এমনকি এই রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর নাম পর্যন্ত 'ক্লজউইজের বাহিনী' রাখা হয়। আমাদের জন্য এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সোভিয়েতকে পরাজিত করার পর আমাদের মোকাবিলা এখন ক্লজউইজের বাহিনীর সাথে হচ্ছে। তাই ক্লজউইজের থিউরিগুলো ভালোভাবে বোঝা উচিত। নিচে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে :

ক্লজউইজের বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ

বাহিনীকে গঠনের সময় ক্লজউইজের সামনে কিছু লক্ষ্য ছিল :

১. শাহি ফৌজকে জাতীয়তাবাদী বাহিনীতে পরিবর্তন করা

২. শাহি সিপাহিকে জাতীয়তাবাদী সোলজার বানানো

৩. যুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন

৪. নতুন থিউরি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনাগত গঠন সাজানো

ক্লজউইজের থিউরিসমূহ

এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা পেশ করে। সেগুলো হলো :

• বৈধ শক্তি

ক্লজউইজের নিকট 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হচ্ছে একমাত্র বৈধ শক্তি, যে যুদ্ধের আদেশ দিতে পারে। এই শক্তি ব্যতীত অন্য কোনো বৈধ শক্তি নেই, যে যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার অধিকার রাখে। না রব, না দ্বীন, না শরিয়াহ এবং না আলিমরা; (নাউজুবিল্লাহ) এদের কেউই যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার অধিকার রাখে না।

• শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অশৃঙ্খল যুদ্ধ

ক্লজউইজের থিউরি অনুযায়ী যুদ্ধ দুই ধরনের : একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ যুদ্ধ এবং অপরটি অশৃঙ্খল যুদ্ধ। শৃঙ্খলাবদ্ধ যুদ্ধ শুধু প্রশাসনের জন্যই নির্দিষ্ট, কেননা প্রশাসন রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার একমাত্র রক্ষক। তাই যেই যুদ্ধে প্রশাসন লড়বে, সেই যুদ্ধটাই শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈধ যুদ্ধ এবং যুদ্ধে লড়ার অধিকারও শুধু প্রশাসনেরই রয়েছে। এটা ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধ বিশৃঙ্খলা ও অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে।

• সশস্ত্র ও অসশস্ত্র সমাজ

এই নীতির ভিত্তিতেই সমাজের বৈধ সশস্ত্র সদস্য ও অবৈধ সশস্ত্র সদস্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বাহিনীর সিপাহিরাই সমাজের বৈধ সশস্ত্র সদস্য; তাই সমাজের বাকিরা যদি অস্ত্র ধারণ করে, তাহলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও ক্লজউইজের থিউরি অনুযায়ী মানুষের অস্ত্র ধারণের অনুমতি শুধু একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রশাসন দিতে পারবে। এ ছাড়া কোনো শক্তি কোনো মানুষ বা গ্রুপকে সশস্ত্র করার অধিকার নেই।

• যুদ্ধ, রাজনৈতিক পলিসির ধারাবাহিকতা

পূর্বের থিউরির ভিত্তিতে ক্লজউইজের নিকট যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় রাজনীতি বা পলিসির নাম। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি, এই তিন থিউরি গ্রহণের ফলে মুসলিম উম্মাহর বাহিনীগুলোতে এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তাআলার হুকুম জিহাদের বিধান আদায় না করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদেশের অপেক্ষায় থাকে।

• রেজিমেন্ট ও তার ইতিহাস (যুদ্ধের উদ্বুদ্ধকারী)

ক্লজউইজের মতে বাহিনীর একক শক্তি হচ্ছে রেজিমেন্ট। অনেকগুলো রেজিমেন্ট মিলে একটি ডিভিশন হয়। ভিডিশনকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনী হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এই বাহিনীর একক অর্থাৎ রেজিমেন্ট একটি সমাজের সমতুল্য। ক্লজউইজের থিউরি ছিল, মানুষ দুই কারণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, একটি হলো সামষ্টিক কারণ 'দেশপ্রেমের চেতনা'।

দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত কারণ, আর এটাই তার কাছে রেজিমেন্টের ইতিহাস। এভাবেই শাহি সেনা, যারা পূর্বে বাদশাহকে আল্লাহ তাআলার ছায়া মনে করে যুদ্ধ করত, এখন তাদেরকে রেজিমেন্টের ইতিহাসের সাথে মিলিত করে রাষ্ট্রীয় সৈন্যে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে।

অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত, যদিও দেশপ্রেম একজন সেনাকে ময়দানে এনে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে; কিন্তু লড়াইয়ের সময় নিজের জান তার রেজিমেন্টের সম্মান ও ইজ্জতের জন্য কুরবান করে দেয়। মোটকথা, তার নিকট যুদ্ধের ময়দানে রেজিমেন্টের ইতিহাস দেশপ্রেম থেকেও বেশি প্রভাবশীল প্রমাণিত হয়েছে। যদি কোনো সিপাহির সামনে তার রেজিমেন্টের ইতিহাসকে ভুল প্রমাণিত করে দেওয়া যায়, তাহলে তার যুদ্ধের আগ্রহ শেষ হয়ে যায়।

- **বাহিনীর জন্য সেনা নির্বাচন**

রাষ্ট্রীয় সিপাহি নির্বাচনের জন্য সমাজের সদস্যদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। সেখান থেকেই মার্শাল বা সামরিক প্রজন্ম এবং সামরিক মানসিকতার থিউরি সামনে আসে। এই থিউরি অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে এমন সদস্য রয়েছে, যারা দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় চিন্তাধারার অধিকারী; কিন্তু আক্রমণাত্মক ও দৃঢ়চেতা মানসিকতা রাখে। এমন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় সৈনিক হওয়ার সক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে। দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় চিন্তার ফলে এমন ব্যক্তিরা নিজের দেশ ও বাহিনীর সাথে বিদ্রোহ করে না। আর আক্রমণাত্মক মানসিকতার ফলে দুশমনের বাহিনীকে ক্ষতি করার ক্ষেত্রে খুব অগ্রগামী থাকে।

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গঠন

ক্লজউইজের বাহিনীর থিউরি বোঝার পর এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারব, সে কীভাবে শাহি ফৌজকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে রূপান্তর করেছে। প্রথমে একজন দুর্বল ব্যক্তিকে রিক্রুট করা হতো এবং সেই ব্যক্তিকে দেশ ও রেজিমেন্টের ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হতো। অতঃপর এই রেজিমেন্টকে ব্রিগেড বা ডিভিশনের সাথে মিলিত করে দেওয়া হতো। এই সিপাহিকে প্রশিক্ষণের সময় এই বিশ্বাস করানো হতো যে, যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার বৈধ শক্তি শুধু এবং শুধুই গণতান্ত্রিক প্রশাসন। তারা ব্যতীত কোনো শক্তি যুদ্ধের আদেশ দিতে পারবে না। তাকে এটাও বলে দেওয়া হয় যে, রাষ্ট্রীয় বৈধ অস্ত্রধারী ও অনুগত সৈনিকরাই শুধু বৈধ যুদ্ধ করতে পারে। এরা ছাড়া যারাই যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করবে, তারা সন্ত্রাসী ও অবৈধ।

সেই সময় পুরো দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় বাহিনী—চাই তা পশ্চিমা হোক বা মুসলিম—তাদেরকে ক্লজউইজের থিউরির মতে গঠন করা হয়। তাই জিহাদ করা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কোনো ভূমিকা থাকে না এবং কখনো থাকবেও না। কারণ, এই কাজ তাদের আদর্শের বিপরীত।

ইহুদিদের শতাব্দী

ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের পর অন্যান্য রাষ্ট্রেও বিপ্লব হতে থাকে। শিল্প-বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সাথে সাথে ইউরোপের সমাজ নতুনভাবে গঠন হতে থাকে। ইউরোপের জনগণ ধর্ম থেকে স্বাধীন হয়ে বস্তুগত উন্নতির পথে চলতে শুরু করে। অপরদিকে ইউরোপের এই বিপ্লবগুলো থেকে ইহুদিদের অনেক ফায়দা হয়। ইহুদিরা গির্জার বাধা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র ইহুদিদেরকে সমান নাগরিক অধিকার প্রদান করে। দ্বিতীয় দিক থেকে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইহুদিরা সবচেয়ে বড় পুঁজিদাতা হয়ে যায়।

এই পরিবর্তনের ফলে ইহুদিরা তাদের মহান লক্ষ্যের দিকে আরও এক কদম এগিয়ে যায়। তারা তাদের শত্রু ক্যাথলিকদেরকে পরাজিত করে এবং প্রটেস্টান্টরূপে নিজেদের জন্য একটি শক্তিশালী জোট তৈরি করে ফেলে। যারা ফিলিস্তিনের ওপর তাদের অধিকারকে মেনে নেয় এবং তা দখলের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যাদের মধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে ইহুদিরা ইউরোপের ব্যাংকগুলোর ওপর পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নেয়। তবে তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফিলিস্তিনের ওপর কব্জা করা, কারেন্সিকে স্বর্ণের শক্তি থেকে আলাদা করা ও কারেন্সির মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা ব্যাংককে সোপর্দ করা এবং এগুলোর বৈশ্বিক সব রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখল করা বাকি ছিল তখনও।

ফিলিস্তিন দখলের পথে তাদের সামনে তখনও দুটি বড় শক্তিশালী বাধা বিদ্যমান ছিল। একদিকে উসমানিরা, যাদের নিয়ন্ত্রণে ফিলিস্তিন রয়েছে। অপরদিকে রাশিয়ার বাদশাহ, যাকে 'জার' বলা হতো। রাশিয়ার জার ছিল অর্থডক্স খ্রিষ্টান, তারা ক্যাথলিকদের মতোই ইহুদিদের দুশমন। তারা কখনোই ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জন্য আলাদা ভূমি ও রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না; বরং তারা নিজেরাই ফিলিস্তিন ভূমির দাবিদার ছিল। ইহুদিদের জন্য এই দুটি শক্তিকে রাস্তা থেকে হটানো তখনও বাকি ছিল। এই দুটি শক্তি এমন নয়, যেগুলোকে সহজে হটানো সম্ভব। স্বয়ং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পক্ষেই এই দুই শক্তিকে রাস্তা থেকে হটানো সম্ভব ছিল না।

ফলে অবস্থা এই ছিল, একদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উসমানিদের বিলুপ্তির পরিকল্পনা করছিল, যেখানে রাশিয়ার জারও তাদের সাথে ঐকমত্য ছিল। কিন্তু এটাও বাস্তবতা ছিল যে, কোনো পক্ষেই এতটুকু সাহস ছিল না যে, তারা একাই উসমানিদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে (যদিও তখন উসমানিরা অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল)। অপরদিকে এই শতাব্দীর বিপ্লবগুলো পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিকে রাশিয়ার বিরোধী বানিয়ে দেয়। এই জন্য তারা উসমানিদের রক্ষা করছিল। এই প্রেক্ষাপটগুলো এতটাই কঠিন ছিল, যা একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের জন্য অসংখ্য সৈনিকের প্রয়োজন ছিল, যা ব্রিটেন হিন্দুস্থানের ওপর কব্জার ফলে সংগ্রহ করতে সক্ষম

হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থানে ব্রিটেনই একক রাষ্ট্র ছিল, যারা হিন্দুস্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে খিলাফতকে খতম করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির (হিন্দুস্থানের শাহি ফৌজ) ১৫ লক্ষ বাহিনী মুসলিম উম্মাহর খিলাফতকে ধ্বংসের দুর্ভাগ্য অর্জন করে!

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই রাজনীতি এতটাই কঠিন ছিল যে, এটাকে স্পষ্ট করা ও বোঝার জন্য এক বিশাল বই প্রয়োজন। এ জন্য ঐতিহাসিকরা এই যুদ্ধকে গ্রেট গেইম নাম দিয়েছে। এখানে আমরা সেই ঘটনাগুলো সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করব। যেহেতু রাজনৈতিক খেলাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উসমানি সাম্রাজ্য, রাশিয়ার জার, ব্রিটেন সাম্রাজ্য, ফ্রান্স ও হিন্দুস্থান ছিল, তাই আমরা সব ঘটনা একই সূত্রে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

গ্রেট গেইম
(মুসলিম উম্মাহর পতন)

গ্রেট গেইম মূলত পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের পরিভাষা, যা উসমানি খিলাফতকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কৃত চক্রান্ত ও যুদ্ধগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই তিনটি রাষ্ট্র একদিকে উসমানিদের দুর্বল করছিল এবং অপরদিকে চেষ্টা করছিল; যাতে তাদের কেউ একে অপরের থেকে বেশি অংশ দখল করতে না পারে। এই জন্যই ১৮৭৭ সালে রাশিয়া যখন উসমানিদের ওপর হামলা করে অনেক অংশ দখল করে নেয়, তখন ফ্রান্স ও ব্রিটেন উসমানিদের রক্ষাকারী হয়ে যায়। ফলে রাশিয়া সেখান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু বলকান যুদ্ধে যখন নিজেদের স্বার্থ সামনে আসে, তখন এই দুই রাষ্ট্র উসমানিদের মোকাবিলায় বলকানকে রক্ষা করে। অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য যখন বড় শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন সবাই মিলে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফ্রন্ট খুলে দিয়েছিল।

গ্রেট গেইমের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশকে ইউরোপীয় যুগ বলা হয়, যা ১৮৫৬ থেকে শুরু হয়ে ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ পর্যন্ত চলমান ছিল। এই যুগ প্রায় ৬০ বছর দীর্ঘ ছিল। এই সময় মুসলিম উম্মাহর তিন দুশমন নিজ নিজ অবস্থান থেকে উসমানিদের দুর্বল করে ইউরোপ থেকে তাদের ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। অতঃপর গ্রেট গেইমের দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিয়ে উসমানিদের পতন (১৯১৪ থেকে ১৯২৩ খ্রি.) পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ্রেট গেইমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গ্রেট গেইমের ঘটনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল। এই খেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। চারটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হচ্ছে উসমানি খিলাফত, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স। দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে, ব্রিটেনের হিন্দুস্থান দখল এবং ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর দখলের চেষ্টা।

এটা ছিল সেই সময়, যখন উসমানিদের ক্ষমতা দুনিয়ার তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে ছিল এবং তাদের অবস্থান সুপার পাওয়ারের মতো ছিল। এই সাম্রাজ্যের সীমা একদিকে রাশিয়ার সাথে অপরদিকে ইউরোপের জার্মানি ও ফ্রান্সের সাথে লেগে ছিল। বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক পথ উসমানিদের কব্জায় ছিল। ভূমধ্য সাগরে তাদের অনুমতি ব্যতীত কোনো জাহাজ চলতে পারত না। ভূমধ্য সাগর অতীতকাল থেকেই বিশ্বের মেরুদণ্ডের মতো ছিল। ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস ভূমধ্য সাগরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কারণ বনি ইসরাইলের প্রাচীন ইতিহাস হোক বা সিকান্দারের হামলা, মুশরিক

রোম হোক বা খ্রিষ্টান রোম, বনি উমাইয়্যা হোক বা বনি আব্বাসি, উসমানিদের পশ্চিম রাষ্ট্রগুলো থেকে যুদ্ধ হোক বা পশ্চিমাদের গ্রেট গেইম, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের যুদ্ধ হোক বা হিটলারের আফ্রিকান চক্রান্ত; বাস্তবতা হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনায় ভূমধ্য সাগরের ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। যার ফলে পূর্ব-পশ্চিমের ঐতিহাসিকরা একমত যে, দুনিয়ার সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য ভূমধ্য সাগরের ওপর কব্জা জরুরি।

ভূমধ্য সাগরের ভৌগলিক অবস্থান

ভূমধ্য সাগর (Mediterranean Sea) পশ্চিমে জিব্রাল্টা প্রণালী (Gibraltar) থেকে নিয়ে পূর্বে ফিলিস্তিন, শাম ও লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় আড়াই হাজার মাইল লম্বা এক জলাভূমি। এটি পশ্চিমে জিব্রাল্টা প্রণালীর স্থানে (Atlantic Ocean) প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব দিকে ভূমধ্য সাগর থেকে দুটি রাস্তা বের হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশরের (Suez Canal) সুয়েজ খালের মাধ্যমে (Red Sea) লোহিত সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এই খালটিকে ১৮৬৯ সালে ফ্রান্সের এক কোম্পানি বানিয়েছিল। উত্তর-পূর্ব দিকে এটি মর্মর সাগর (Dardanelles Strait) পাড়ি দিয়ে বসফরাস প্রণালী (Bosphorus Stait) দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণ সাগর (Black Sea)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের এই তিন রাস্তা সর্বদাই ব্যবসা ও সেনাবাহিনী আসা-যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। ভূমধ্য সাগরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সমুদ্রের দুই দিকে বিশ্বের তিনটি মহাদেশ একে অপরের থেকে কিছু মাইল দূরে এসে থেমে গেছে। জিব্রাল্টা প্রণালীতে ইউরোপ ও আফ্রিকা একে অপর থেকে শুধু পনেরো কিলো দূরে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মিশরের সিনাই (Sinai) মরুতে আফ্রিকা ও এশিয়ার ভৌগলিক সীমা মিলিত রয়েছে। উত্তর-পূর্বে এশিয়া ও ইউরোপ তুর্কিতে শুধু পাঁচ কিলো দূরে এসে মিলিত হয়েছে।

ভূমধ্য সাগরে নিজেদের দখল টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেক বড় শক্তি পশ্চিমে জিব্রাল্টা প্রণালী, মধ্য ভূমধ্য সাগরের সিসিলি (Sicily), মাল্টা (Malta) ও ক্রিট (Crete) দ্বীপের ওপর দখল জরুরি মনে করত। এ ছাড়াও মিশরের ইস্কান্দারিয়া (Alexandria) বন্দর এবং তুর্কির মর্মর সাগরে গ্যালিপলি (Gallipoli) বন্দরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সামরিক স্থান। আধুনিক যুগের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে এই স্থানগুলোতে লড়াই হয়েছিল।

রাশিয়ার জার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ায় জারের সাম্রাজ্য এক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের ব্যবসার জন্য ওয়ার্ম ওয়াটার পোর্টের[৪৫] প্রয়োজন ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার উপযোগী ক্ষেত্র কৃষ্ণ সাগর ছিল উসমানিদের দখলে। এ ছাড়া পশ্চিম দিকের পথ ইউরোপের অভ্যন্তরীণ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো এবং সেখানেও উসমানিরা এই রাস্তাগুলোতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাশিয়ার দক্ষিণে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর ওপর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উসমানিদের দখল ছিল। ভৌগলিক এই সমস্যাতে রাশিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর ভাগে পতিত ছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স

যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি, ১৩৪০ সালে ইউরোপে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ফলে পুরো ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ বসতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সমস্ত বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে ইউরোপ তখন দুনিয়ায় নতুন বাজার তালাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র যাদের মধ্যে পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ব্রিটেন অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা ব্যবসার জন্য বের হয়। এই রাষ্ট্রগুলো নিজেদের কোম্পানিগুলো হিন্দুস্থানে রওয়ানা করিয়ে দেয়। অতঃপর সেখানে মোঘল বাদশাহদের অনুমতি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ইউরোপ থেকে হিন্দুস্থানে আসার দুটি রাস্তা ছিল। একটি পথে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে লোহিত সাগর হয়ে আরব সাগর পৌঁছে সেখান থেকে হিন্দুস্থানে যাওয়া যেত। এই রাস্তা ছোট ও সহজ ছিল। সেই সময় এই রাস্তায় হিন্দুস্থানে দুই মাসে সফর শেষ করা যেত। কিন্তু দ্বিতীয় রাস্তায় প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের সাথে সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার শহর ক্যাপটাউন ঘুরে দক্ষিণ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ভারত সাগরে প্রবেশ করা যেত। অতঃপর সেখান থেকে আরব সাগর পার হয়ে হিন্দুস্থানে যাওয়া যেত। এই সফরের জন্য আট মাস সময় লাগত।

অপরদিকে আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপের সব রাষ্ট্র সেটাকেও দখলের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মাঝে তাদের নতুন বাজার দখল নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকাতে থাকা ব্রিটেনের বাজারগুলো প্রচণ্ড এক ধাক্কা খায়। কেননা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকা ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছিল। আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ব্রিটেন এসে হিন্দুস্থানে ফ্রান্সের ব্যবসাকে অনেক সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং আস্তে আস্তে হিন্দুস্থান তাদের পূর্ণ দখলে নিয়ে নেয়।

---

৪৫. শীতকালে সমুদ্রের পানি বরফে জমে গেলে তা দিয়ে জাহাজ ইত্যাদি জলযান চলাচল ব্যাহত হয়। তাই রাশিয়ার এমন এক সামুদ্রিক যোগাযোগপথ প্রয়োজন ছিল, যার পানি শীতকালেও স্বাভাবিক থাকে, আর এর উপযোগী সমুদ্র ছিল কৃষ্ণ সাগর। রাশিয়া এ কৃষ্ণ সাগরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং তাতে ওয়ার্ম ওয়াটার পোর্ট স্থাপনের জন্য মরিয়া ছিল।

গ্রেট গেইমের যুদ্ধক্ষেত্র

হিন্দুস্থানের ওপর দখলদারিত্বের পর ব্রিটেনের জন্য জরুরি ছিল যে, তারা ভূমধ্য সাগর থেকে লোহিত সাগর ও সেখান থেকে আরব সাগর এবং সেখান থেকে হিন্দুস্থানে পৌঁছার রাস্তাকে নিজেদের জন্য খোলা রাখবে, যা তখন উসমানিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এটাই ছিল গ্রেট গেইমের প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র। এই পথে তাদের জন্য এডেন ও ইস্কান্দারিয়া বন্দর এবং ক্রিট, মাল্টা ও সিসিলি দ্বীপের ওপর দখল আবশ্যক ছিল। ব্রিটেন ১৮১৪ সালের প্যারিস কনফারেন্সের মাধ্যমে মাল্টা দখল করে নেয়। ১৮৩২ সালে এক চুক্তির অধীনে এডেনকে উসমানিদের থেকে নিয়ে নেয়। ১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিশর দখল করে এবং ১৮৯৮ সালে ক্রিটকে উসমানিদের থেকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

গ্রেট গেইমের দ্বিতীয় ক্ষেত্র ১৮৫৬ সালে রাশিয়ার সাথে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর শুরু হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর লক্ষ্য ছিল পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ থেকে উসমানিদের বের করে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ত্রিশক্তি একত্রে ছিল; কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের এক বিশাল প্ল্যান সাজায়। খিলাফতের ভেতর তারা আইন (পার্লামেন্ট), গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও উন্নতির স্লোগানে কিছু পার্টি প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। মুসলিম এলাকাগুলোতে অবস্থানরত খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। যার ফলে সর্বশেষ ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে ইউরোপে উসমানিদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

গ্রেট গেইমের তৃতীয় ক্ষেত্র ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯২৩ খ্রি.)। যেখানে খিলাফতকে পতন করে কামাল আতাতুর্ক জাতীয়তাবাদী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রেট গেইমের চতুর্থ ক্ষেত্র রাশিয়ার দক্ষিণ দিকের সীমান্ত বৃদ্ধির ফলে তৈরি হয়েছিল। রাশিয়া ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো দখল করে ব্রিটেন ও হিন্দুস্থান থেকে মাত্র চারশ কিলো দূরত্বে চলে আসে। ফলে রাশিয়া ও ব্রিটেনের মাঝে শুধু আফগানটাই বাকি ছিল। যার ফলে তখন আফগানের গুরুত্ব বেড়ে যায়। রাশিয়া চাচ্ছিল আফগানে তাদের চাহিদামতো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং ব্রিটেন চাচ্ছিল তাদের চাহিদামতো সরকার গঠন হবে। এই রেষারেষি এক নতুন যুদ্ধের সূচনা করে, যাকে কাবায়েলি যুদ্ধ বা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রথম আফগান জিহাদ বলা হয়।

গ্রেট গেইমের পঞ্চম ও সর্বশেষ ক্ষেত্র ছিল রাশিয়ার সন্নিকটে ক্রিমিয়া, ককেশাস, বলকান ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো এবং কৃষ্ণ সাগর।

গ্রেট গেইমে হিন্দুস্থানের ভূমিকা

গ্রেট গেইম উসমানিদের পতনের শুরু থেকে পতন পর্যন্ত (১৮২৫-১৯২৩ খ্রি.) চলমান ছিল। এই পুরো সময়ে ব্রিটেনের ভূমিকাই ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। যার মূল কারণ ছিল ব্রিটেনের হিন্দুস্থান দখল। হিন্দুস্থান ব্রিটেনকে সেই বাহিনী ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিয়েছিল, যার মাধ্যমে তাদের এমন সক্ষমতা তৈরি হয়েছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা উসমানিদের পরাজিত করে মুসলিম উম্মাহকে টুকরা টুকরা করে দিয়েছিল। তাই এখানে জরুরি হচ্ছে, হিন্দুস্থানের ইতিহাস এমনভাবে আলোচনা করা, যেখানে হিন্দুস্থানের ওপর ব্রিটেনের কব্জা ও গ্রেট গেইমের ইতিহাস একসাথে আলোচিত হবে; যাতে আমরা বাস্তব অবস্থা খুব সহজেই বুঝতে সক্ষম হব।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্যবসার যুগ

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো থেকে সর্বশেষ ব্রিটেন হিন্দুস্থানে এসেছিল। ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ ১ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে হিন্দুস্থানে ব্যবসার পরিকল্পনা দেয়। ১৮১২ সালে এই কোম্পানি বাদশাহ জাহাঙ্গির থেকে অনুমতি নিয়ে হিন্দুস্থানে ব্যবসা শুরু করে। কোম্পানির প্রথম যুগকে ব্যবসার যুগ বলা হয়। এই কোম্পানি অনেক সাধারণভাবে ব্যবসা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে উন্নতি করে তাদের কারবার মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বাংলার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই জায়গাগুলোতে কোম্পানি নিজেদের ফেক্টরি বসায় ও গুদাম বানায়। এই ফেক্টরি ও গুদামগুলোকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজদের চৌকিদারের প্রয়োজন হয়। তাই বাদশাহের অনুমতিতে চৌকিদারের বাহিনী তৈরি করে, যাদেরকে সেই সময় 'সিপয়' (Sepoy) বলা হতো। এটা ছিল শাহি বাহিনীর একটি বিকৃত রূপ।

হিন্দুস্থানের ঐতিহাসিকরা একমত যে, বর্তমান পাকিস্তানি বাহিনীর সমস্ত ইউনিট ও রেজিমেন্টের শুরু এই চৌকিদার বাহিনী থেকেই হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে যখন কোম্পানির কাজ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তাদের কোম্পানিকে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক অংশের নাম প্রেসিডেন্সি (Presidency) রাখা হয়। মাদ্রাজের অংশকে 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি' যা ১৬৪০ সালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, বোম্বাইয়ের অংশকে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সি' যা ১৬৮৭ সালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং বাংলার অংশকে 'বাঙ্গাল প্রেসিডেন্সি' যা ১৬৯০ সালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। আস্তে আস্তে এই তিন প্রেসিডেন্সি নিজ নিজ বাহিনী বৃদ্ধি করে নিজেদের ঘাঁটিকে শক্তিশালী করা শুরু করে। অতঃপর যখন মোঘল বাদশাহরা দুর্বল হয়ে যায়, তখন এই প্রেসিডেন্সিগুলো সেই সুযোগে হিন্দুস্থান দখলের চক্রান্ত শুরু করে দেয়। সর্বশেষ হিন্দুস্থানের ওপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই চক্রান্ত শেষ হয়।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতন

মোঘলদের পতন ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব আলমগীর ﷺ-এর মৃত্যু থেকেই শুরু হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার ছেলে শাসনের অযোগ্য প্রমাণিত হয়। সে সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল না। ফলে মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যায়। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যারা পূর্বে মোঘলদের অধীনে ছিল, তারা আস্তে আস্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাদের গভর্নররা বাদশাহদের থেকেও বেশি শক্তিশালী হওয়া শুরু হয়। শুরুতে আলাদা তিনটি রাষ্ট্র জন্ম নেয়; যার মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য হিন্দুস্থানে হায়দারাবাদ, দাকান ও মিরাঠিরা প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর হিন্দুস্থানে অযোধ্যায় ছিল সাদাতুল মালিকের রাষ্ট্র। তবে সেই যুগে হিন্দুস্থানে এই বিশ্বাস খুব গভীরভাবে বদ্ধমূল ছিল যে, সেই ব্যক্তিই নবাব ও গভর্নর হতে পারবে, যাকে মোঘলরা নির্ধারণ করবে। যার ফলে মোঘলরা ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে হিন্দুস্থানের রাজনীতি এক নতুন দিকে চলা শুরু করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র মোঘল দরবারে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করা শুরু করে। মোঘলদের দরবারে সবচেয়ে বড় পদ ছিল আমিরুল উমারা। এই পদ দখলের জন্য এই রাজ্যগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। আমিরুল উমারা হওয়ার দ্বন্দ্ব ও নিজেদের সীমানা বৃদ্ধির রাজনীতি তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও দুর্বল করে দেয়। সেই সময় আরও একটি দাবিদার বৃদ্ধি পায়, তারা ছিল রোহিলখণ্ড রাজ্যের পাঠান নজিবুদ্দৌলা ও হাফিজ রহমত খান। এ ছাড়াও দিল্লির আশেপাশে 'জাঠ জাতি' শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং 'সূর্যমিল'-এর নেতৃত্বে দিল্লির মফস্বল এলাকাগুলোতে লুণ্ঠন করতে থাকে।

১৭৩৭ সালে মিরাঠিরা দিল্লিতে হামলা করে শাহি খাজানা লুটে নেয় এবং বাদশাহ থেকে নিজেদের ট্যাক্স মাফ করিয়ে চলে যায়। দিল্লি এই হামলা থেকে তখনও সামলে উঠতে পারেনি, এর মধ্যেই ইরানের বাদশাহ নাদের শাহ দিল্লিতে হামলা করে শাহি খাজানা লুণ্ঠন করে এবং বাদশাহ শাহজাহানের সিংহাসন নিজের সাথে নিয়ে যায়। ফিরে যাওয়ার সময় লাহোর পর্যন্ত নিজেদের সীমানার ভেতর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মিরাঠি ও নাদের শাহের এই হামলার ফলে মোঘল বাদশাহরা চূড়ান্তরূপে দুর্বল হয়ে যায়।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ ﷺ-এর কার্যক্রম

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ১৭০৩ সালে ইসলামের এক মহান বীরপুরুষ জন্ম নেন। যিনি ইতিহাসে 'শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি' নামে পরিচিত। শাহ সাহেব শুরুজীবনে পিতার কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং যুবক বয়সেই হজ করে আসেন। শিশুকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত তিনি দিল্লির দুরবস্থা লক্ষ করে আসছিলেন, যা দেখে কোনো আলিমে রব্বানির পক্ষে চুপ থাকা ছিল অসম্ভব। শাহ সাহেবও এই সমস্ত অবস্থা দেখে কাজের ময়দানে নেমে আসেন। তিনি এক পরিপূর্ণ কার্যপদ্ধতি বা মানহাজ তৈরি করেন, যার দুটি মৌলিক

অংশ ছিল। তার কার্যপদ্ধতির প্রথম অংশ ছিল হিন্দুস্থানের মুসলিমদের শক্তি যাতে দুর্বল না হয়ে যায়; তাই মোঘল বাদশাহদেরকে (যারা সেই সময় অনেক শরিয়াহবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলেও হিন্দুস্থানের মুসলিমদের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো) যেকোনোভাবে হোক সেই সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখা, যতক্ষণ না কোনো উপযুক্ত শরয়ি নেতৃত্ব সামনে আসে। তার কার্যপদ্ধতির দ্বিতীয় অংশ ছিল হিন্দুস্থানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে শরিয়াহর অনুগত করা। যেহেতু তিনি জানতেন, এই বিপ্লব এক-দুই বছরে সম্ভব নয়; তাই তার কার্যক্রম ছিল এই বিপ্লবের প্রথম ধাপ হিসেবে আলিমদের এমন একটি দল তৈরি করা, যারা জনগণ ও মুসলিমদের মধ্যে জিহাদের মানসিকতা জাগ্রত করবে। অতঃপর সেই জিহাদের বদৌলতে সমাজে পরিবর্তন সংঘটিত হবে।

এই কর্মপদ্ধতিতে কাজের জন্য তিনি দুটি জামাআত তৈরি করে শাসক ও আলিমদের ওপর আলাদাভাবে কাজ শুরু করেন। তার কার্যক্রমের প্রথম অংশ বাস্তবায়নের জন্য রোহিলার সর্দার নাজিবুদ্দৌলাকে রাজি করান যে, সে আফগানের শাসক আহমাদ শাহ আবদালিকে হিন্দুস্থানে হামলার আমন্ত্রণ জানাবে। যাতে মিরাঠি ও জাঠদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আবারও মোঘলদের শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এই লক্ষ্যে তারা নিজেই আহমাদ শাহ আবদালির কাছে চিঠি লিখেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও নাজিবুদ্দৌলার প্রচেষ্টার ফলে ১৭৬১ সালে আহমাদ শাহ আবদালি তার বাহিনী নিয়ে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মিরাঠি বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। যার ফলে মধ্য ও পূর্ব হিন্দুস্থানের মধ্যে তাদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। সামনে এগিয়ে আহমাদ শাহ দিল্লি পৌঁছে যান এবং মোঘল বাদশাহ শাহ আলমকে দিল্লি ডেকে পাঠান, যে তখন ইলাহাবাদে ছিল। যাতে সে দিল্লিতে এসে আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এটা ছিল মোঘলদের শক্তিশালী হওয়ার সর্বশেষ সুযোগ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাদশাহ দিল্লিতে আসেননি এবং এভাবেই ঐতিহাসিক এই সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

ইংরেজদের বাংলা দখল

শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও নাজিবুদ্দৌলা এবং আহমাদ শাহ আবদালি যখন মিরাঠিদের শক্তিকে নিঃশেষ করার জিহাদে লিপ্ত ছিলেন, তখন দিল্লি ও পানিপথের ময়দানের বহুত দূরে বাংলার রাজনীতি একটি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। ইংরেজরা—যারা ব্যবসার জন্য হিন্দুস্থানে এসেছিল, এখন তারা বাংলার বাদশাহ থেকে ট্যাক্স মাফ করিয়ে নেয়, সেই সাথে তাদের দুর্গে সেনা ও তোপ বৃদ্ধির অনুমতি মঞ্জুর করিয়ে নেয়। কিন্তু বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা বাদশাহর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তাই নবাব সিরাজ ইংরেজদের এই অনুমতির ভিত্তিতে কাজ করা থেকে বাধা দেয়। কিন্তু ইংরেজরা সিরাজের বাধার কোনো পরোয়াই করেনি। তাই সিরাজ কলকাতায় ইংরেজদের কেল্লা ফোর্ট উইলিয়ামের ওপর হামলা করে সেখানে থাকা সকল ইংরেজকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসে। রবার্ট ক্লাইভ যে

মাদ্রাজ বাহিনীতে ক্লার্ক হিসেবে ভর্তি হয়েছিল, সে তখন উন্নতি করে কর্নেলের পদে উপনীত হয়ে গেছে। সে এই সমস্ত বন্দীকে ছাড়ানোর জন্য মাদ্রাজ থেকে তিন হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়। সে ভালো করেই জানত, এই বাহিনী কখনোই বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে না। তাই তার একটি গাদ্দার প্রয়োজন ছিল, যে প্রয়োজন মীর জাফর পূরণ করে দেয়। ক্লাইভ তাকে লোভ দেখায় যে, যদি সে সিরাজের পরিবর্তে ইংরেজদের সাহায্য করে, তাহলে তারা তাকে বাংলার নবাব বানিয়ে দেবে। মীর জাফর এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়।

১৭৫৭ সালে পলাশি অঞ্চলে ইংরেজ ও সিরাজের বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবিলা হয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন সিরাজ মীর জাফরকে ঘোড়-সওয়ার বাহিনী নিয়ে হামলার আদেশ দেয়, তখন সেই গাদ্দার হামলার পরিবর্তে যুদ্ধের ময়দান থেকে বাহিনী নিয়ে চলে যায়। যার ফলে সিরাজের বাহিনীর নেতৃত্ব টলে যায়। এই অবস্থা দেখে সিরাজ নিজেই পলায়ন করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার নবাব বানায় ঠিকই, কিন্তু তার ওপর যুদ্ধের বিশাল খরচ বহনের বোঝা চাপিয়ে দেয়, যা সে আদায় করতে সক্ষম ছিল না। তাই সে জনগণের ওপর মোটা অঙ্কের ট্যাক্স বসিয়ে দেয়, যার ফলে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। একদিকে জনগণ মারা যাচ্ছিল, অপরদিকে জাফর আরও ট্যাক্স বাড়াচ্ছিল। যার ফলে জনগণ একসময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর এই সুযোগ নিয়ে তার জামাতা মীর কাসেম তার সিংহাসন উলটে দিয়ে বাংলার নবাব হয়ে যায়। জাফর পলায়ন করে ইংরেজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। অন্যদিকে মীর কাসেম তার বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ও বাদশাহ শাহ আলমের কাছে সাহায্য চায়।

১৭৬৪ সালে বক্সারের ময়দানে শাহ আলম ও ইংরেজদের বাহিনীর মোকাবিলা হয়। শাহ আলম বক্সারের ময়দানে পরাজিত হয়। অতঃপর ইংরেজ ও শাহ আলমের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেখানে বাদশাহ ইংরেজদের পূর্ণরূপে বাংলার ক্ষমতা প্রদান করে। যার অর্থ ছিল ইংরেজরা এখন বাংলার শাসক হয়ে গেছে। বক্সার যুদ্ধ হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত মোড়ই ছিল না; বরং এই যুদ্ধ বৈশ্বিকভাবে পশ্চিমাদের উত্থানের জন্যও একটি শক্তিশালী সিঁড়ি হিসেবে পরিগণিত হয়।

বক্সার যুদ্ধের পর হিন্দুস্থানের অবস্থা

বক্সার যুদ্ধ হিন্দুস্থানের ওপর অনেক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বাংলার শাসক হওয়ার অর্থ এই ছিল যে, এখন ইংরেজরা সেখানে নিজেদের আইন-বিধান বাস্তবায়ন করা, মানুষকে শাস্তি দেওয়া, স্বাধীন ব্যবসা করা এবং ট্যাক্স উসুলের ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছে। এর পূর্বে যেহেতু বাংলায় শরিয়াহ বাস্তবায়িত হতো এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা হতো; বাংলার বাণিজ্যের সমস্ত নীতিমালা জনগণের ফায়দার জন্য বানানো হয়েছিল; তাই এই নীতিগুলোর

দ্বারা ইংরেজদের কোনো উপকার হচ্ছিল না। ফলে তারা সেই নীতিগুলো পরিবর্তন করে বাংলায় নিজেদের পূর্ণ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে এবং হিন্দুস্থানে ইংরেজদের আইন বাস্তবায়ন শুরু করে দেয়। এর মাধ্যমে ইংরেজরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলমান যুদ্ধের নতুন একটি পক্ষ হয়ে যায়।

হিন্দুস্থানে ইংরেজদের কার্যক্রম

ইংরেজরা কখনোই সর্বদা হিন্দুস্থানি হয়ে থেকে যাওয়ার কল্পনা করেনি। যদি করেও থাকে, তাহলে হিন্দুস্থানের চলমান জিহাদি আন্দোলন তাদেরকে সর্বদা এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করত যে, তাদেরকে অবশ্যই একদিন এই রাষ্ট্র থেকে বের হতেই হবে। তাই তাদের কাজ ছিল হিন্দুস্থান থেকে অধিক থেকে অধিক সম্পদ নিয়ে যাওয়া। ইংরেজদের মূল লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব হিন্দুস্থানের কাঁচামাল ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে পণ্য উৎপাদন করা। অতঃপর পুরো দুনিয়ার বাজারগুলোতে সেই উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বিশ্ববাণিজ্যে হিন্দুস্থানের ঠিকাদারি শেষ করে ব্রিটেনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজরা এটা ভালো করেই জানত যে, তারা যখন এমনটা করবে, তখন হিন্দুস্থানের শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে; ফলে হিন্দুস্থানে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিরোধিতা শুরু হবে।

অপরদিকে ইংরেজরা দেখছিল যে, এখন হিন্দুস্থানের রাজনীতির মধ্যে দুটি দল হয়ে গেছে। একটি ইংরেজদের সাহায্যকারী ও অপরটি তাদের শত্রু। ইংরেজদের সাহায্যকারী দলে ছিল কার্নাটাকার নবাব মুহাম্মাদ আলি, হায়দারাবাদের নিজাম, অযোধ্যার নিজাম সুজাউদ্দৌলা ও তার ছেলে আজাদ আলি খান। ইংরেজদের বিরোধীদের মধ্যে ছিল মহিশুরের নবাব হায়দার আলি ও তার ছেলে টিপু সুলতান, রোহিলখণ্ডের নবাব নজিবুদ্দৌলা এবং মিরাঠিরা। মিরাঠিরা ইংরেজদের বিরোধী হওয়ার পাশাপাশি মহিশুর ও রোহিলখণ্ডেরও বিরোধী ছিল।

হিন্দুস্থানে ইংরেজ বাহিনীর গঠন

এই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ইংরেজদের সেই সময়ের জেনারেল লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হ্যাস্টিংস সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের এমন একটি বাহিনী প্রয়োজন, যাদেরকে হিন্দুস্থানের সাধারণ জনগণ থেকে গঠন করা হবে। তাদের বৈশিষ্ট্য হবে যে, তারা কোনো ধর্মের আদর্শ ছাড়াই যুদ্ধ করবে এবং তাদের জান কুরবান করবে। পাশাপাশি ইংরেজরা যখন কোনো আইন পরিবর্তন করবে, তখন কেন এটা করছে, তা চিন্তা করার সক্ষমতা সেই সিপাহিদের মধ্যে থাকতে পারবে না। এই আইন পরিবর্তনের ফলে ইংরেজদের কী ফায়দা ও হিন্দুস্থানের কী ক্ষতি, তা চিন্তা করতে পারবে না। সেই সিপাহিরা শুধু এই চিন্তাই করবে যে, তাদের কাজের দ্বারা তাদের কী লাভ অর্জিত হবে?

সেই সাথে সিপাহিরা ইংরেজদের পূর্ণ ওয়াফাদার হবে। কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াই যুদ্ধ কীভাবে হবে এবং আঞ্চলিক জনগণের ওয়াফাদারি কীভাবে অর্জন করবে? এই প্রশ্নের জবাবে ইংরেজদের বক্তব্য ছিল, যদি কোনো সিপাহি ইংরেজদের ওয়াফাদার হয়, তাহলে তাকে বাহিনীতে প্রমোশন দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাহিনীর উঁচু পদে অধিষ্ঠিত করা হবে। মূলত তাদেরকেই পেশাদার ভাড়াটে সিপাহি বলা হয়; বরং সঠিক শব্দে তাদেরকে পেশাদার ভাড়াটে হত্যাকারী বলা যায়। এটাই ছিল পরবর্তী উপমহাদেশের বাহিনীর আদর্শিক চিন্তাগত ভিত্তি। ইংরেজদের প্রতি সর্বদা ওয়াফাদার বানানোর জন্য লর্ড ক্লাইভ ও হ্যাস্টিংস যেই থিউরি পেশ করে, তার নাম ছিল 'ওয়াফাদারির পরিবর্তে ভূমি।' যার অর্থ ইংরেজদের ওয়াফাদার হলে বড় বড় জায়গির দেওয়া হবে। যার ফলে এমন এক শ্রেণি আপনাআপনিই তৈরি হয়ে যায়, যারা ইংরেজদের বিশ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি বাহিনীর সদস্য হিসেবে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করবে।

এটিই সেই মৌলিক চিন্তাধারা, যার ভিত্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গুদাম ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলো রক্ষার আঞ্চলিক চৌকিদার তিনটি বাহিনী গঠন করা হয়। সেই তিন বাহিনী ছিল বাংলার বাহিনী, মাদ্রাজের বাহিনী ও বোম্বাইয়ের বাহিনী। এই তিন বাহিনীতেই পদাতিক, ঘোড়-সওয়ার ও তোপ নিক্ষেপকারী সেনা ছিল। শুরুতে ইংরেজদের পলিসি ছিল যে, প্রত্যেক এলাকা থেকেই সেখানের আঞ্চলিক লোকদের ভর্তি করা হবে। যার ফলে বাংলার বাহিনীতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলিম ও হিন্দুরা ছিল। তেমনিভাবে মাদ্রাজের বাহিনীতে দক্ষিণ হিন্দের মুসলিম ও হিন্দুরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বোম্বাইয়ের বাহিনীতে মিরাঠি, সিন্ধ ও বেলুচ মুসলিম ও হিন্দুরা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাদ্রাজের বাহিনী পলাশি, বক্সার ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলা বিজয় ও টিপু সুলতানের পরাজয়ের ক্ষেত্রে মাদ্রাজের বাহিনীরই মূল ভূমিকা ছিল। ১৭৫৯ সালে উপকূল রক্ষার জন্য মাদ্রাজের বাহিনীকে তিনটি ব্যাটালিয়নে ভাগ করা হয়েছিল, যা নতুন গঠনের পর মাদ্রাজের স্থানীয় বাহিনীতে পরিণত হয়। ১৭৯৮ সালে 'মাসুলি পিতমে' আরও একটি ব্যাটালিয়ন বানানো হয়, যাকে মাক্লাউডের প্লাটুন বলা হতো।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধে হিন্দুস্থানি বাহিনীর বিদ্রোহের পর ইংরেজরা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি (শাহি হিন্দুস্থানি বাহিনী) নামে একটি বাহিনীকে নতুনভাবে গঠন করে। উপকূলীয় ব্যাটালিয়নগুলোতে মাদ্রাজের আঞ্চলিক সেনাদের পরিবর্তে পাঞ্জাব ও পাঠান সেনাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৯০৩ সালে 'লর্ড কিচেনার' রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে নতুনভাবে সজ্জিত করে। সে উপকূলীয় রেজিমেন্টের পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নকে পাঠান রেজিমেন্টে পরিবর্তন করে দেয়। ১৯২২ সালে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে দ্বিতীয়বার নতুনভাবে সাজানো হয় এবং পাঞ্জাব ও পাঠান ব্যাটালিয়নকে মিলিত করে ১ম, ২য়, ৮ম, ১৪তম, ১৫তম ও ১৬তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বানানো হয়। অপরদিকে মাক্লাউডের প্লাটুনকে বোম্বাইয়ের বেলুচ

ব্যাটালিয়নের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২২ সালের নতুন গঠনে বেলুচ ব্যাটালিয়নকে ১০ম বেলুচ রেজিমেন্ট বানিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনীর গঠন এমনভাবে হয়েছিল, যেখানে উল্লেখিত ১ম, ১৪তম, ১৫তম ও ১৬তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে মিলিত করে পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বানানো হয়। আর ১০ম বেলুচ ও ১৮তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট মিলিয়ে পাকিস্তানের ১৮তম বেলুচ রেজিমেন্ট বানানো হয়। যার ফলে পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জন্ম ইংরেজদের মাদ্রাজ ফৌজ থেকেই হয় এবং বেলুচ রেজিমেন্টের জন্ম মাদ্রাজ ও বোম্বাই রেজিমেন্ট থেকে হয়।

সময় পার হওয়ার সাথে সাথে বাংলার বাহিনীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বাংলার বাহিনী বিহার, অযোধ্যা, দিল্লি, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাব বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই বাংলার বাহিনীই ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ করে। কিন্তু এই বাহিনীরই অপর অংশ 'গাইড কোর' ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে এই বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই 'গাইড কোর' থেকেই পাকিস্তানের ফ্রন্টায়ার ফোর্স রেজিমেন্ট জন্ম নেয়। বোম্বাইয়ের বাহিনী সিন্ধ ও বেলুচ বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক বাহিনী, পরিভাষায় যাকে 'আর্মার্ড কোর' বলা হয়—এর সকল রেজিমেন্টকে বোম্বাই, বাংলা ও মাদ্রাজের ঘোড়-সওয়ার ব্যাটালিয়ন থেকে বানানো হয়েছিল।

ইংরেজদের রোহিলখণ্ড বিজয়

১৭৭২ সালে মারাঠিরা রোহিলখণ্ডের ওপর হামলা করে। হাফিজ রহমাতুল্লাহ খান সুজাউদ্দৌলার সাহায্যে মারাঠিদের পরাজিত করে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন নিয়ে সুজাউদ্দৌলা ও হাফিজ রহমত খানের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়। যার ফলে ১৭৭৪ সালে সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের সাথে মিলে রোহিলখণ্ডের ওপর হামলা করে। এই যুদ্ধে হাফিজ রহমাতুল্লাহ শহিদ হয় এবং রোহিলখণ্ডকে ইংরেজ ও সুজাউদ্দৌলা পরস্পর ভাগ করে নেয়। যার ফলে হিন্দুস্থানে মুসলিমদের আশার আরও একটি বাতি নিভে যায়।

মহিশুরের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ

রোহিলখণ্ডের পর পুরো হিন্দুস্থানে শুধু দক্ষিণ হিন্দের মহিশুরের বাদশাহ হায়দার আলি ও তার ছেলে ফাতেহ আলি টিপু হিন্দের মুসলিমদের সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে টিকে ছিল। কিন্তু শুধু ইংরেজরাই নয়; বরং মিরাঠি এবং হায়দারাবাদের নিজামও মহিশুরের ভূমির ওপর লোভের দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। ১৭৬৩ সালে হায়দারাবাদের নিজাম ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার চুক্তি করে। ১৭৬২ সালের সেপ্টেম্বরে এই চুক্তির অধীনে নিজাম ও মিরাঠিরা ইংরেজদের সাথে মিলে মহিশুরের ওপর হামলা করে। যার ফলে ইংরেজ-মহিশুরের মাঝে ধারাবাহিক যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রথম যুদ্ধে হায়দার আলি ইংরেজ জোটকে চরমভাবে পরাজিত করে। ১৭৬৯ সালে ইংরেজ ও হায়দার আলির মাঝে একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তিতে একে অপরের এলাকাতে হামলা না করার সন্ধি করে এবং বিপদে একে অপরকে সাহায্যের চুক্তি করে।

১৭৮০ সালে দ্বিতীয় ইংরেজ-মহিশুর যুদ্ধ হয়, যা চার বছর চলমান ছিল। যেখানে ইংরেজরা আরও একবার পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে হায়দার আলি অসুস্থতার ফলে মারা যান। হায়দার আলির পরে তার সন্তান টিপু নিজ যোগ্যতায় সুলতান হন। ১৭৮৪ সালের ১৪ এপ্রিলে টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মাঝে একটি চুক্তি হয়। যেখানে ইংরেজরা চরম অপদস্থতার শর্তে স্বাক্ষর করে। ইংরেজদের তখনকার গভর্নর এই চুক্তির আলোচনা করে লিখে, এই চুক্তি ছিল ইংরেজদের জন্য লাঞ্ছনাকর এবং যতদিন টিপু সুলতান জীবিত থাকবে, ততদিন ইংরেজরা হিন্দুস্থান বিজয় করতে পারবে না।

১৭৮৯ সালে টিপু সুলতান ত্রিকুটের ওপর হামলা করে। ত্রিকুটের রাজা ইংরেজদের পক্ষে ছিল। ইংরেজরা এই যুদ্ধে বাহিনী পাঠিয়েছিল। এটা ছিল তৃতীয় ইংরেজ-মহিশুর যুদ্ধ, যা তিন বছর চলমান থাকে। ১৭৯২ সালে টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মাঝে একটি চুক্তি হয়। এরপর ইংরেজরা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, টিপুকে পরাজিত করার জন্য মহিশুর বাহিনীতে তাদের এক গাদ্দারের প্রয়োজন। সর্বশেষ মীর সাদেক নামের এক গাদ্দার পেয়ে যায়, যে ছিল সুলতানের নায়েব।

১৭৯৮ সালে চতুর্থ ইংরেজ-মহিশুর যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৯৯ সালের ৪ মে সারেঙ্গার যুদ্ধে মীর সাদেক গাদ্দারি করে। সে সারেঙ্গা পিতম দুর্গের দুর্বল অংশ ইংরেজদেরকে চিহ্নিত করে দেওয়ার পাশাপাশি বেতন উসুলের বাহানায় সেখানের ডিউটিরত সিপাহিদের সরিয়ে দেয়। ইংরেজ বাহিনী কেল্লার মধ্যে প্রবেশের পর টিপু সুলতান দুর্গের বাইরে বের হয়ে হামলা করে বসেন। যখন তার কাছে হাতিয়ার ফেলে দেওয়ার কথা বলা হয়, তখন তিনি এই ঐতিহাসিক কথাটি বলেন, 'শিয়ালের মতো হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা উত্তম।' টিপু সুলতান শহিদ হয়ে যান এবং তার সাথে হিন্দের মুসলিমদের আশার সর্বশেষ প্রদীপটিও নিভে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে হিন্দুস্থানে বাদশাহ আলমগীরের মজবুত হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু এই শতকের শেষে উত্তর হিন্দে হাফিজ রহমাতুল্লাহর শাহাদাত ও রোহিলার পরাজয় এবং দক্ষিণ হিন্দে টিপু সুলতানের শাহাদাত ও মহিশুরের পতনের মাধ্যমে সেই মজবুত ইসলামি হুকুমতের যুগ শেষ হয়। নবাব ও আমিরুল উমারা হওয়া এবং নিজেদের রাষ্ট্রকে বড় করার জন্য যারা ইংরেজদের সাথে ছিল, একেক করে তারা ইংরেজদের গোলামে পরিণত হতে থাকে। মোঘল বাদশাহ শাহ আলম ইংরেজদের বেতনভুক্ত কর্মচারীর মতো হয়ে যায়। হায়দারাবাদের নিজাম অযোধ্যার নবাব এবং মিরাঠের বাহিনী পূর্ণভাবে ইংরেজদের সামনে আত্মসমর্পণ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক অবস্থার আরও একটি দিক পরিবর্তন হয়। তখন বাংলা থেকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত এবং মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই পর্যন্ত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ইংরেজরা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। অপরদিকে পশ্চিম হিন্দুস্থানে রণজিৎ সিং শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। যেখানে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হাজারা, পেশওয়ার, মার্দান ও ডেরা ইসমাইল খানের এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দের মুসলিমদের কোনো প্রভাবশালী শক্তি ছিল না। দিল্লির হুকুমত ছিল বাদশাহর; কিন্তু বিধান চলত কোম্পানির। এই সব অবস্থায় দিল্লির একদল আলিম তাদের বুড়ো কমান্ডারের নেতৃত্ব পর্যবেক্ষণ করছিল। তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ ﷺ-এর সন্তান আলিমে রব্বানি আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলবি ﷺ। যিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পিতার চিন্তাধারা অনুযায়ী এমন এক বাহিনী প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন, যারা একদিকে আবারও জিহাদের ময়দানে ইংরেজ শক্তির মোকাবিলা করবে। অপরদিকে সমাজ সংশোধনের দ্বারা সমস্ত শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারকে দূর করবে। তৃতীয় দিক থেকে মুসলিমদের জন্য এমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, যেই নেতৃত্ব (শাহ সাহেবের ভাষায়) সমস্ত পথভ্রষ্ট ও কাফির বাদশাহ, যারা নিজেদের স্বার্থে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে মিলে লড়াই করত, তাদের হটিয়ে সেই স্থানে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করবে।

শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর ঐতিহাসিক ফতোয়া (১৮০৬ খ্রি.)

শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ১৮০৬ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ফতোয়া প্রকাশ করেন, যা ছিল হিন্দুস্থান অঞ্চলের শরয়ি অবস্থান পরিবর্তনের ঘোষণা। তিনি সেই ফতোয়ায় হিন্দুস্থানকে দারুল ইসলামের পরিবর্তে দারুল হরব ঘোষণা করেন। তিনি পরিস্থিতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝে শরয়ি মানদণ্ড মুতাবিক কোনো ভয়-ভীতি ছাড়াই শরিয়াহর হুকুম স্পষ্ট বর্ণনা করেছিলেন। অতঃপর শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না; বরং ফতোয়ার ভিত্তিতে যে শরয়ি হুকুম স্পষ্ট হয়েছে, তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন।

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলবি ﷺ-এর ফতোয়া নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রশ্ন : দারুল ইসলাম কি দারুল হরব হতে পারে?

এর জবাবে তিনি বলেন :

> গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলোতে এমন বর্ণনা এসেছে যে, যখন তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে, তখন দারুল ইসলাম দারুল হরব হয়ে যাবে।
>
> 'দুররুল মুখতারে এসেছে :
>
> "তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে দারুল ইসলাম দারুল হরব হয়ে যাবে :

১. সেখানে কাফিরদের বিধান বাস্তবায়িত হলে।

২. দারুল ইসলাম দারুল হরবের সাথে মিলিত হলে।

৩. সেখানের কোনো মুসলিম নিরাপদে না থাকলে, পাশাপাশি সেখানে এমন কোনো জিম্মি কাফির না থাকলে, যে পূর্বে মুসলিমদের থেকে নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করত এবং এখনো সে উক্ত আশ্রয়ের ফলেই বসবাস করতে পারছে।

অন্যদিকে দারুল হরব তখন দারুল ইসলাম হয়, যখন মুসলিমদের বিধান সেখান বাস্তবায়িত হয়।”

আল-কাফিতে বর্ণিত আছে,

“দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই শহর, যেখানে মুসলিমদের ইমামের হুকুম প্রচলিত রয়েছে এবং যা তার কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছে। দারুল হরব দ্বারা সেই শহর উদ্দেশ্য, যেখানে কাফির শাসকের বিধান প্রয়োগ হচ্ছে এবং যা তার কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছে।”

(অতঃপর শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ লিখেন)

হিন্দুস্থানের মধ্যে মুসলিমদের ইমামের হুকুম কোনোভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না; বরং এখানে খ্রিষ্টান শাসকদের আইন পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কুফুরি হুকুম প্রচলনের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাষ্ট্রের মামলা-মুকাদ্দামা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, উশর-খারাজ, ব্যবসায়িক সম্পদে কাফির প্রশাসন ক্ষমতাশীল হয়ে গেছে এবং ডাকাত ও চোরদের শাস্তি, জনগণের পারস্পরিক লেনদেন এবং অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে কাফিরদের বিধান প্রচলিত।

যদিও কিছু ইসলামি বিধান যেমন জুমআ, ইদ, আজান, কুরবানির ক্ষেত্রে কাফিররা বাধা দেয় না; বরং এই বিষয়গুলোতে মূলত তাদের কোনো বাধা দেওয়ার প্রয়োজনও নেই। তবে তারা কোনো বাধা ছাড়াই মসজিদ ধ্বংস করে দিতে পারে, তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো মুসলিম বা জিম্মি এখানে বসবাস করতে পারে না। তারা নিজেদের স্বার্থে মুসাফির বা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করে না; কিন্তু অন্যান্য আমির যেমন সুজাউল মালিক ও বেলায়েতি বেগম তাদের অনুমতি ছাড়া নিজ শহরেও যেতে পারে না। দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রিষ্টানদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যদিও ডানে-বামে হায়দারাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও রামপুরে তাদের হুকুম জারি নয়। কারণ সেখানের গভর্নররা তাদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছে এবং কাফিরদের আনুগত্য গ্রহণ করে নিয়েছে।

হাদিস, সাহাবা ও খুলাফাদের মত থেকে এমনটাই বোঝা যায় যে, হিন্দুস্থান এই অবস্থায় দারুল হরব। কেননা, সিদ্দিকে আকবারের সময়ে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, ‘বনি ইয়ারবু’ দারুল হরব। কারণ সেখানের লোকেরা জাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছে; যদিও সেখানে

জুমআ, ইদ ও আজান আপন অবস্থায় চলমান ছিল। এমনিভাবে তাদের চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলগুলোকেও দারুল হরব ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল; যদিও সেগুলোতে মুসলিমরা ছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়ে এই পদ্ধতিই চলমান ছিল। এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, ফাদাক ও খাইবার দারুল হরব; যদিও সেখানে মুসলিমদের ব্যবসা চলমান ছিল এবং সেখানে কিছু মুসলিমদের বসবাস ছিল। তা ছাড়া ফাদাক ও খাইবার মদিনার একেবারেই নিকটবর্তী ছিল। (তথাপি রাসুল ﷺ সেগুলোকে দারুল হরব ঘোষণা করেছেন)।[৪৬]

ফতোয়ার প্রভাব

শাহ আব্দুল আজীজ ﵀-এর ফতোয়া হিন্দুস্থানের মুসলিমদেরকে দুই ধরনের দিক-নির্দেশনা দেয়। প্রথম নির্দেশনা এই ফতোয়ার মূল ইবারত থেকে পাওয়া যায়। তা হলো, এখন হিন্দুস্থানের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এটি দারুল ইসলাম থেকে দারুল হরব হয়ে গেছে। দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো, ফতোয়া মুতাবিক সেই সব কার্যক্রম, যা আব্দুল আজীজ ﵀ জিহাদ সংঘটিত করার জন্য করেছিলেন। অর্থাৎ এই দারুল হরবকে আবার দারুল ইসলাম বানানোর কার্যক্রমের সূচনা। উপমহাদেশের মুসলিমদের সেই অধঃপতনের যুগে শাহ আব্দুল আজীজ ﵀-এর ফতোয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের নিকট আজও সেই ফতোয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা সেই যুগে ছিল। এই ফতোয়া আমাদেরকে শরিয়াহর ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও চিন্তাগত দিক-নির্দেশনা দেয়। এই ফতোয়ার গুরুত্ব অনুধাবনে আমরা এখানে ফতোয়া থেকে গৃহীত নির্দেশনাগুলো পয়েন্ট আকারে বিস্তারিত আলোচনা করব।

- এই ফতোয়ার প্রথম নির্দেশনা, সেই সময় হিন্দুস্থানের পরিস্থিতির শরয়ি সমাধান ছিল, যার কারণে এই ফতোয়ার জরুরত অনুভূত হয়। এই ফতোয়া দেওয়ার সময় যদিও হিন্দুস্থানের মোঘল বাদশাহ মুসলিম ছিল; কিন্তু পূর্ব হিন্দ থেকে মধ্য হিন্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা পূর্ণভাবে ইংরেজদের দখলে ছিল। মধ্য হিন্দের অধিকাংশ রাজ্য তাদের সাথে সন্ধি করে রেখেছিল। শাহ সাহেব হিন্দের এই দুই ধরনের এলাকার আলোচনা করেছেন। এক. সেই এলাকা, যা কাফিরদের সরাসরি দখলে রয়েছে এবং দুই. যেগুলো পরোক্ষ দখলে রয়েছে। অতঃপর এই দুই প্রকারের এলাকাকেই ইংরেজদের নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে দারুল হরব ঘোষণা করা হয়েছে। ফতোয়াটি আজও আমাদের জন্য একই দিক-নির্দেশনা দেয়।

- এই ফতোয়ায় শাহ সাহেব 'ইংরেজ' নয়; বরং 'খ্রিষ্টান জাতি' বলেছেন এবং তাদেরকে হিন্দুস্থানে মুসলিমদের শত্রু ঘোষণা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে শাহ সাহেব ﵀ আল্লাহ

৪৬. ফাতাওয়ায়ে আজীজি : ১/৩৫।

তাআলার জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতার বিশ্বাসের দিকে নির্দেশনা দিয়েছেন, যাকে 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'র[৪৭] আকিদা বলা হয়। এই আকিদাই গত এক শতাব্দী যাবৎ হিন্দুস্থানের বাদশাহ ও জনগণের মধ্যে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে মুসলিমরা ইংরেজদের সাথে মিলে নিজের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

- হিন্দের মুসলিমদের প্রতি তৃতীয় নির্দেশনা, যা এই ফতোয়াতে রয়েছে তা হলো, কখনোই কাফিরদের আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়। যে সমস্ত মুসলিম অঞ্চল কাফিররা দখল করেছে, তা দারুল হরব হয়ে যাবে; যদিও সেখানে কিছু ইসলামি বিধান আদায় করা হোক এবং সেখানের কিছু নেতার নাম মুসলিম হোক।

এগুলো ছিল ফতোয়ার মূল মর্ম। এ ছাড়াও আরও কিছু বিষয় সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে বোঝা যায়, যা এই ফতোয়ার নির্দেশনায় সংঘটিত হয়েছিল এবং যার আলোচনা আমরা সামনে করব, ইনশাআল্লাহ।

শাহ সাহেবের ফতোয়া ও হিন্দের আজাদি আন্দোলন শুরু

হিন্দের ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত যে, শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর ফতোয়া ছিল হিন্দুস্থানকে ইংরেজদের থেকে আজাদ করে আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদের ভিত্তি। এটা ছিল সেই ছায়াদার বৃক্ষের শিকড়, যার ছায়াতলে হিন্দের সমস্ত ইমানদার মুসলিম নিজেদের ইমান বাঁচানো ও দ্বীন বিজয়ের চেষ্টায় অংশ নেয়। ঐতিহাসিকরা এই ব্যাপারেও একমত যে, এই ফতোয়া সাধারণ মুসলিম ও আলিমদের সকল শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এই ফতোয়ার পর হিন্দের মুসলিমদের সমস্ত সামাজিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হয়ে যায় হিন্দকে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে পরিবর্তন করা। এই ফতোয়াকে সামনে রেখে দিল্লির আলিম সাইয়িদ আহমাদ শহিদ, শাহ ইসমাইল শহিদ ও মাওলানা আব্দুল হাই ﷺ এবং পাঠনার আলিম মাওলানা বেলায়েত আলি ও এনায়েত আলি ﷺ জিহাদ করেছেন। ১৮৫৭ সালে আজাদির যুদ্ধে আকাবিরে দেওবন্দ মাওলানা কাসেম নানুতুবি এবং মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি ﷺ-এর কার্যক্রমও এই লক্ষ্যেই হয়েছিল। আজিমাবাদের আলিম মাওলানা ইয়াইহয়া আলি, মাওলানা জাফর থানেশ্বরি, মাওলানা আহমাদ আলি ﷺ আন্দামানে বন্দিত্বের কষ্টও এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বরদাশত করেছেন। উত্তর কাবায়েলি এলাকায় মোল্লা সাহেব আখন্দ ও হাজি সাহেব তরংজায়ি ﷺ-এর জিহাদ, ওয়াজিরিস্তানের মোল্লা পাওয়েন্দা এবং হাজি মির্জা আলি খান

৪৭. এর জন্য শরিয়তে 'আল-হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগজু ফিল্লাহ'র পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। আমাদের উপমহাদেশে এই আকিদা 'মুওয়ালাত ওয়া মুআদাত' হিসেবে পরিচিত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো মুসলিম তার রব, তার রাসুল এবং সমস্ত আহলে ইমানের সাথে—তাওহিদের আকিদার ভিত্তিতে—বন্ধুত্ব, মহব্বত ও সাহায্যের সম্পর্ক রাখে। অন্যদিকে কাফিরদের সাথে তার সম্পর্ক হয় ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতার। এই আকিদা তাওহিদের আবশ্যকীয় চাহিদা।

ﷺ-এর জিহাদও এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই ছিল। হিন্দুস্থানকে ইংরেজদের থেকে স্বাধীন করার জন্য তাহরিকে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ও মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি ﷺ-এর ইংরেজদের 'বন্ধুত্ব ত্যাগের আন্দোলন' এই উদ্দেশ্যেই ছিল। হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবি ও আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানি ﷺ-এর পাকিস্তান আন্দোলন এবং মাদানি ﷺ-এর ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্থানের মতামত—এই সবই হিন্দকে কাফিরদের থেকে মুক্ত করা ও এটাকে দারুল ইসলাম বানানোর জন্য ছিল। হিন্দের মুসলিমদের এই সমস্ত সামষ্টিক চেষ্টায় উক্ত ফতোয়ার ও এর ফলে সংঘটিত কার্যক্রমের প্রভাব অনেক বেশি দৃষ্টিগোচর হয়।

শাহ সাহেব ﷺ-এর কার্যক্রম

শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং দারুল হরবকে আবার দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য কার্যক্রম শুরু করেন। শাহ সাহেব ﷺ-এর নিকট দারুল হরবকে দারুল ইসলামে পরিবর্তন করার একমাত্র পদ্ধতি ছিল নিজ ঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য হিজরত করা এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ও শাহ ইসমাইল শহিদ ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদ ছিল এই ফতোয়ারই বাস্তবায়ন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে সমস্ত মুসলিম দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমস্ত ইসলামি জিহাদ ও জামাআতের পেছনে মৌলিক চিন্তা এটাই ছিল যে, হিন্দুস্থান দখলদারদের কব্জায় চলে গেছে; তাই এখন মুসলিমদের হুকুমত আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ফলে এই ফতোয়া ছিল সমস্ত ইসলামি জিহাদ ও জামাআতের মূল ভিত্তি। স্যার সাইয়িদের থিউরি, কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা নয়; বরং হিন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎস ছিল এই ফতোয়াই।

সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﷺ-এর তাহরিকে মুজাহিদিন এবং জিহাদি বৃক্ষের অঙ্কুর

তাহরিকে মুজাহিদিন উলামায়ে হক ও মুজাহিদদের সেই বাহিনী ছিল, যাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর কর্মপদ্ধতিতে হিন্দকে আবারও দারুল ইসলাম বানানোর জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল উপমহাদেশের পাক ও হিন্দ থেকে ইংরেজদের বের করা এবং দ্বীন বিজয়ের জিহাদে শক্তিশালী খুঁটি। যা উপমহাদেশের সমস্ত মুসলিমের চিন্তাকে সঠিক দিকে পরিচালিত করে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদে এনে দাঁড় করিয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে পাক ও হিন্দের দ্বীনি মাকতাবায়ে ফিকিরগুলো এই বৃক্ষেরই শাখা। চাই তা মাওলানা কাসেম নানুতুবি ﷺ-এর দেওবন্দ মাকতাবায়ে ফিকির হোক বা মাওলানা জাফর থানেশ্বরি ﷺ-এর আহলে হাদিস মাকতাবায়ে ফিকির হোক। চাই তা কাবায়েলের ইংরেজবিরোধী জিহাদ হোক, যা এখনো পর্যন্ত সেই একই ধারায় চলমান রয়েছে। এই সবের মূল ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর ওপরেই হয়েছিল এবং এই সকল মাকাতাবায়ে ফিকিরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক বিষয় ছিল শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর ফতোয়া এবং দারুল হরবকে দারুল ইসলামে পরিবর্তনের কর্মতৎপরতা।

সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﷺ ১৭৮৬ সালে রায়বেরালির সাইয়িদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা তাকে অসাধারণ যোগ্যতা দিয়েছিলেন। শিক্ষার জন্য তিনি দিল্লির শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর কাছে গমন করেন। শাহ সাহেব শাগরিদের মধ্যে যোগ্যতা দেখে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। সাইয়িদ আহমাদ দ্রুত ইলম ও তাজকিয়ার মানজিলগুলো পাড়ি দিয়ে ফেলেন। শাগরিদের তাকওয়া, পরহেজগারি ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া দেখে শাহ সাহেব তার ভাতিজা শাহ ইসমাইল শহিদ এবং জামাতা মাওলানা আব্দুল হাই ﷺ-কে নিজের জীবদ্দশাতেই সাইয়িদ আহমাদ শহিদের হাতে বাইআত করান এবং পূর্ণ আনুগত্যের আদেশ দেন। এই দুই হজরত নিজেরাই তখন বড় আলিমদের মাঝে গণ্য হতেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা এমন এক পবিত্র গ্রুপ তৈরি করেন, যারা মুসলিমদের সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবেন। সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﷺ প্রথমে দাওয়াহ ও তাবলিগের কাজ শুরু করেন। পুরো হিন্দে সফর করে মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ, জিহাদ ও কিতালের দাওয়াত দেন। হিন্দের হাজারো মুসলিম তার হাতে শিরক ও বিদআত থেকে তাওবা করেন এবং হাজার হাজার লোক তাদের সাথে জিহাদের সংকল্প করেন।

জিহাদের ঘাঁটি ও হালাকাসমূহ

ধীরে ধীরে এই দাওয়াহ পুরো হিন্দে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এর কয়েকটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। যার মধ্যে তিনটি ঘাঁটি ছিল সবচেয়ে বড়। প্রথম ঘাঁটি দিল্লির শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর মাদরাসায়ে রহীমিয়্যা, দ্বিতীয় সাদেকপুর পাঠনা এবং তৃতীয় ঘাঁটি ছিল কাবায়েলি এলাকায়। দিল্লি ও পাঠনার ঘাঁটি হিন্দুস্থানে দাওয়াত ও সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ অর্থাৎ জিহাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে নিজেদের ফরজ হিসেবে আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। আর কাবায়েলি এলাকায় থাকা মুজাহিদদের ঘাঁটিগুলো অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ অর্থাৎ বাস্তব জিহাদ ও কিতালে লিপ্ত ছিলেন।

দিল্লির মারকাজ

দিল্লির এই মারকাজের দুটি যুগ ছিল। প্রথম জিহাদি যুগ, যা ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধ থেকে ১৮৫৭ সালের আজাদি লড়াই পর্যন্ত জারি ছিল। এই ঘাঁটির কার্যক্রম শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর নাতি শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের নেতৃত্বে পূর্বের মতোই চলমান ছিল। এর মারকাজ দিল্লির সেই মসজিদ ও মাদরাসা ছিল, যার প্রধান ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ। এই ঘাঁটি সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য ও মুজাহিদদের জন্য নতুন সদস্য প্রেরণ করত। দ্বিতীয় ইলমি যুগ, যা ১৮৫৭ সালের আজাদি লড়াই থেকে শুরু হয়েছে। এই যুগে সেই ঘাঁটির নেতৃত্ব আকাবিরে দেওবন্দের হাতে চলে আসে, যারা ইলম ও আমলের ময়দানকে সামনে রেখেছেন এবং এর পূর্ণ হক আদায় করেছেন।

সাদেকপুর পাঠনার মারকাজ

সাদেকপুরের মারকাজের নেতৃত্ব সাইয়িদ আহমাদ শহিদের বাইআতপ্রাপ্ত এবং মাওলানা ইসহাক ﷺ-এর শাগরিদ মাওলানা এনায়েত আলি ও মাওলানা বেলায়েত আলির হাতে ছিল। এই দুই ভাইকে সাইয়িদ সাহেব সাদেকপুর থেকে জিহাদের দাওয়াতি কার্যক্রমের আদেশ দেন। এই দুই ভাই বালাকোটের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তারা সাইয়িদ সাহেবের শাহাদাতের পর ১৮৪১ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬১ বছর এই ঘাঁটিতে তাহরিকে মুজাহিদিনের কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৬৩ সালের আম্বেলা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজরা সাদেকপুর পাঠনার এই ঘাঁটির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়। অনেক আলিমকে কালাপানির শাস্তি দিয়ে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই মামলার অন্তর্ভুক্ত মাওলানা জাফর থানেশ্বরি এবং শাহ সাহেবের শাগরিদ মাওলানা নজির হুসাইন ﷺ-ই হিন্দের জামাআতে আহলে হাদিসের ভিত্তি রেখেছিলেন।

কাবায়েলি জিহাদের ঘাঁটি

জিহাদের তৃতীয় ঘাঁটি ছিল সীমান্তবর্তী ও কাবায়েলি এলাকাগুলো। শুরুতে এই ঘাঁটি শুধু মার্দান জেলার সওয়াবি, নওশেরাহ ও বুনের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে জিহাদের দাওয়াতের বরকতে এই সীমা বৃদ্ধি হয়ে পূর্বদিকে হাজারা ও কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং পশ্চিমে সোয়াত, বাজুর, মেহমান্দ, খায়বার ও ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এটাই সেই জায়গা, যেখানে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের মুজাহিদরা জিহাদের বরকতে ইংরেজদের স্বার্থের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

জিহাদের মাকসাদ ও মানহাজ

শাহ আব্দুল আজীজ ﷺ-এর এই ফতোয়ার ফলে তার শাগরিদ সাইয়িদ আহমাদ শহিদ, জামাতা শাইখুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাই এবং ভাতিজা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাইল শহিদ বাস্তব জিহাদের দিকে অগ্রসর হন। তাদের মানহাজ ছিল সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এবং সুন্নাহর অনুসারী সালাফে সালিহিনের মানহাজ অর্থাৎ হিজরত, ইদাদ, রিবাত ও জিহাদ। তাদের লক্ষ্য তা-ই ছিল, যা ইসলাম জিহাদের জন্য নির্ধারণ করেছে। মাওলানা গোলাম রাসুল মহর তার কিতাব 'সিরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহিদ'-এর ২৫২ নং পৃষ্ঠায় সাইয়িদ আহমাদ শহিদের কিতাব থেকে সেই ইবারত নকল করেন, যেখানে সাইয়িদ সাহেব নিজেই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন :

- যদি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, প্রশাসন, রাজনীতি ও বিচারালয়ে শরিয়াহর নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। নিজেই হুকুমতের বাদশাহ হওয়ার পরিবর্তে আমার পছন্দ—সব জায়গায় ন্যায়বান ব্যক্তিরাই শাসন করবে।

- আমি অর্ধ রাষ্ট্রের ওপরও বাদশাহি করার ইচ্ছা রাখি না। যখন ইসলামের সাহায্যের যুগ শুরু হয়ে যাবে এবং স্বৈরাচারী শাসন মূল থেকে উপড়ে ফেলা হবে, তখন আমাদের প্রচেষ্টার তির আপন নিশানায় বিদ্ধ হবে।

তারিখে দাওয়াত ও আজিমাতের অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ৪০৮ পৃষ্ঠায় সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﷺ-এর জবানে তার মাকসাদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

- আমাদের যুদ্ধ আমির বা নেতাদের সাথে নয়; বরং আমাদেরকে লম্বা চুলওয়ালা (শিখ) এবং সমস্ত ফিতনার উৎস ইংরেজ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। নিজের কালিমাওয়ালা ভাই বা আমাদের ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সাথে নয়।

- এই অঞ্চলকে (পশ্চিম হিন্দুস্থান) মুশরিকদের নাপাকি থেকে পাক করা এবং মুনাফিকদের গাদ্দারি থেকে পবিত্র করার পর হুকুমত ও সালতানাতের হকদার,

নেতৃত্বদান ও শৃঙ্খলা কায়িমে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এই শর্তে যে, সে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে এবং সর্বাবস্থায় জিহাদ চালিয়ে যাবে এবং কখনোই জিহাদ বন্ধ করবে না। মামলা-মুকাদ্দামায় শরিয়াহর বিধানকে কোনোভাবেই পাশ কাটানো বা বিকৃত করবে না এবং জুলুম ও ফিসক থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে। এর পরেই আমি মুজাহিদদের দায়িত্ব ছেড়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওয়ানা করব এবং সেটাকে শিরক ও কুফর থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করব। কারণ আমার মূল মাকসাদ হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করা, খোরাসানে শান্তিতে বসে থাকা নয়।'

এর থেকে বোঝা যায়, সাইয়িদ আহমাদ শহিদের দৃষ্টিতেও হিন্দুস্থান দারুল হরব ছিল, যেখানে কাফিররা বিজয়ী এবং যাকে দারুল ইসলামে পরিবর্তন করার জন্য জিহাদ আবশ্যক। এখানে দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শরিয়াহ বাস্তবায়িত হবে।

হিজরত, যুদ্ধপ্রস্তুতি ও জিহাদ

জিহাদের জন্য প্রস্তুতি আবশ্যক এবং প্রস্তুতির জন্য হিজরত আবশ্যক। এটাই সাহাবিদের তরিকা। সাইয়িদ সাহেব এটাও স্পষ্ট করেছেন, হিজরত সুন্নাহ মুতাবিক হতে হবে। তিনি হিজরত ও ইদাদের জন্য সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো নির্ধারণ করেছেন এবং এর কারণ ছিল কয়েকটি। যদিও সাইয়িদ সাহেবের কিছু সাথির ইচ্ছা ছিল হিন্দে থেকেই জিহাদ করা, কারণ এর জন্য তারা তাদের দাবি অনুযায়ী অস্ত্র ও সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﷺ সীমান্তের কিছু বৈশিষ্ট্যের ফলে সেই এলাকাগুলোকে নির্বাচন করেছিলেন, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন :

- জিহাদের প্রস্তুতির জন্য সীমান্ত ছিল ভৌগলিক ও সামরিক দৃষ্টিতে উপযুক্ত ও নিরাপদ এলাকা। অপরদিকে হিন্দুস্থানের মধ্যে বিপদ ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপক আশঙ্কা ছিল।
- সীমান্তে মুসলিমদের আধিক্য ছিল, যারা শিখদের জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে জনগণ ফিতরাতগতভাবেই লড়াকু ও নিষ্ঠাবান ছিল।
- সীমান্তের উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও মুসলিমদের আধিক্য ছিল। দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পাঞ্জাবে মুসলিমসহ হিন্দুরাও শিখদের জুলুমে অতিষ্ঠ ছিল।
- যদিও কিছু সীমান্তবর্তী এলাকা কাফিররা দখল করেছিল; কিন্তু স্বাধীনতার সম্ভাবনা তখনও বাকি ছিল। অনেক এলাকা তখনও মুক্ত ছিল, যেখানে কাফিরদের দখল ছিল না। সেখানে পরিপূর্ণ ক্ষমতাও তাদের হাতে ছিল না। পক্ষান্তরে হিন্দুস্থানের সমস্ত এলাকার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

এই হিজরতের জন্য সাইয়্যিদ আহমাদ ﷺ-কে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কেননা, তার ও সীমান্তের মাঝে শিখদের রাজ্য ছিল। তাই তিনি অনেক ঘুরে বিশাল রাস্তা পাড়ি দিয়ে হিজরত করেছেন। নিজ এলাকা রায়বেরলি থেকে বের হয়েছেন, যা ছিল মধ্য হিন্দুস্থানে। সেখান থেকে গোয়ালিয়া গেছেন, অতঃপর উড়িষ্যার শহর টুংকি, সেখান থেকে রাজস্থানের শহর আজমির, সিন্ধের শহর শিকারপুল, বেলুচিস্থানের কোয়েটা এবং সর্বশেষ আফগানের কান্দাহার ও কাবুল হয়ে পেশওয়ার পৌঁছেছেন। এর থেকে খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায় যে, এই সফরে তিনি কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তার দৃঢ় সংকল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনো কমতি ছিল না। আড়াই থেকে তিন হাজার মাইলের এই সফর তিনি ও তার কাফেলা প্রায় দশ মাসে পাড়ি দিয়েছেন।

সাইয়্যিদ আহমাদ শহিদ ﷺ-এর সীমান্তে আগমন

যখন সাইয়্যিদ আহমাদ শহিদ ﷺ সীমান্তে পৌঁছান, তখন ছোট ছোট খানদের অধীনে সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা বণ্টিত ছিল। যার মধ্যে আম্ব, পাঞ্জেতার, সামাহ, জিদাহ, সাত্তানাহ, পেশাওয়ার ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ। এই সব আজ পেশাওয়ার, মার্দান, নওশেরওয়াহ ও সুবাই জেলা ইত্যাদি এলাকায় বদলে গেছে। এই খানদের অবস্থা হিন্দুস্থানের রাজ্যগুলো থেকে আলাদা ছিল না। তাদের মধ্যে কিছু খান শিখ-রাজা রণজিৎ সিং-এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল, আবার কিছু খান তাকে ট্যাক্স আদায় করত। সাইয়্যিদ সাহেব সর্বপ্রথম পাঞ্জেতারের আমিরের কাছে মেহমান হন এবং সেখান থেকে কার্যক্রম শুরু করেন। পাঞ্জেতারের অবস্থান ছিল সিন্ধু নদের পশ্চিম কিনারে, যা শিখদের এলাকার অধিক নিকটবর্তী। তাই সাথিদের মুশাওয়ারায় পাঞ্জেতার থেকে ঘাঁটি সাত্তানাতে স্থানান্তরিত করেন। সাত্তানা ছিল মার্দান ও বুনির জেলার কিনারে অবস্থিত এবং পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় জিহাদি ঘাঁটির জন্য ছিল অধিক উপযুক্ত।

জিহাদের ইমামতের বাইআত

সীমান্তে পৌঁছে কাজের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের সামনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয়, তার মধ্যে ছিল কবিলাগুলোর অপরিকল্পিত পদ্ধতি, জিহাদের মাকসাদের ব্যাপারে অজ্ঞতা, দুনিয়ার মাল ও সম্মানকে গুরুত্ব দেওয়া এবং নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। তাই প্রথমেই তারা নেতাদের কাছে দাওয়াহ পাঠান এবং তাদের কাছে জিহাদের বার্তা ও শরিয়াহর মানহাজ বিস্তারিত আলোচনা করেন। যার ফলে তারা জিহাদকে এক আমিরের অধীনে শৃঙ্খলিত করার ব্যাপারে রাজি হয়ে যান। শুধু তা-ই নয়; বরং সেখানের আলিম ও নেতারা শাহ সাহেবকেই ইমামতের উপযুক্ত গণ্য করেন। সীমান্তের সব বড় নেতা, আলিম, শাইখ ও খানরা জুমাদাল উখরা ১২৪২ হিজরি মুতাবিক, ১৮২৭ সালের জানুয়ারিতে শাহ সাহেবকে জিহাদের আমির নির্ধারণের সাথে সাথে জুমআর খুতবাতেও তার নাম সংযুক্ত করে দেন।

যার ফলে শাহ সাহেবকে নিজেদের লোকেরা আমিরুল মুমিনিন বলা শুরু করেন। সীমান্তের জনগণের মাঝে তিনি 'সাইয়িদ বাদশাহ' ও শিখদের কাছে 'খলিফাহ সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। এই বাইআতের মধ্যে শুধু জিহাদের ব্যবস্থাপনা করাই সাইয়িদ সাহেবের জিম্মাদারি ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে খানরা ছিল স্বাধীন। এই বাইআতের পর জিহাদের জন্য নফিরে আম ঘোষণা করা হয় এবং জিহাদের জন্য বড় আকারে বাইআত নেওয়া হয়। যাদের থেকে বাইআত নেওয়া হয়, তাদের মধ্যে এমন সর্দারও ছিল, যাদের ব্যাপারে মুখলিস সাথিরা সাইয়িদ সাহেবকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু নফিরে আম হিসেবে সবার থেকে বাইআত নেওয়া ও তাদের ওপর ভরসা করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু পরে সেই অঞ্চলের সাথিদের সতর্কবার্তাই সত্য প্রমাণিত হয়।

'তাহরিকে মুজাহিদিন'-এর জিহাদের ময়দান

আকুরাতে শিখদের বিরুদ্ধে হামলার দ্বারা সাইয়িদ সাহেবের জিহাদ শুরু হয়। কিছু হামলার পরেই সীমান্ত এলাকাতে শিখদের শক্তি কমতে শুরু করে (আলহামদুলিল্লাহ)। মুজাহিদরা দুই দিকে যুদ্ধ শুরু করেন; এক. শিখদের বিরুদ্ধে ও দুই. গাদ্দার খানদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধগুলোতে আল্লাহ তাআলা সাইয়িদ সাহেবকে সফলতা দান করেন। যার ফলে সীমান্ত এলাকাগুলো কাফিরদের থেকে মুক্ত আজাদ মুসলিম ভূমিতে পরিণত হয়। পরিস্থিতি অনুকূলে আসার পর সাইয়িদ সাহেব মানুষদের থেকে ইমারাতের বাইআত নিয়ে এই ভূমিকে শরয়ি ইমারাতে পরিণত করেন।

সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﷺ-এর শরয়ি বাইআত

ইমামতে জিহাদের বাইআতের ফলে যদিও কিছ শৃঙ্খলাবদ্ধ জিহাদি কার্যক্রম হচ্ছিল; কিন্তু জিহাদের মূল লক্ষ্য পূরণ হচ্ছিল না। এই বাইআতে খানরা তাদের আঞ্চলিক কার্যক্রমে স্বাধীন ছিল। তাই তিনি তখন পূর্ণ শরিয়াহ বাস্তবায়নের বাইআত নেওয়াও শুরু করেন। সীমান্তের জনগণ যদিও ইসলামের প্রতি মহব্বত রাখত; কিন্তু সেই সাথে তাদের মাঝে শরিয়াহর ব্যাপারে ছিল অনেক অজ্ঞতা এবং উপমহাদেশের মুসলিমদের অধঃপতনের ফলে তাদের ভেতর অনেক সমস্যা জন্ম নিয়েছিল। এর মধ্যে কিছু সমস্যা মাওলানা গোলাম রাসুল মহর সাইয়িদ সাহেবের জীবনীগ্রন্থে (৪৫৮ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে :

- শরিয়াহর হুকুমের ব্যাপারে নেতাদের বেপরোয়া ভাব এবং তাদের সাথে স্থানীয় আলিমদের আপসি সম্পর্ক।
- সমাজে অনেক বিদআত চালু হওয়া। যেমন : বাচ্চা নষ্টের পদ্ধতি, মোহরের মধ্যে বাড়াবাড়ি, নারীদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে মাহরুম করা ইত্যাদি।

- জিহাদ ও অন্যান্য জাহিলি লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা।

জিহাদের মাকসাদকে বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণ শরিয়াহ পালনের বাইআতের ক্ষেত্রে সাইয়িদ সাহেব সব সর্দার থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, তারা নিজেদের সমস্ত কার্যক্রম শরিয়াহ অনুযায়ী চালাবে এবং জনগণের ওপর শরিয়াহ বাস্তবায়ন করবে।

১২৪৪ হিজরির শাবান মাস ১৮২৯ সালে সর্দার ফাতাহ খানের কবিলায় একটি আম জমায়েত হয়। যেখানে ফাতাহ খান সকলকে শরয়ি বাইআতের দিকে উদ্বুদ্ধ করেন। সেখানে সবাই স্বেচ্ছায় ইসলামি শরিয়াহর পাবন্দিকে গ্রহণ করে নেয়। যার পর একজন দক্ষ আলিমকে প্রধান বিচারক ও একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। তার অধীনে আবার ৩০ জন বন্দুক চালনাকারীকেও নিয়োগ দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিকদের দাবি অনুযায়ী এই বাইআতের ফলে সেই সক্ষমতা তৈরি হয়, যেই লক্ষ্যে সাইয়িদ সাহেব হিজরত করেছিলেন। তার লক্ষ্য বাস্তবতার মুখ দেখে এবং ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনেক সেনা প্রস্তুত হয়। অপরদিকে সমাজের শিরক ও বিদআতের সংস্কৃতির প্রচলন কমে যায় এবং তার জায়গায় নামাজ, জাকাত ও জবাবদিহির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই সময় এক নতুন ফিতনা শুরু হয়, যা এই পুরো কার্যক্রমকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

পেশওয়ারের খানদের চুক্তিভঙ্গ ও সাইয়িদ আহমাদ ﷺ-এর শাহাদাত

মুজাহিদদের জিহাদের এই সফলতার ফলে রণজিৎ সিং ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে পেশওয়ারের খান 'ইয়ার মুহাম্মাদ' সীমান্তে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখত। সেও মুজাহিদদের এই সফলতাকে ভিন্ন চোখে দেখছিল। বলা হয় রণজিৎ সিং পাঞ্জাবের এক বিদআতি আলিম থেকে একটি ফতোয়া লিখিয়ে পেশওয়ারের খানের কাছে পাঠায়। এই ফতোয়ার ভাষ্য কিছুটা এমন ছিল :

'তোমাদের কাছে এমন কিছু উগ্রবাদী লোক এসেছে, যারা নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। তাদেরকে এখনই এলাকা থেকে বের করে দাও।'

পেশওয়ারের খান—যারা প্রথম থেকেই নিষ্ঠাবান ছিল না, এই ফতোয়া তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়। পেশওয়ারের খান ভেতরে ভেতরে জনগণ, অন্যান্য খান ও আলিমদের মধ্যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালায়। এর ফলে অনেক মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সাথে অংশ নেয়। মোটকথা, চক্রান্তের মাধ্যমে গোপনভাবে একটি দিন নির্ধারণ করা হয় এবং নিজ নিজ এলাকার মুজাহিদদের অতর্কিত হামলা করে শহিদ করে দেওয়া হয়। এই মুজাহিদদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সেসব কাজি ও আলিম, যারা সাইয়িদ সাহেবের নেতৃত্বে মানুষের

মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিলেন। এই সমস্ত হজরত ছিলেন মুজাহিদদের জিহাদের প্রাণ। এই কাজের ফলে জিহাদি কার্যক্রম অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওয়াফাদার খানগণ ও মুজাহিদরা সাইয়িদ আহমাদ শহিদকে এই খানদের বদলা নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু সাইয়িদ সাহেব এটাকে মুসলিমদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ মনে করে এমনটা করা থেকে বিরত থাকেন। এরপর সাত্তানা থেকে পুনরায় বালাকোটের দিকে হিজরত করে চলে আসেন। এখানে হিজরতের পর ১৮৩১ সালের মে মাসে বালাকোটের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। যেখানে সাইয়িদ আহমাদ শহিদ, শাহ ইসমাইল শহিদ অন্যান্য সাথিদের সাথে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ও শাহ ইসমাইল শহিদের শাহাদাতের পর মুজাহিদরা মাওলানা অলি মুহাম্মাদকে আমির নির্ধারণ করেন। মাওলানা অলি মুহাম্মাদ মুজাহিদদের নিয়ে পুনরায় সাত্তানা ফিরে আসেন এবং জিহাদের কার্যক্রম শুরু করেন। মাওলানা ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং এক বছরের মাথায় তিনি ইনতিকাল করেন। মাওলানা অলি মুহাম্মাদের পর মুজাহিদরা নাসিরুদ্দিন মেঙ্গোরিকে আমির বানান। তার সময়ে আবার যুদ্ধ শুরু হয় এবং মাওলানা এক যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান।

দিল্লির মারকাজ নেতৃত্বের ঘাটতি পূরণের জন্য মাওলানা নাসিরুদ্দিন দেহলবিকে নির্বাচন করে। মাওলানা মুজাহিদদের পুরো বাহিনী নিয়ে সাত্তানার দিকে হিজরত শুরু করেন। মাওলানা সিন্ধে পৌঁছামাত্রই খবর আসে, ইংরেজরা তাদের অধীন বাহিনী নিয়ে আফগানে হামলার জন্য সিন্ধে পৌঁছে গিয়েছে। এটা ছিল সেই মুহূর্তের সূচনা, যখন মুসলিম উম্মাহর দুই দুশমন রাশিয়া ও ব্রিটেন প্রত্যেকেই নিজেকে সুপার পাওয়ার বানানোর কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম আফগান-যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪৪ খ্রি.)

তিন উপমহাদেশে ছড়িয়ে থাকা উসমানি সালতানাত যদিও একসময় সুপার পাওয়ার ছিল; কিন্তু তখন তাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা আসতে শুরু করে। ইংরেজরা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। অপরদিকে রাশিয়া মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, যাতে ইরান বা বেলুচ—কোনো একটির উপকূল পর্যন্ত সব ঋতুতে জলযান চলাচল-উপযোগী জলপথ নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারে এবং বৈশ্বিক বাজারে তারাও ব্যবসা করতে পারে। সেই সাথে রাশিয়া চাচ্ছিল হিন্দুস্থান দখল করে ইংরেজদের হিন্দুস্থান থেকে তাড়িয়ে দিতে। এই লক্ষ্যে রাশিয়া ইরান ও আফগানে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করছিল, যা ইংরেজদের জন্য মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাদের জন্য রাশিয়াকে এই পলিসি থেকে দূরে রাখা জরুরি ছিল।

এটা ছিল সেই যুগ, যখন হিন্দুস্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গাল আর্মি একদিকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং অপরদিকে বোম্বাই আর্মি সিন্ধের দরজায় কড়া নাড়ছিল। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হাজারা ও সীমান্ত এলাকাতে রণজিৎ সিং-এর শাসন ছিল। ইংরেজ ও রণজিৎ সিং-এর মাঝে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ১৮১৮ সালে শাহ সুজাকে পরাজিত করে দোস্ত মুহাম্মাদ আফগানের বাদশাহ হয়ে যায়। ফলে শাহ সুজা আফগান থেকে পলায়ন করে হিন্দুস্থান এসে ইংরেজদের আশ্রয়ে লুধিয়ানাতে অবস্থান করছিল।

১৮৩৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর, এক ঘোড়-সওয়ার কাবুলের সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করে। সে ছিল রাশিয়ার জারের প্রতিনিধি ওয়াং কোচ, যে জারের পক্ষ থেকে আফগান শাসকের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে এসেছে। দোস্ত মুহাম্মাদের দরবার থেকে ব্রিটেনের প্রতিনিধি আলেকজান্ডার বার্নিস এই খবর গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের কাছে প্রেরণ করে। অকল্যান্ড তার দূতের মাধ্যমে আফগানের গভর্নরের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠায়। দোস্ত মুহাম্মাদ এই শর্তে বন্ধুত্ব করতে প্রস্তুত হয় যে, পেশওয়ার অঞ্চল রণজিৎ সিং থেকে নিয়ে তার হতে অর্পণ করতে হবে। এই শর্ত পূরণ করা ছিল ব্রিটেনের জন্য অসম্ভব। কেননা, রণজিতের সাথে ইংরেজদের ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ইংরেজদের দয়ার দৃষ্টি শাহ সুজার ওপর পড়ে, যাকে দোস্ত মুহাম্মাদ ১৮০৯ সালে দেশান্তর করে সিংহাসন দখল করেছিল। শাহ সুজা ইংরেজদের আশ্রয়ে লুধিয়ানাতে বসবাস করছিল। ইংরেজরা তাকে এই শর্তে সাহায্য করতে রাজি হয় যে, ক্ষমতা গ্রহণের পর পেশওয়ারের সাথে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'শিমলা'তে ব্রিটেন, রণজিৎ ও শাহ সুজার মাঝে একটি চুক্তি হয়, যাকে 'শিমলা চুক্তি' বলা হয়। সেখানে বলা ছিল, ইংরেজ বাহিনী আফগান দখল করে শাহ সুজাকে আফগানের শাসক বানিয়ে ফিরে চলে যাবে। এই চুক্তিই প্রথম আফগান জিহাদের কারণ হয়েছিল।

১৮৩৯ সালের ১৯ জানুয়ারিতে ব্রিটেনের দুই ডিভিশন সেনা ফিরোজপুর ও বাংলা থেকে এসে কোয়েটাতে একত্রিত হয়। সেখানে ছিল সাড়ে নয় হাজার ইংরেজ সেনা, ৩৮

হাজার সাধারণ সেনা ও ৩০ হাজার উট। এই বাহিনী ৩ মে স্বাভাবিক লড়াইয়ের মাধ্যমে কান্দাহার দখল করে শাহ সুজাকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। এরপর কাবুলের দিকে এগিয়ে গিয়ে গজনি কেল্লা দখল করে। গজনি কেল্লা বিজয়ের জন্য তাদের খুব কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এই যুদ্ধে আফগানের সাথে ইয়াগিস্তান কবিলা ও সাইয়িদ আহমাদ শহিদের বাইআতকৃত মাওলানা নাসিরুদ্দিন ﷺ-এর নেতৃত্বে হিন্দুস্থানের মুজাহিদরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন লড়াই কেল্লার দেয়ালের বাইরে হিন্দুস্থানি মুজাহিদরাই করেছিল। এই কঠিন লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সমস্ত মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। সর্বশেষ গজনি কেল্লাকে ইংরেজরা দখল করে নেয়। কাবুল দখলের পথে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। এই বাধা দূর হয়ে যাওয়ার পর কাবুল সহজেই ইংরেজদের দখলে চলে এসেছিল। বিজয়ের উল্লাসে ব্যস্ত ব্রিটেন বাহিনী কল্পনাও করতে পারেনি যে, যুদ্ধ মূলত কেবল শুরু হয়েছে।

১৮৪০ সালের শুরুর দিকে ব্রিটেন অনুভব করে যে, আফগান জনগণের মধ্যে বিরোধী প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। তাই তারা কাবুলে একটি বড় সেনাঘাঁটি তৈরির প্ল্যান নেয়। যার বিরুদ্ধে উলামায়ে কিরাম জিহাদের আহ্বান জানায়। ফলে মুজাহিদরা কুহিস্থান এলাকাতে শাহ সুজা ও ইংরেজদের পুরো বাহিনীকে হত্যা করে। কাবুলেও ব্রিটেনের সহকারী প্রতিনিধি বার্নিস ও তার ভাইকে হত্যার পর মুজাহিদরা সেনা-ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটেনের প্রতিনিধি উইলিয়াম হেই ম্যাগন্যান দোস্ত মুহাম্মাদের ছেলে আকবার খানের সাথে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আকবার খানের একটাই চাওয়া ছিল যে, ব্রিটেন-বাহিনী আফগান থেকে বের হয়ে যাবে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর আফগানরা ব্রিটেনের প্রতিনিধিকে হত্যা করে তাদের ঘাঁটি দখল করে নেয় এবং সেখানের ইংরেজ জেনারেল ও অফিসারদের বন্দী করে ফেলে। ইংরেজ বাহিনীর এক অংশ যুদ্ধ করতে করতে জালালাবাদের দিকে পলায়ন করে। তখন মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। যার ফলে সেই বাহিনীর এক ডাক্তার উইলিয়াম ব্রাইডান ব্যতীত কেউ জীবিত অবস্থায় জালালাবাদ পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

কান্দাহারে জেনারেল নাট নামের এক অফিসার ইংরেজদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল; কিন্তু তার অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই তার সাহায্যের জন্য পেশওয়ার থেকে জেনারেল পলকের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনী আসার ফলে এতটুকুই ফায়দা হয় যে, বাকি বাহিনী ১৮৪২ সালের ২৩ ডিসেম্বর পিছু হটে ফিরোজপুর পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। আফগান মুজাহিদরা শাহ সুজাকে হত্যা করে ক্ষমতা দ্বিতীয়বার দোস্ত মুহাম্মাদের কাছে অর্পণ করে। যার ফলে ব্রিটেন যেসব লক্ষ্য নিয়ে আফগানে প্রবেশ করেছিল, তার একটিও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। উলটো তারা মুজাহিদদের হাতে কঠিন পরাজয়ের শিকার হয়। সেখানে তাদের প্রধান জেনারেল গ্রেফতার হয়, যে বন্দী থাকা অবস্থায় মারা যায় এবং মাত্র একজন ডাক্তার ব্যতীত সব সেনাকে হত্যা করা হয়। আর এভাবেই আফগানের প্রথম জিহাদ শেষ হয়।

আল-জাজায়িরে ফ্রান্সের হামলা (১৮৩০ খ্রি.) এবং আমির আব্দুল কাদীরের প্রতিরোধ-যুদ্ধ

একদিকে তাহরিকে মুজাহিদিনের কার্যক্রম চলমান ছিল। অপরদিকে ব্রিটেন আফগান-যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। ঠিক সেই সময় ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্র আল-জাজায়িরের ওপর হামলা করে বসে। আল-জাজায়ির ভূমধ্য সাগরের কিনারায় অবস্থিত একটি মুসলিম রাষ্ট্র। সে সময় তারা উসমানিদের অংশ ছিল। ফ্রান্সের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সেখানের মুসলিমরা জিহাদ শুরু করে, যাদের নেতা ছিলেন আমির আব্দুল কাদীর। তিনি ছিলেন একজন আলিম ও কাদেরি সিলসিলার সুফি। তার নেতৃত্বে আল-জাজায়িরের মুজাহিদরা ফ্রান্সের সেনাদেরকে কঠিনভাবে মোকাবিলা করে। আমির আব্দুল কাদীর বর্বর গোত্রগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এবং অন্যান্য কবিলাকেও সাথে আনতে সক্ষম হন। এই জিহাদের ফলে আমির আব্দুল কাদীর আল-জাজায়িরের অর্ধেকের বেশি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন এবং ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করে শরিয়াহ বাস্তবায়ন শুরু করেন। জিহাদের এই সফলতার ফলে ফ্রান্স ঘাবড়ে যায় এবং তাদের প্রশাসন ১৮৩৭ সালে আমির আব্দুল কাদীরের সাথে চুক্তি করে তাদের ইমারাতকে মেনে নেয়। কিন্তু দুই বছরের মাথায় ফ্রান্স চুক্তি ভঙ্গ করে ১৮৩৯ সালে আমির আব্দুল কাদীরের এলাকায় হামলা করে। এই যুদ্ধ ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। যেই সময় ফ্রান্স আমিরের অনেক এলাকাকে দখল করে নেয়। ফলে আমির আব্দুল কাদীর তিউনিসিয়া থেকে সাহায্য কামনা করেন; কিন্তু তিনি সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাননি। ফলে তিনি হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হন। এরপর আমিরকে গ্রেফতার করে সিরিয়াতে দেশান্তর করা হয়। তিনি ১৮৪৩ সালে সেখানেই মারা যান।

উসমানিদের পতন : পশ্চিমা নীতি গ্রহণের যুগ (১৮২৬-১৮৭৬ খ্রি.)

ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বাদশাহদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। অপরদিকে হিন্দুস্থানের ওপর ব্রিটেন এবং আল-জাজায়িরের ওপর ফ্রান্সের দখল পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। রাশিয়া কান্দাহার, বলকান ও কৃষ্ণ সাগর দখলের জন্য বাহিনী তৈরি করছিল। এই অবস্থায় উসমানিদের পতনের ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব তখন উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। অনেক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জন্ম নিতে থাকে। যারা নিজ নিজ দেশীয় অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে।

এটাও একটি বাস্তবতা যে, যখন কোনো রাষ্ট্রের পতন শুরু হয়, তখন তারা অপর রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় এবং তাদের নীতিমালা গ্রহণ করা শুরু করে। এই অবস্থা উসমানিদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। পতনের সেই সময় উসমানিরা পশ্চিমা শাসনব্যবস্থা

ও তাদের শিল্পোন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া শুরু করে। তারা চিন্তা করছিল, পশ্চিমাদের শাসনব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হয়তো তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু না কখনো এমনটা হয়েছে আর না কখনো এমনটা হবে।

১৮৩৯ সালে সুলতান মাহমুদ প্রশাসনকে নতুনভাবে গঠনের নামে উসমানিদের মধ্যে পরিবর্তন শুরু করে। এর মধ্যে ছিল সামাজিক, বাণিজ্যিক, সামরিক ও আইনগত পরিবর্তন। এই উন্নতির সহজ অর্থ ছিল এটাই যে, তখন উসমানি সাম্রাজ্যকে পূর্ণভাবে পশ্চিমা ধাঁচে সাজানোর চেষ্টা শুরু হয়। এই নতুন গঠনের আলোচনা অনেক বিস্তারিত, যার সারসংক্ষেপ এখানে পেশ করা হচ্ছে :

- ১৮৩৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকার চার্টার গ্রহণ করে নেওয়া হয়।
- ১৮৪০ সালে পশ্চিমাদের অনুকরণে প্রথমবার উসমানি সাম্রাজ্যে কাগুজি নোট জারি হয়।
- ১৮৪৩-১৮৪৪ সালের মধ্যে বাহিনীকে পূর্ণভাবে পশ্চিমা যুদ্ধনীতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর গঠনে মূল ভূমিকা রেখেছিল পশ্চিমা ধর্মহীন যুদ্ধের থিউরির জনক জেনারেল ক্লজউইজের শাগরিদ জেনারেল মোল্টকি।
- ১৮৪৭ সালে উসমানিদের জন্য জাতীয়তাবাদী সংগীত ও পতাকা বানানো হয়।
- সেই বছরেই উসমানিদের মধ্যে পশ্চিমা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু করা হয়।
- সেই বছরেই শরিয়াহর বিধানকে কাটছাঁট করে কিছু পশ্চিমা ফৌজদারি নীতি গ্রহণ করা হয়।
- ১৮৪৮ সালে পশ্চিমা ধাঁচে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ১৮৫৬ সালে কাফিরদের জন্য জিজিয়া বিলুপ্ত করে পশ্চিমা ধাঁচে ট্যাক্সব্যবস্থা চালু হয়।
- এই বছরেই অমুসলিমদেরকে বাহিনীতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।
- ১৮৬৬ সালে প্রথম স্টক এক্সচেঞ্জ বানানো হয়।
- ১৮৬৯ সালে পশ্চিমাদের মতো নাগরিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

এই সংশোধন ও এই নতুন গঠন উসমানিদের পতনের গতি আরও বৃদ্ধি করে। আমরা সামনে এর ওপর আরও অধিক আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হিন্দুস্থানে ব্রিটেনের বন্ধ বর্ডার নীতি (১৮৪৮-১৮৭৮ খ্রি.)

হিন্দুস্থানের রাজনীতি তখন নতুন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির শাসন পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে আফগানে পরাজিত হওয়ার পর ব্রিটেনের জন্য রাশিয়ার বিপদ আরও অধিক বৃদ্ধি হচ্ছিল। সেই সময় রণজিৎ মারা যায় এবং তার পরে সিংহাসন নিয়ে উত্তরসূরিদের মাঝে লড়াই শুরু হয়। যার ফলে ইংরেজরা সুযোগ পেয়ে যায় এবং সাহায্যের বাহানায় পাঞ্জাবে ঢুকে যায়। সর্বশেষ ১৮৪৯ সালে তারা পাঞ্জাব দখল করে নেয়। এই ঘটনাকে ইতিহাসে 'পাঞ্জাব অনুপ্রবেশ' (ইলহাকে পাঞ্জাব) বলা হয়। পাঞ্জাব অনুপ্রবেশ ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। যা একই সাথে গ্রেট গেইম ও হিন্দুস্থানের রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পাঞ্জাব অনুপ্রবেশের ফলে ব্রিটেন হিন্দুস্থানের পশ্চিমে কাবায়েলি ও আফগানের মুজাহিদদের সাথে সরাসরি মোকাবিলায় এসে গিয়েছিল। আর এই পাঞ্জাব অনুপ্রবেশের ফলেই গ্রেট গেইম উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করে।

তখন গ্রেট গেইমে আফগানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আফগানে ব্রিটেন ও রাশিয়া দুই পক্ষই আপন স্বার্থ অর্জনে মরিয়া হয়ে ওঠে। যার ফলে সেই অঞ্চলে তিন বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। একদিকে ইংরেজ, যারা রাশিয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য কাবায়েলি এলাকা ও আফগান দখল করে সেখানে নিজেদের অধীন শাসক বসাতে চাচ্ছিল। অপরদিকে রাশিয়া আফগান দখল করে হিন্দ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চাচ্ছিল এবং উপকূল দখল করে বিশ্বের সাথে বাণিজ্য করতে চাচ্ছিল। তৃতীয় দিকে মুজাহিদরা ব্রিটেন ও রাশিয়া উভয় পক্ষকেই ইসলামি রাষ্ট্র থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিল। যার ফলে এটা এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, যা একই সাথে ছিল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে, ইংরেজরা তা কল্পনাও করতে পারেনি।

পাঞ্জাব অনুপ্রবেশের ফলে ইংরেজদের সামনে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ চলে আসে। মূল চ্যালেঞ্জ ছিল এখন প্রথমবারের মতো হিন্দুস্থানি ও কাবায়েলি মুজাহিদদের সাথে তাদের সরাসরি মোকাবিলা শুরু হয়। হিন্দুস্থানে তাদের বিজয়গুলো অনেক সহজেই হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে তারা কল্পনাও করেনি পাঞ্জাব অনুপ্রবেশের ফলে তারা এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, যা ১৮৪৯ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী চলমান থাকবে। অতঃপর এই যুদ্ধে তাদের এত পরিমাণ প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি হবে, যা কয়েকটি বড় যুদ্ধ থেকেও বেশি হয়ে যাবে। সর্বশেষ তারা কোনো সফলতাও অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

পাঞ্জাব অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট দ্বিতীয় বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। ব্রিটেনের হুকুমত শুরু থেকেই রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির ব্যাপারে ভীত ছিল। তারা রাশিয়ার ওয়ার্ম ওয়াটার পোর্ট পর্যন্ত পৌঁছার ইচ্ছা ভালোভাবেই জানত। যা আফগানের বেলুচিস্থান

উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এই অঞ্চল ছিল ব্রিটেনের আয়ত্তে। রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য ইংরেজদের সামনে এই পথই খোলা ছিল যে, তারা আফগান দখল করে সেখানে তাদের অনুগত শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তাদের এই ইচ্ছার পথে কাবায়েলি ও হিন্দুস্থানি মুজাহিদরা বাধা হয়েছিল। তাই এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইংরেজরা বিকল্প যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, তাকে 'বন্ধ বর্ডার নীতি' বলা হয়।

এই নীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিন্দুস্থানে ব্রিটেন সাম্রাজ্যের সীমানা সিন্ধু নদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবে এবং সিন্ধু নদ থেকে ব্রিটেন সাম্রাজ্যের সীমানা মেনে নিয়ে নদীর পাশের পাঁচটি জেলা মার্দান, নওশেরওয়া, কোহাট, বান্নু ও ডেরা ইসমাইল খানকে পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা পশ্চিমের কবিলাগুলোকে দখল করা ছাড়াই পরোক্ষভাবে সোয়াত, বুনির ও টাঙ্ককে খানদের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবে। এই কৌশলকে কার্যকর বানানোর জন্য 'এফ.সি.আর.' (Frontier Crime Regulation) নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়। এই নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল এমন :

১. ইংরেজদের অধীন এলাকাগুলো নিরাপদ রাখা এবং সেখানে কাবায়েলি যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া।

২. ইংরেজদের আইনে কোনো অপরাধী যদি কবিলাগুলোতে আশ্রয় নেয়, তাহলে কবিলাগুলো তাদেরকে প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করবে।

৩. কবিলাগুলোকে ইংরেজদের আইনের অনুগত করার জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা চালানো হবে।

৪. যে সমস্ত কবিলা ইংরেজদের সাথে চুক্তি করবে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করা হবে।

কিন্তু ব্রিটেনের এই বন্ধ বর্ডার নীতি হিন্দুস্থানি মুজাহিদ ও কাবায়েলি জিহাদের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়।

ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ইতিহাস ও কার্যক্রম

'বন্ধ বর্ডার নীতি'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৮৪৬ সালে পাঞ্জাবের গভর্নর হেনরি লরেন্স (Henry Lawrence) ও তার ভাই জন লরেন্স (John Lawrence) বাংলার আঞ্চলিক বাহিনীর অফিসার ল্যাফটেনেন্ট হ্যারি লামসডেন (Harry Lumsden)-কে একটি নতুন বাহিনী তৈরির আদেশ দেয়। যেই নতুন বাহিনীর নাম হবে 'ক্রপস অফ গাইড (Corps of Guides)। এই কোরের কাজ হবে সিন্ধু নদীর সাথে সাথে ইংরেজদের সীমান্তকে রক্ষা করা। কবিলা এবং হিন্দুস্থানি মুজাহিদদের অতর্কিত হামলাকে প্রতিহত করা এবং প্রয়োজনের সময় তাদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানো। শুরুর দিকে গাইডদের একটি আধা

সামরিক বাহিনী হিসেবে গঠন করা হয়। এখানে ঘোড়-সওয়ার বাহিনীকে ক্যাভলরি গাইড (Guides Cavalry) ও পদাতিক সেনাদেরকে ইনফন্ট্রি গাইড (Guides Infantry) হিসেবে গঠন করা হয়। যেহেতু ইংরেজরা সেই সীমান্তকে পাঞ্জাব সীমান্ত বলত, যার ইংরেজি নাম ছিল পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার (Punjab Frontier), তাই ১৮৬৫ সালে গাইডদের এই কোরের নামের সাথে পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার লাগিয়ে দেওয়া হয়। যা পরবর্তী সময়ে 'পিফার্স' (Piffers) হয়ে যায়, যা আজও পাক বাহিনীর ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট হিসেবে রয়েছে।

১৮৭৬ সালে এই কোরের নিকৃষ্ট কার্যক্রমে খুশি হয়ে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া এই ক্রপসকে রানির নিজস্ব ক্রপস (Queen Victoria's Own Crops) নাম প্রদান করে। যার ফলে এটাকে ব্রিটেনের রানির নিজস্ব কোর অফ গাইড ফ্রন্টিয়ার ফোর্স বলা হতো। ১৯০৬ সালে এর নামের সাথে তার প্রতিষ্ঠাতা লামসডেন এর নামও যুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৯১৪ সালে কোর অফ গাইডকে পদাতিক ও ঘোড়-সওয়ার দুটি অংশে ভাগ করা হয়। ১৯২২ সালে পদাতিক অংশকে ১০ম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স নাম রাখা হয়, যাকে আজ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট বলা হয়।

১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবের গভর্নর হেনরি লরেন্স বর্ডারের প্রতিরক্ষায় আরও একটি নতুন আধা সামরিক মিলিশিয়া বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে। যার নাম ফ্রন্টিয়ার রাইফেল (Frontier Rifles) রাখা হয়।

এফ.সি.আর.-এর নীতিমালা

বন্ধ বর্ডার পলিসির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল স্বাধীন কবিলাগুলো থেকে নিজেদের নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখা। এই জন্য ব্রিটেন প্রশাসন এক বিশেষ নীতি বাস্তবায়ন করে, যার নাম ছিল 'ফ্রন্টিয়ার ক্রাইম রেগুলেশন'। এই নীতির ফলে কবিলাগুলোতে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু হয়, যা কোনো না কোনোভাবে আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই নীতির ফলে কবিলাগুলোর প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে 'মালিক' উপাধি দেওয়া হয়। শুরুতে তাদের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর মুনাফিক খানদের মাধ্যমে সম্পর্ক রাখা হচ্ছিল এবং পরবর্তী সময়ে এই কাজের জন্য পলিটিক্যাল এজেন্ট নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য হুকুমত কবিলাগুলোকে ট্যাক্স আদায়ের আদেশ দেয়, যাকে বলা হতো 'আবশ্যকীয় অর্থ'। এই অর্থ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হতো।

যেই কবিলা নিরাপত্তা নষ্ট করত, তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া হতো। এর অর্থ ছিল সেনাবাহিনী ও অন্যান্য কবিলা এই কবিলার সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যদি কবিলার কিছু সদস্য বা কোনো শাখা চুক্তির আনুগত্য না করে, তাহলে বাকি কবিলাগুলো তার বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করবে। যার অর্থ এই সদস্য বা শাখার সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হবে। মুলুক (রাষ্ট্র), মুয়াজেব (বেতন), বান্দাশ (সম্পর্ক ছিন্ন) এই শব্দগুলো

সেখানের নিয়মতান্ত্রিক পরিভাষা হয়ে যায়, যেগুলোর প্রয়োগ এখনো হচ্ছে। কাবায়েলি জনগণ ও আলিমগণ এই সিস্টেমকে মানতে অস্বীকার করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার মধ্যে সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﵀-এর সাথে আসা মুহাজির মুজাহিদদের একটি বড় অংশ ছিল। কবিলা ও মুহাজির মুজাহিদরা ইংরেজ বাহিনী ও চৌকিগুলোর ওপর হামলা শুরু করে।

কাবায়েলি জিহাদ (১৮৪৮–১৮৭৮ খ্রি.)

ব্রিটেনের বন্ধ বর্ডার নীতির ফলে প্রথমবারের মতো মুজাহিদরা ও ইংরেজদের ভারতীয় বাহিনী সামনাসামনি হয়ে যায়। সেই সময় মুজাহিদদের উদ্দেশ্য তা-ই ছিল, যা আজকের মুজাহিদদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদের পরাজিত করে আল্লাহ তাআলার শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা। এর কর্মপদ্ধতিও তা-ই ছিল, যা আজ মুজাহিদরা বাস্তবায়ন করছেন। সাহায্যকারী আনসার, হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মুহাজির, তাদের অঞ্চল, রং, বংশ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এক। তারা দিনে আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করতেন এবং রাত সালাত ও সিজদায় কাটিয়ে দিতেন।

তখন মুজাহিদদের নেতৃত্ব ছিল সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﵀-এর বাইআতপ্রাপ্ত মাওলানা এনায়েত আলি ও মাওলানা বেলায়েত আলির কাঁধে। তাদের নেতৃত্বে মুজাহিদদের আক্রমণে কাফিরদের নাভিশ্বাস উঠে যায়। তখন তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীতে সেই সমস্ত ভাড়াটে নামধারী মুসলিম সেনারাও ছিল, যারা তাদের মূল্যবান জীবনকে ব্রিটেনের জন্য কুরবান করছিল। তারা প্রত্যেকটি যুদ্ধ এই জন্যই করছিল, যাতে মুসলিম উম্মাহকে পরাজিত করা যায়। ভাড়াটে সেনাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নিজের জান কুরবান করে মুসলিমদের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে তার পরিবর্তে কয়েক গজ জমিন ও কিছু সেনা-সম্মাননা অর্জন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এত কিছু সত্ত্বেও তারা নিজেরা নিজেদের মুসলিম দাবি করত।

কাবায়েলি জিহাদকে আমরা দুটি ময়দানে ভাগ করতে পারি। একটি উত্তর ও আরেকটি দক্ষিণ। উত্তরের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মালাকান্ট, বুনির, সোয়াত, বাজুর, মেহমান্দ, খাইবার, মার্দান ইত্যাদি কাবায়েলি এলাকা। দক্ষিণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজায়ি ও উত্তর-দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান। যেমনটা আমরা পূর্বে বলে এসেছি, এখানে মুহাজির ও আনসার উভয় পক্ষই ছিল। এই সমস্ত এলাকার সীমানা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছিল। তেমনই এখানের জিহাদও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছিল। হিজরত ও জিহাদের কাজে এক এলাকার মানুষ অপর এলাকায় চলাচল করত। এই এলাকাগুলোতে সাইয়িদ আহমাদ ﵀-এর সাথিরা ও স্থানীয় জনগণ উভয় পক্ষই বসবাস করছিল। এখানে জিহাদের যে 'সাধারণ কর্মপদ্ধতি' গ্রহণ করা হয়েছিল, তা হলো :

১. দুশমনের ওপর অধিকাংশ কার্যক্রম গোপন হামলার মাধ্যমে করা হবে। যার লক্ষ্য হবে ইংরেজদেরকে সামনে আগানো থেকে বাধা দেওয়া।

২. এই চোরাগুপ্তা হামলার দ্বারা ইংরেজদের বাধ্য করা হবে; যাতে তারা পাল্টা হামলা করে। তখন মুজাহিদরা তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো ময়দানে এনে টার্গেট করে আক্রমণ করবে।

৩. ইংরেজরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করছে এবং রাশিয়ার ভয়ে আফগান দখলে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে। তাদের রাস্তায় কবিলাগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৪. আফগানের ভেতরেও মুজাহিদরা আফগান প্রশাসনের সাথে মিলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা লিখেছে যে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত মুজাহিদদের হামলা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পেশওয়ার শহরে কোনো ইংরেজ রাস্তায় বের হতে পারত না। সেই সময় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা আটটি বড় অপারেশন চালায়, যাতে তারা কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যার মধ্যে একটি বড় অপারেশন ছিল মেজর নিকলসনের নেতৃত্বে তাহরিকে মুজাহিদিনের মারকাজ সাত্তানাতে হামলা। মুজাহিদরা এই অপারেশনের ফলে পিছু হটে বুনের অঞ্চলের মালকায় চলে আসে।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধ

১৮৫৭ সালের মে মাসে মিরাঠ অঞ্চলে ব্রিটেনের হিন্দুস্থানি বাহিনীর 'বাঙ্গালি ফৌজ' বিদ্রোহ করে। তারা মিরাঠের সমস্ত ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে পালিয়ে দিল্লি চলে আসে। সেখানেও তারা ইংরেজদের গণহত্যা করে এবং বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার আবেদন জানায়। যার ফলে তখন দিল্লি মুসলিমদের দখলে চলে আসে। এটি ছিল হিন্দের মুসলিমদের ইংরেজদের থেকে আজাদির একটি সোনালি মুহূর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাহাদুর শাহ জাফর সেনাদের নেতৃত্ব দিতে পারার মতো সাহসী ছিলেন না। সে বিদ্রোহী বাহিনীকে জেনারেল বখত খানের নেতৃত্বে ছেড়ে দেয়। আস্তে আস্তে এই বিদ্রোহ লক্ষ্ণৌ, জানসি ও শামেলিতে পৌঁছে যায়। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধকে দমনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ইংরেজদের নতুন ভর্তি হওয়া ৪৪ হাজারের বাহিনী, যাদেরকে পাঞ্জাবের চকোয়াল ও রাওয়ালপিন্ডি জেলার মুসলিমদের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের সাথে গাইডের ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যারা মেজর নিকলসনের নেতৃত্বে ২৭ দিনের মধ্যে ৬শ মাইল সফর করে দিল্লি পৌঁছায় এবং হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্রিটেনের বাদশাহর রাজত্ব ও রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি গঠন

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ মুসলিম নামধারী গাদ্দারদের কারণে ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে কোম্পানির হুকুমত খতম হয়ে হিন্দুস্থান সরাসরি ব্রিটেন রাজ্যের অধীনে চলে যায়। কোম্পানির প্রেসিডেন্সি বাহিনীগুলোর নাম রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি রাখা হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একমত যে, ১৮৫৭ সালে হিন্দুস্থানের বিদ্রোহ কোম্পানির হুকুমতের জন্য ছিল বিশাল ধাক্কা। কিন্তু এই বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবের তিন জেলা ঝিলাম, চাকোয়াল ও রাওয়ালপিন্ডি এবং পশতুনের দুই জেলা বুনের ও কোহাট ইংরেজদের চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে। তারা পরবর্তী সময়ে ইংরেজ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলিমদের কেন্দ্র উসমানি খিলাফতকে পতন করে মুসলিম উম্মাহর কর্তৃত্ব ধ্বংসের পাশাপাশি মুসলিমদের প্রথম কিবলা ইহুদিদের দখলে দিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছিল। এই এলাকাগুলো ইংরেজদের এতটাই সাহায্য করেছিল যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই জেলাগুলোকে ব্রিটেন সাম্রাজ্যের তরবারি বলা শুরু করে। এই জেলাগুলো থেকে ভর্তি করা সেনা এতটাই অনুগত ছিল যে, ইংরেজ জেনারেলরা শুধু বাংলার বাহিনী নয়; বরং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাহিনীতেও পাঞ্জাব, বুনের ও কোহাটের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা শুরু করে। এমনিভাবে আস্তে আস্তে ইংরেজদের পুরো বাহিনীর ৬০% থেকে ৭০% অংশ এই জেলাগুলোর সেনা দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। ইংরেজরা এই জাতিকে লড়াকু জাতি বা মার্শাল রেইস ঘোষণা দেয়। ইংরেজদের দেওয়া এই উপাধি আস্তে আস্তে একটি বিশ্বাস আকারে বাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যা আজও পাকিস্তানের বাহিনীর মধ্যে একটি মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়।

উত্তর কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র এবং আম্বেলার যুদ্ধ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধে মার্দানে অবস্থিত ৫৫তম বাঙ্গালী বাহিনী বড় আকারে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ শুরু করার ক্ষেত্রে মুজাহিদদের অনেক সাহায্য ছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধকে দমানোর পর ইংরেজদের তদন্তে এটা প্রমাণিত হয় যে, মুজাহিদরা শুধু বিদ্রোহই করায়নি; বরং বাঙ্গালী বাহিনী থেকে পলায়নকারী সেনাদেরও আশ্রয় দিয়েছিল।

এই বিদ্রোহের সাজা হিসেবে ১৭৫৮ সালে ইংরেজ বাহিনী মুজাহিদদের মারকাজ সাত্তানাতে হামলা করে। কিন্তু মুজাহিদরা যেহেতু গেরিলা দল ছিল, তাই তারা সাত্তানা থেকে পিছু হটে বুনের জেলার মালকাতে চলে যায়; যার ফলে ইংরেজদের হামলা ব্যর্থ হয়। কয়েক বছর মুজাহিদ ও ইংরেজদের মাঝে যুদ্ধ চলমান থাকে। মুজাহিদরা ইংরেজদের এতটাই চাপে ফেলে দেয় যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে পেশওয়ার শহরে ইংরেজরা দিনের বেলায় রাস্তায় বের হতে পারত না। সর্বশেষ ১৮৬৩ সালে ব্রিটেন প্রশাসন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বালকার ওপর এক বড় অপারেশনের পরিকল্পনা করে, যা ইতিহাসে আম্বেলা যুদ্ধ বা আম্বেলা ক্যাম্পেইনের নামে প্রসিদ্ধ।

এই যুদ্ধে ইংরেজদের প্ল্যান ছিল, মুজাহিদদেরকে উত্তর দিকের পাহাড়ে যেতে না দিয়ে বরং দক্ষিণ দিকে সিন্ধু নদীর দিকে পিছপা হতে বাধ্য করা হবে। এবং সেখানে পূর্ব থেকেই ইংরেজদের একটি বাহিনী মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই হামলার প্ল্যান অনেক গোপন রাখা হয়। তদের ইচ্ছা ছিল বুনের জেলার চামলাহ উপত্যকার 'ডেরা আম্বেলা' পার হয়ে মুজাহিদদের মারকাজ মালকার ওপর আক্রমণ করবে। এই অপারেশনের প্ল্যান ছিল তিন সপ্তাহের।

১৮৬৩ সালের ১৯ অক্টোবর ইংরেজ বাহিনী জেনারেল ন্যাভিল চার্লিম্যানের নেতৃত্বে ছাউনি থেকে রওয়ানা হয় এবং আম্বেলা উপত্যকার দুই পাশের পাহাড়ে চৌকি প্রতিষ্ঠা করে। যার মধ্যে উত্তর চৌকির নাম ছিল ঈগলের দৃষ্টি এবং দক্ষিণ চৌকির নাম ছিল ক্র্যাগ পিক্ট। ১৮৬৩ সালের ২২ অক্টোবর যখন ইংরেজ বাহিনী জেনারেল চার্লিম্যানের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। কারণ মুজাহিদরা পূর্ব থেকেই সেখানে প্রস্তুত ছিল। সোয়াত, বাজুর, বুনেরের মুজাহিদ সিংহরা আল্লাহ তাআলার দুশমনদের মোকাবিলার জন্য আম্বেলার অঞ্চলে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।

মুজাহিদরা ১৮৬৩ সালের ৩০ অক্টোবর ক্রেগ পিক্টের ওপর হামলা করে। ফলে সেখানে থাকা প্রথম পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন পিছপা হতে বাধ্য হয়। ১ম ও ২০তম পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন এই পিক্টকে দখল করার জন্য পাল্টা হামলা করে। ফলে মুজাহিদরা পিছপা হয়। এই ২০তম পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন বর্তমান পাক বাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অংশ। ১৮৬৩ সালের ১৩ নভেম্বর মুজাহিদরা আবার ক্রেগ পিক্ট দখল করে নেয়। কিন্তু কিছু দিন পর তাদের দ্বিতীয়বার পিছপা হতে হয়। ২০ নভেম্বর মুজাহিদরা তৃতীয়বার ক্রেগ পিক্ট দখল করে নেয়। এইবার হামলায় ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল জেনারেল চার্লিম্যান নিজেই। সে হামলায় কঠিনভাবে আহত হয়ে ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের এই স্তরে এসে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইংরেজ বাহিনী অন্যের সাহায্য ব্যতীত এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না। তাই লাহোর, শিয়ালকোট ও চেহলাম থেকে নতুন বাহিনী রওয়ানা হয়, যাদের নেতৃত্বে ছিল জেনারেল গার্ভাক। এই গার্ভাক এসে চার্লিম্যানের জায়গায় বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

তবে এই সাহায্য দ্বারা কোনো ফায়দাই হয়নি। ইংরেজ বাহিনী এই আক্রমণ তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ করার জন্য বের হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও আম্বেলা সীমানাতেই পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। ইংরেজরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই নীতি জানত যে, যদি সরাসরি যুদ্ধে বিজয় না আসে, তাহলে পেছন দিয়ে গাদ্দার সৃষ্টি করতে হবে। এখানেও বুনেরের মালিক ও খানরা সোয়া লাখ রুপিতে গাদ্দারি করতে রাজি হয়। তারা প্ল্যান করে যে, ইংরেজ বাহিনীর একটি দল খানদের সহায়তায় মুজাহিদদের মারকাজে গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেবে। অতঃপর এমনটাই হয়, এই খানদের সহায়তায় ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি টিম মালকায় মুজাহিদদের ঘাঁটিতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে ফিরে

আসে। ইংরেজ বাহিনীতে থাকা পাকিস্তানের বাহিনীর পাঞ্জাব ও ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সেনারা এই কাজে মূল ভূমিকা পালন করে। মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে মোল্লা আখন্দ সোয়াতির সাথে মুজাহিদদের আমির মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহর ছেলে মাওলানা আব্দুল্লাহও ছিলেন। তারা মুজাহিদদের সুসংগঠিত করেছিলেন। এটা ছিল আম্বেলা যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন লড়াই। এই যুদ্ধের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে, যদি ইংরেজরা এই খানদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র না করত, তাহলে সম্ভবত চিরদিনের জন্য তাদেরকে পুরো সীমান্ত এলাকা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হতো।

দক্ষিণ কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র ও মৌলভি গোলাবুদ্দিন

সেই সময় উত্তর কাবায়েলি এলাকা ছাড়াও দক্ষিণ কাবায়েলি এলাকাতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হচ্ছিল। এখানের বিশেষভাবে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব আলোচনার যোগ্য, যারা এই জিহাদকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মৌলভি গোলাবুদ্দিন, মোল্লা পাওয়েন্দা, শাহজাদা ফজলুদ্দিন ও ফকির আইপি।

দক্ষিণ কবিলাগুলোতে মৌলভি গোলাবুদ্দিনই প্রথম জিহাদের সূচনা করেছেন। তিনি ওয়াজিরের মৌলভি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৮৫২ সালে প্রথমবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করে শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন। এই যুদ্ধে তার কাছে ওয়াজির, মাসুদ, দাউদ, বেলুচ ও খাটাক-সহ সমস্ত কবিলা একত্রিত হয়ে যায়। তিনি দাউদ শাহ ও মেহমান্দ খাইলে ইংরেজদের মোকাবিলা করেন। কিন্তু ইংরেজরা যখন সেখানে তার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তখন কিজুরিস্থানে মারকাজ বানিয়ে নেন। সেখানে তিনি বন্দুক ও তোপ বানানোর জন্য অস্ত্রাগার নির্মাণ করেন। সেই সময়ের একটি তোপ আজও ওয়াজিরিদের এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি স্পেনাম, গ্রিউম ও দুসলি অঞ্চলেও কেল্লা নির্মাণ করেন, যেখানে সর্বদা আট-দশ হাজার সেনা উপস্থিত থাকত। এই প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজরা তার জীবদ্দশায় উত্তর ওয়াজিরিস্তানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। তিনি তারবিয়াতের এমন গঠনমূলক কার্যক্রম চালু করেছিলেন, যার ফলে তিনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই মোল্লা পাওয়েন্দার মতো ব্যক্তিত্ব জিহাদের ময়দানে তৈরি হয়। কিজুরিতেই তিনি মারা যান।

ক্রিমিয়া যুদ্ধ এবং মধ্য এশিয়া ও বলকানের ওপর রাশিয়ার দখলদারিত্ব

১৮৫৩ সালে রাশিয়া ও উসমানিদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যাকে ইতিহাসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধের কারণ ছিল, রাশিয়া খ্রিষ্টানদের পবিত্র স্থান বাইতুল মুকাদ্দাসের জিম্মাদারি নিতে চাচ্ছিল, যা উসমানিরা এক চুক্তির ভিত্তিতে ফ্রান্সকে দিয়ে দিয়েছিল। রাশিয়ার জার ছিল অর্থডক্স গির্জার মূল সদস্য। অন্যদিকে ফ্রান্স রোমান ক্যাথলিক গির্জার পক্ষ থেকে এই জিম্মাদারি গ্রহণ করেছিল। রাশিয়ার জার খলিফার কাছে আবদার পেশ করে, যাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দায়িত্ব ফ্রান্স থেকে নিয়ে তাকে দেওয়া হয়। ফ্রান্স এতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাশিয়ার জার নিকোলাস ক্রিমিয়ার ওপর হামলা করে, যা কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্তী উসমানিদের এলাকা ছিল এবং একসময় তা দখল করে নেয়। ফলে উসমানিরা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই যুদ্ধে উসমানিদের সাথে অংশ নেয়। ১৭৫৬ সালে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং রাশিয়া সেই এলাকা ফিরিয়ে দেয়। যুদ্ধ শেষে হয় প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে।

গ্রেট গেইমের ইউরোপীয় যুগ শুরু হয় ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তির পর থেকেই। এই চুক্তিতে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র উসমানিদেরকে ইউরোপের অংশ হিসেবে মেনে নেয় এবং তাদের এলাকা রক্ষারও দায়িত্ব নেয়। কিন্তু কয়েক বছর পরেই এই চুক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল উসমানিদের ভেতর থেকে খিলাফতের শক্তিকে দুর্বল করা। এই কাজের জন্য তারা উসমানি অঞ্চলে থাকা খ্রিষ্টানদের সাহায্যে শাম, লেবানন ও বুলগেরিয়াতে বিশৃঙ্খলা ঘটায় এবং তাদেরকে রক্ষার নামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। অপরদিকে তুর্কি যুবকদের দল ইয়াং তুর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সমতার স্লোগান প্রচার করতে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল খলিফার শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া।

অপরদিকে রাশিয়া আবারও উঠে দাঁড়ায় এবং সে দক্ষিণ দিকে সীমানা বাড়িয়ে ১৮৬৫ সালে প্রথমে তাশকান্দ দখল করে এবং তিন বছর পর ১৮৬৮ সালে বুখারা, অতঃপর পাঁচ বছর পর ১৮৭৩ সালে ককেশাস দখল করে নেয়। ফলে হিন্দুস্থানের ইংরেজ জেনারেল লর্ড ল্যাটিন ব্রিটেন সাম্রাজ্যের কাছে অর্থডক্স রাশিয়ানদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা ব্যক্ত করতে থাকে। কেননা, এর ফলে রাশিয়া ব্রিটেনের সাম্রাজ্য থেকে মাত্র চারশ কিলো দূরে চলে এসেছিল। অপরদিকে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছিল। কারণ রাশিয়া ১৮৭৭ সালে বলকানের ওপর হামলা করে, যা ছিল উসমানিদের অঞ্চল। বলকান রাষ্ট্রও স্বাধীনতার নামে রাশিয়ার সাথে মিলিত হয়ে যায়।

'আন্ডার নোপেল' দখলের সাথে সাথে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অনুভূত হয় যে, রাশিয়া হয়তো সমস্ত অঞ্চল বিজয় করে নিতে চাচ্ছে। তাই ব্রিটেন নিজেদের সামুদ্রিক বহর মর্মর

সাগরে পাঠিয়ে দেয়; যার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যুদ্ধের বিস্তারিত পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর 'বার্লিন চুক্তি' হয়; যেখানে মান্টিনিগ্রো, গ্রিক, রোমানিয়া, সার্বিয়াকে উসমানি খিলাফতের অধীন থেকে স্বাধীন ও স্বকীয় রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। অপরদিকে উসমানিদের এলাকা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর এভাবেই উসমানিদের পুরো ইউরোপিয়ান অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যায়।

উসমানিদের আইনি (পার্লামেন্টারি) যুগ (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)

যেমনটা ওপরে বলা হয়েছে, ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে সুলতান মাহমুদ ও পরবর্তী সুলতানরা পরিস্থিতিকে উন্নত করার নামে সালতানাতে নতুন পরিবর্তনের ধারা শুরু করে। আর এর উদ্দেশ্য ছিল সালতানাতকে পশ্চিমা ধাঁচে সজ্জিত করা। কিন্তু নতুনভাবে পরিবর্তনের ফলে কোনো উন্নতি তো হয়নি, উলটো 'ইয়াং তুর্ক' নামের এমন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, যাদের দাবি ছিল, রাষ্ট্রের জন্য মানব-রচিত আইন বানাতে হবে এবং পার্লামেন্ট বানিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। সুলতান আব্দুল হামীদ দ্বিতীয় রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম পার্লামেন্ট তৈরির অনুমতি দেন। এর অধীনে কোনো পার্টি ব্যতীত ১৮৭৭ সালে প্রথম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৮৭৮ সালে এই পার্লামেন্টকে আব্দুল হামীদ ভেঙে দেন। ১৮৭৮ সালে আবারও পার্লামেন্টের জন্য নির্বাচন হয়। অতঃপর এটাকেও বিভিন্ন মতানৈক্যের ফলে ভেঙে দেওয়া হয়। যার ফলে রাষ্ট্রের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। রাষ্ট্রের কয়েকটি অংশের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। এই ধারা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে। ১৯০৮ সালে জনগণের চাপে সুলতান আব্দুল হামীদ আবারও পার্লামেন্ট চালু করেন। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯০৯ সালে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। তাকে হটিয়ে তার ভাই মুহাম্মাদ পঞ্চম সিংহাসন দখল করে। আব্দুল হামীদের বিরুদ্ধে তুর্কি যুবকদের এই বিদ্রোহে তিনজন পাশা সাহায্য করেছিল। এই তিনজন ছিল আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা ও জামাল পাশা। এই তিন পাশার ওপরই অভিযোগ ছিল যে, তারা উসমানিদেরকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করেছিল। এর আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সুয়েজ খাল নির্মাণ, ব্রিটেনের মিশর দখল ও মাহদি সুদানির জিহাদ

মিশর ষোড়শ শতাব্দীতে সুলতান প্রথম সালিমের সময় উসমানিদের অধীনে এসেছিল এবং ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তাদের অধীনেই থাকে। এই সময়ের মধ্যে কয়েকবার ক্ষমতার পালাবদল হয়। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর দখল করে। পরবর্তী সময়ে নেপোলিয়ন মিশর থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। নেপোলিয়ন বের হওয়ার পর মুহাম্মাদ আলি পাশা মিশর দখল করে। মুহাম্মাদ আলি পাশার বংশ ১৮০৫-১৯৫২ পর্যন্ত মিশরে রাজত্ব করে। পরবর্তী সময়ে এক সেনা বিদ্রোহের মাধ্যমে জামাল আব্দুন নাসের শাহ ফারুকের বাদশাহি বিলুপ্ত করে তাকে দেশান্তর করে দেয়। ১৮৫৯ সালে সাদি পাশা ফ্রান্সের সাহায্যে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরকে মিলিত করার জন্য খাল খননের পরিকল্পনা করে। যার ফলে মিশরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। শুরুতে ব্রিটেন এই পরিকল্পনাকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কেননা, ইঞ্জিনিয়ারদের মতে এটা ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু ১৮৬৯ সালে ইসমাইল পাশার সময় এই প্ল্যান বাস্তবায়িত হয়ে যায়। যার ফলে ইউরোপ থেকে হিন্দের পথ এক-তৃতীয়াংশ থেকেও কমে যায়। এর ফলে এই রাস্তার গুরুত্ব ব্রিটেনের কাছে অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৫ সালে ব্রিটেন মিশরের কাছ থেকে সুয়েজ খালের অংশ ক্রয় করে নেয়। ইসমাইল পাশার পর তাওফিক পাশার সময় এই বিক্রির বিরুদ্ধে আহমাদ আরাবি নামের এক জাতীয়তাবাদী নেতা বিদ্রোহ করে বসে। আরাবি ছিল মিশরে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের অনুপ্রবেশের বিরোধী। এই বিদ্রোহ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেয় এবং আরাবির সফলতার ফলে সুয়েজ খাল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাত থেকে ছুটে যায়। ব্রিটেন তাওফিক পাশার সাহায্যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠায়, যেখানে হিন্দুস্থান থেকে আসা সাত হাজার সেনাও ছিল। এই বাহিনী তেল আল-কাবিরের যুদ্ধে আরাবির বাহিনীকে পরাজিত করে। ফলে মিশর ব্রিটেনের দখলে চলে আসে এবং ক্রোমারকে মিশরের ভাইসরয় বানিয়ে দেওয়া হয়।

মিশর বিজয়ের পর ব্রিটেন দ্বিতীয়বার সুদান (যা পূর্বে মিশরের অংশ ছিল) বিজয়ের জন্য পরিকল্পনা করে। এই প্রদেশটি ছিল মুহাম্মাদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহর দখলে, যে মাহদি সুদানি নামে প্রসিদ্ধ। মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ নিজেকে মাহদি দাবি করে সুদান দখল করে। ১৮৮৪ সালে মাহদি সুদানি খার্তুম দখল করে এবং ব্রিটেনের গভর্নর জর্জ গর্ডনকে হত্যা করে। গর্ডনের সাহায্যে মিশর থেকে প্রেরিত দুটি বাহিনীকে মাহদি সুদানির বাহিনী পরাজিত করে। ১৮৮৫ সালে মাহদি সুদানির মৃত্যু হয়। মাহদির উত্তরসূরিরা সেখানে শরিয়াহ বাস্তবায়ন শুরু করে। সুদানির প্রতিষ্ঠিত এই শাসন প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে সেই বাহিনী ইথিওপিয়া ও মিশর দখলের চেষ্টা করে।

১৮৯৬ সালে ব্রিটেনের জেনারেল কিচেনার সুদানে হামলা করে। দুই বছরের কঠিন যুদ্ধের পর ১৮৯৮ সালে 'আমদারমান' লড়াইয়ে সুদানির বাহিনী পরাজিত হয়। আমদারমানের পরাজয়ের কারণ ছিল নতুন পদ্ধতির যুদ্ধ না বোঝা। এই যুদ্ধে মেশিনগান দ্বারা হাজারো মুজাহিদকে শহিদ করা হয়। মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তারা তোপ ও মেশিনগানের ফায়ারের সামনে কোনো প্রতিরক্ষা ছাড়াই সোজা চলে আসত। যার ফলে এই যুদ্ধে প্রায় ৩৫ হাজার মুজাহিদ শহিদ বা আহত হয়। এক যুদ্ধে এত বিশাল ক্ষতি এই আন্দোলনের সামরিক শক্তিকে পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় এবং সুদান তাদের হাত থেকে ছুটে যায়। এই যুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে।

কাবায়েলি অঞ্চলের ওপর ব্রিটেনের আক্রমণ পলিসি (১৮৮৭-১৯০০ খ্রি.)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈশ্বিক রাজনীতিতে কয়েকটি পরিবর্তন আসে। তখন রাশিয়া মধ্য এশিয়ার অনেক অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। উজবেকিস্তানের কোকান্দেও তারা পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব ইউরোপেও রাশিয়া নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করে ফেলেছিল। মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো দখলের ফলে রাশিয়া হিন্দুস্থান থেকে মাত্র চারশ কিলো দূরে চলে এসেছিল। তাদের দৃষ্টি ছিল তখন আফগানের ওপর। এই সব অবস্থা হিন্দুস্থানের ইংরেজদের জন্য অনেক বেশি চিন্তার কারণ ছিল। তাদের গৃহীত বন্ধ বর্ডার পলিসি জিহাদের ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা হিন্দুস্থানের কাবায়েলি এলাকার জন্য আক্রমণাত্মক পলিসি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পলিসির মধ্যে তিনটি ধাপ ছিল :

১. ইংরেজরা সামনে বেড়ে কাবায়েলি এলাকাগুলো দখল করবে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-লাইন তৈরি করবে।

২. ইংরেজরা আফগান পূর্ণভাবে দখল করে নেবে অথবা আফগান সরকারের সাথে রাশিয়ার হামলায় ব্রিটেনকে সাহায্যের চুক্তি করবে।

৩. আফগান ও ব্রিটেনের মাঝে একটি সীমান্ত নির্ধারণ করা হবে।

এই সমস্ত পরিস্থিতি দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের জন্ম দেয়।

দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ (১৮৭৯ খ্রি.)

১৮৭৭ সালে স্যার রবার্ট স্যান্ডম্যান গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে বেলুচিস্থানে আসে। এখানে সে কালাতের খানের সাথে একটি চুক্তি করে। যার মাধ্যমে ব্রিটেন চমান, ডেরা বুলান ও ডেরা খুজাক দখল করে নেয়। এই সফলতা দেখে সান্ডিমান বন্ধ বর্ডার পলিসি ত্যাগ করে আক্রমণাত্মক পলিসি নির্ধারণ করে এবং তা সে আফগান

সীমান্তে প্রয়োগের চেষ্টা করে। এই পলিসির দুটি বড় লক্ষ্য ছিল। একটি হলো রাশিয়াকে যতটা সম্ভব তাদের সাম্রাজ্য থেকে দূরে রাখা। অপরটি ছিল দায়িত্বশীল নির্ধারণ করে আফগানের সাথে সীমানা বন্ধ করে দেওয়া। ব্রিটেনের এই সম্প্রসারণ নীতির ফলে আফগানের শাসক আমির দোস্ত মুহাম্মাদের ছেলে আমির শের আলি বিপদ অনুধাবন করে।

তখনকার অবস্থা ছিল একদিকে ব্রিটেন আফগানে নিজেদের ইচ্ছাধীন শাসক প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল এবং অপরদিকে রাশিয়াও তাদের চাহিদা মুতাবিক শাসক নির্ধারণ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আফগান প্রশাসন এই দুই শক্তির কোনোটার অধীন হতে রাজি ছিল না। রাশিয়া তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য কাবুলে তার এক প্রতিনিধি পাঠায়, যে শের আলির সাথে মুলাকাত করে। কিন্তু সে কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। ঠিক সেই সময় ব্রিটেনের জেনারেল চার্লিম্যানের নেতৃত্বে ব্রিটেনের প্রতিনিধিও কাবুলে পৌঁছায়; কিন্তু শের আলি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করে। যখন লর্ড ল্যাটনের কাছে এই খবর পৌঁছায়, তখন সে শের আলিকে নিশ্চিত কোনো জবাব দেওয়ার জন্য পনেরো দিনের সুযোগ দেয়। কিন্তু শের আলি তাকে কোনো পাত্তাই দেয়নি। সময় শেষ হওয়ার পর ব্রিটেনের বাহিনী তিন দিক অর্থাৎ খাইবার, করম ও কান্দাহারের দিক থেকে আফগানের ওপর হামলা করে। এটাই ছিল ১৮৭৮ সালের দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের শুরু। কান্দাহারের দিকে রওয়ানাকৃত বাহিনী সহজেই কান্দাহার দখল করে নেয়। কিন্তু খাইবার ও করমের দিকে আগত বাহিনীকে কবিলাগুলো কঠিনভাবে মোকাবিলা করে। কিন্তু সর্বশেষ তারা কাবুল দখলে সক্ষম হয়। শের আলি রাশিয়ার দিকে পলায়ন করে এবং সেখানেই সে মৃত্যুবরণ করে। শের আলির ছেলে ইয়াকুব খান ১৮৭৯ সালের ২৬ মে গান্দামাক অঞ্চলে ইংরেজদের সাথে একটি চুক্তি করে, যার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছিল :

১. ইয়াকুব খান রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধে অংশ নেবে।

২. এই কাজের জন্য ব্রিটেন ইয়াকুবকে বৎসরে ২০ হাজার পাউন্ড দেবে।

৩. যদি রাশিয়া আফগানের ওপর হামলা করে, তাহলে ব্রিটেন তাদের সামরিক সাহায্য পাঠাবে।

৪. দিল্লিতে আফগান দূতাবাস তৈরি করা হবে।

এটি গান্দামাক চুক্তি (Treaty of Gandamak) নামে প্রসিদ্ধ। এই চুক্তির পর ব্রিটেনের এক প্রতিনিধি দল ক্যাভানারির (Sir Pierre Cavagnari) নেতৃত্বে আফগানে পৌঁছায়।

কিন্তু পূর্বের নীতি অনুযায়ী আফগান জাতি নিজেদের ধর্মীয় অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্য মোল্লা মেশকে আলমের ডাকে লাব্বাইক বলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য বের হয়ে আসে। ১৮৭৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মুজাহিদরা ব্রিটেনের প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ফেলে। সেই সময় তাদের সাথে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ৭৫ জন সেনা ছিল। মুজাহিদরা এই বাহিনীর

মুসলিম সেনাদের আলাদা হওয়ার আদেশ দেয়। কিন্তু হতভাগ্যরা ইংরেজদের নিমকহারামি করতে অস্বীকার করে এবং তাদের সাথে জাহান্নামে চলে যায়। এই হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য ১৮৭৯ সালের ২১ অক্টোবর জেনারেল রবার্টসের (Frederick Roberts) নেতৃত্বে করমের পথে ব্রিটেনের বাহিনী কাবুলের ওপর হামলা করে সেখানে প্রবেশ করে। কিন্তু মুজাহিদরা গাজি জান মুহাম্মাদ ওয়ার্দাকের নেতৃত্বে এই বাহিনীর শেরপুর সেনানিবাসকে ঘেরাও দিয়ে ফেলে।

সেই সময়ে মোল্লা মেশকে আলমের চেষ্টায় কান্দাহারের মুজাহিদরাও প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা হেরাতের গভর্নর আইয়ুব খানের নেতৃত্বে কান্দাহারে হামলা করে। 'মেওয়ান্দে' আইয়ুব খান ও জেনারেল স্টিওয়ার্ট (Gen Donald Stewart)-এর বাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক লড়াই হয়। যেখানে আইয়ুব খান কান্দাহার দখল করে সেখানের অধিকাংশ সেনাকে হত্যা ও বন্দী করে। বাধ্য হয়ে রবার্টস কান্দাহারের বাহিনীকে সাহায্যের জন্য কাবুল থেকে সেনা পাঠায়। যাদের সাহায্যে বাকি বাহিনী কান্দাহার থেকে বের হতে সক্ষম হয়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, ব্রিটেনের কাছে তখন কান্দাহারের যুদ্ধক্ষেত্র এবং কাবুলের যুদ্ধক্ষেত্র সামলানোর জন্য প্রয়োজনীয় বাহিনী ছিল না। তাই তারা আফগান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা বের হয়ে যাওয়ার পর শের আলির এক আত্মীয় আব্দুর রহমান কাবুলের সিংহাসনে বসে এবং ইংরেজদের সাথে কৃত 'গান্দামাক চুক্তি' অনুযায়ী চলার ওয়াদা করে। ইংরেজ বাহিনীকে আফগান থেকে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

ডুরান্ড লাইন (১৮৯৩ খ্রি.)

দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজরা সীমান্তে নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল না। একদিকে রাশিয়ার ভয় ও অপরদিকে আফগান কবিলাগুলোর ভয়, যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারা বেলুচিস্থানের চলমান আক্রমণাত্মক পলিসিকে কাবায়েলি এলাকাতেও ছড়িয়ে দেওয়ার ফয়সালা করে। এই নীতির দুটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্য ছিল আফগান ও পাকিস্তানের মাঝে সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া। এটা বাস্তবায়নের জন্য ১৮৯৩ সালে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার ডুরান্ড ও আফগানের আমির আব্দুর রহমানের মাঝে সীমান্তচুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে আমির আব্দুর রহমান কাবিলাগুলো নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পরিবর্তে কাবায়েলি এলাকা থেকে আলাদা হয়ে যায়। যার ফলে আফগান ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা সর্বদার জন্য অমীমাংসিত থেকে যায়। এই ফয়সালা বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজরা কাবায়েলি এলাকাতে সেনা-চৌকি নির্মাণ শুরু করে। কিন্তু কবিলাগুলো এই সমস্ত কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখছিল এবং মোল্লা পাওয়েন্দার নেতৃত্বে এই চৌকিগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে। যার ফলে দক্ষিণ কাবায়েলি এলাকায় যুদ্ধে অনেক উত্তপ্ততা চলে আসে।

মোল্লা পাওয়েন্দার জিহাদি আন্দোলন (দক্ষিণ কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র)

নাম মহিউদ্দিন, তিনি মাসুদ গোত্রের ছিলেন। তিনি ১৮৬৩ সালে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিন্নুর এক মাদরাসায় অর্জন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি সোয়াত চলে যান এবং সেখানকার আলিমদের সুহবতে থাকেন। অতঃপর সেখানে এক মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসেবে থাকা শুরু করেন। এ ছাড়াও তিনি সেখানে ইলমে দ্বীন শিক্ষা ও তাবলিগে জিহাদের ধারাবাহিক দরস চালু করেন। সেই সাথে সোয়াতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। যার ফলে একসময় ইংরেজরা তাকে ব্রিটেন সাম্রাজ্যের অধীনে সোয়াতের শাসন ও বাৎসরিক সত্তর হাজার রুপি দেওয়ার লোভ দেখায়; যাতে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে নিজ এলাকা ওয়াজিরিস্তানে চলে আসেন এবং ব্রিটেন বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। তার সাহসিকতার ফলে তাকে 'ওয়াজিরিস্তানের বাদশাহ' হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। তিনি বলতেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও মুসলিম-ভূমি রক্ষার জন্য জিহাদ শুরু করেছি। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে একাই লড়াই চালিয়ে যাব; তবুও ইংরেজদেরকে ওয়াজিরিস্তান থেকে তাড়িয়েই ছাড়ব।' শুরুতে তিনি গোপনে কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু যখন পাঁচ হাজার সদস্য হয়ে যায়, তখন প্রকাশ্যে জিহাদ শুরু করেন।

১৮৯৬ সালে ইংরেজদের এক গোপন নথিতে পাওয়া যায়, মোল্লা পাওয়েন্দা ছিলেন ওয়াজিরিস্তানের সর্বোচ্চ আলিমদের একজন, যিনি ইংরেজদের জন্য কঠিন সমস্যা তৈরি করেন। তার জিহাদের ফলে সীমান্ত এলাকার দক্ষিণ অংশে ইংরেজদের পেরেশানি বৃদ্ধি পায়। যার ফলে লর্ড কার্জন মোল্লা পাওয়েন্দাকে এক নম্বর বদমাশ ঘোষণা দেয়। ইংরেজরা সর্বদাই তাকে ওয়াফাদারির বদলাস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভ দেখাত; কিন্তু তিনি কখনো তা গ্রহণ করেননি। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা তার বিরুদ্ধে তেরো জন সাধারণ নাগরিক হত্যাসহ আরও কয়েকটি অভিযোগ তুলে মামলা করে এবং তার ভূমি দখল করে নেয়।

মৃত্যুর পর তার ব্যাপারে জেনারেল এলিট বলেছিল, 'মোল্লা পাওয়েন্দা ব্রিটেনের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। নিজ কবিলার দৃষ্টিতে তিনি অবশ্যই সম্মানের উপযুক্ত ছিলেন। স্বতন্ত্র চিন্তা ও দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবৈধ কর্মকাণ্ড করেছিলেন।' মনে রাখতে হবে, তখনকার 'বদমাশ' আজকের সময়ের 'সন্ত্রাসী' উপাধির সমার্থক এবং 'অবৈধ কর্মকাণ্ড' আজকের সময়ের সন্ত্রাসবাদের সমার্থক। তিনি কাবায়েলি এলাকাগুলোতে আলিমদের এক বড় জামাআত তৈরি করেন, যারা সেখানে দ্বীনের ইলম ও জিহাদের শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি মারা যান।
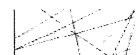
লর্ড কার্জনের পলিসি

কাবায়েলি যুদ্ধের চাপে ইংরেজরা কাবায়েলিদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দেয়। কিন্তু লর্ড কার্জন হিন্দুস্থানের ভাইসরয় হয়ে আসার পর সে আবার চক্রান্ত শুরু করে। এই চক্রান্তে কবিলাগুলোতে এমন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়, যা আজও প্রতিষ্ঠিত। সে ১৯০১ সালে পেশওয়ার, মার্দান, কোহাট ও ডেরা ইসমাইল খানকে পাঞ্জাব থেকে আলাদা করে সীমান্ত প্রদেশের নামে একটি আলাদা অঞ্চল গঠন করে। কবিলাগুলোর স্বাধীন ক্ষমতাকে মেনে নেয় এবং ইংরেজদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধিকে পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে কবিলাগুলোর সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পাঠানো হয়। এই পলিটিক্যাল এজেন্ট কাবায়েলি মালিকদের সাথে সম্পর্ক রাখত। এভাবেই কাবায়েলি এলাকা ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সীমানা তৈরি হয়ে যায়।

রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির নতুন গঠন

দ্বিতীয় আফগান জিহাদের পর ব্রিটেন সাম্রাজ্যে হিন্দুস্থানি বাহিনীর কার্যক্রম নিয়ে অনেক পর্যালোচনা হতে থাকে। তখন বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল রবার্ট একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্টে সে হিন্দুস্থানি বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে পর্যালোচনা করে বলে, 'এই বাহিনী লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হ্যাস্টিংস এর থিউরি অনুযায়ী গঠিত হয়েছে। সেই সময় চ্যালেঞ্জ ছিল হিন্দুস্থানকে অভ্যন্তরীণভাবে বিজয়ী করা ও ব্রিটেনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে তা রক্ষা করা। কিন্তু এখন ব্রিটেনের চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে এখন অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বহিরাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আফগানের দিকে রাশিয়ার অগ্রসরতাকে বাধা দেওয়া এবং দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ সমুদ্রপথ রক্ষা করা, যা ব্রিটেনকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে সুয়েজ খাল হয়ে হিন্দুস্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ আন্তর্জাতিকভাবে রাশিয়া ও উসমানিদের পরাজিত করে ব্রিটেনকে সুপার পাওয়ার বানানো। কিন্তু হিন্দুস্থানি বাহিনী এই তিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পূর্ণভাবে অক্ষম; তাই রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে নতুনভাবে গঠন করতে হবে।'

রবার্টসের এই পরিকল্পনাকে ব্রিটেন-প্রশাসন অনেক গুরুত্বের সাথে নেয় এবং এই প্ল্যানের ওপর কাজ শুরু করে। শুরুতে ১৮৯৫ সালে হিন্দুস্থানি বাহিনীর একটি নতুন গঠন হয়েছিল। যেখানে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গালের বাহিনীকে হিন্দুস্থানের ওপর রাশিয়ার হামলা প্রতিরোধের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির আসল প্রতিষ্ঠাতা ছিল লর্ড কিচেনার। ১৯০৩ সালে লর্ড কিচেনারকে হিন্দুস্থানের বাহিনীর কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়, যে ছিল মুসলিমদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুশমন। সে-ই মাহদি সুদানির আন্দোলনকে দমানোর জন্য সেখানের মুসলিমদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল, অতঃপর উসমানিদের

বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী ছিল। ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কিচেনার রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে যেই নতুন গঠন করেছিল, তার গুরুত্ব বোঝার জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে, পাক বাহিনী আজও সেই গঠনেই রয়েছে। হিন্দুস্থানি বাহিনীর এই নতুন গঠনে কিচেনার চারটি মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেনাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে, যার নির্দেশনা জেনারেল রবার্টস তার রিপোর্টে দিয়েছিল। সেই লক্ষ্যগুলো ছিল :

১. দেশের অভ্যন্তরে ল এন্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠিত রাখা।

২. হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমান্তকে রাশিয়া ও কাবায়েলি হামলা থেকে নিরাপদ রাখা।

৩. ইউরোপ থেকে হিন্দুস্থান পর্যন্ত সামুদ্রিক রাস্তাকে নিরাপদ করা।

৪. উসমানিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেট গেইম যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে সেনা সরবরাহ করা।

এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য সে ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মির পুরাতন গঠনকে—যা বাঙ্গাল, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীর নামে ছিল—বিলুপ্ত করে তিন বাহিনীকে একত্রিত করে ফেলে। অতঃপর এর গঠন নতুন সামরিক সিস্টেম অনুযায়ী ব্যাটালিয়ন, ব্রিগেড ও ডিভিশন হিসেবে সাজিয়ে তোলে। কিচেনার এই বাহিনীকে নয়টা ডিভিশনে ভাগ করে, যার মধ্যে প্রত্যেক ডিভিশনের সাথে একটি ঘোড়-সওয়ার ব্রিগেড ও তিনটি করে পদাতিক ব্রিগেড অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর হিন্দুস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ কমান্ড নামে এই নয় ডিভিশনকে সেই এলাকাগুলোতে ভাগ করে দেওয়া হয়। উত্তর কমান্ডে রাওয়ালপিন্ডি, পেশওয়ার ও কোয়েটাতে একেকটি করে ডিভিশনকে রাখা হয়। দক্ষিণ কমান্ডে মাহোয়া, লক্ষ্ণৌ এবং সিকান্দারাবাদে একটি করে ব্রিগেড রাখা হয়। এই বাহিনীর একটি ডিভিশন বার্মাতেও স্থাপন করা হয়েছিল। সামুদ্রিক রাস্তাকে হিফাজতের জন্য একটি ব্রিগেড ইয়ামানের এডেন বন্দরে রাখা হয়। এদের এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়, যাতে উপযুক্ত সময়ে তারা উসমানিদের বিরুদ্ধে সেনা সাপোর্ট দিতে পারে।

জেনারেল কিচেনারের এই নতুন গঠন শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এখানে সদস্য নির্বাচন ও নিযুক্ত করার ক্ষেত্রেও নতুন সিস্টেম ছিল। যা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির মুসলিম নামধারী সেনাদেরকেও এমন বানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা ব্রিটেনের সম্মানে যেকোনো মুসলিমশক্তির সাথে টক্কর দিতেও কোনো পরোয়া করত না। এমনকি এই বাহিনীর কার্যক্রমের দ্বারা যদি মুসলিমদের খিলাফত ধ্বংস ও মুসলিম উম্মাহ টুকরা টুকরা হয়ে যায়, তাহলেও তাদের ইমানে কোনো আঁচ লাগবে না। এই বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলিমদের হাত থেকে ছিনিয়ে খ্রিষ্টানদের হাতে সোপর্দ করে দেওয়ার পরেও নিজেরা এই স্বীকৃতি দেবে যে, আমরা এখনো মুসলিম। এই গোলামির ফলে তারা ব্রিটেন সাম্রাজ্যের বড় থেকে বড় পদে ভূষিত হচ্ছিল, তারপরেও তারা নিজেদের মুসলিম উম্মাহর অংশ মনে করত।

যদিও এটা এক আশ্চর্যজনক বিষয়; কিন্তু এটাই ছিল বাস্তবতা, এমনটাই হয়েছিল এবং আজও এমনটাই হচ্ছে। এই কার্যক্রম ছিল পশ্চিমাদের 'ধর্মহীন যুদ্ধ থিউরির' ফল, যা প্রুশিয়ার জেনারেল ক্লজউইজ খ্রিষ্টানদের যুদ্ধ-বিশ্বাসের মোকাবিলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পেশ করেছিল। যা পরবর্তী সময়ে পুরো ইউরোপের সমস্ত বাহিনী গ্রহণ করে নেয় এবং আজ পুরো দুনিয়ার সমস্ত স্থানীয় বাহিনীগুলোর সমর-বিশ্বাস এমনটাই। ক্লজউইজের এই সামরিক মতাদর্শ রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির মূল বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং সেই ভিত্তিতে নতুনভাবে সাজানো হয়।

ক্লজউইজের এই যুদ্ধনীতি অনুযায়ী কোনো বাহিনী লড়াই করা ও নিজেদের জান বিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা চারটি লক্ষ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় :

১. দেশের ভালোবাসার জন্য,

২. নিজ রেজিমেন্ট বা ব্যাটালিয়নের সম্মানের জন্য,

৩. নিজ পেশার জন্য,

৪. নিজের কোনো বন্ধু বা সাথির জন্য, যাকে ইংরেজিতে (Buddy) বলা হয়।

দেশপ্রেম এমন এক নেশা, যার জন্য মানুষ নিজের জান কুরবান করতে পারে। তেমনিভাবে যেই রেজিমেন্টের প্রাচীন ইতিহাস ও শক্তিশালী ঐতিহ্য আছে, তা সেই সিপাহির জন্য একটি গোত্রের মতো হয়ে যায়; ফলে সেই সিপাহি তার এই কবিলার জন্য জান দিতে প্রস্তুত থাকে। রেজিমেন্টের মর্যাদা দুটি বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। একটি হচ্ছে রেজিমেন্টের ইতিহাস ও তার ঐতিহ্য। আবার কখনো মানুষ তার পেশা ও দায়িত্বের জন্য জান দিয়ে দেয়। তাই প্রত্যেক সিপাহিকে পেশাদার যোদ্ধা হিসেবে জান দেওয়ার জন্য গড়ে তোলা হয়। এ ছাড়াও মানুষ তার নিজের বন্ধুর জান বাঁচানোর জন্য নিজ জান দিয়ে দিতে পারে।

এটাই ছিল সেই থিউরি, যার ভিত্তিতে জেনারেল কিচেনার রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে প্রশিক্ষিত করে তোলে। তখন হিন্দে মিলিটারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল অষ্টম শ্রেণি থেকেই বাচ্চাদেরকে দেশপ্রেম, রেজিমেন্ট ও বন্ধুদের মাঝে পেশাদার সিপাহির মতো গড়ে তোলা হবে। সেই পরিবেশে পড়াশুনাকারী ক্যাডেট যখন পশ্চিমা সমরনীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠে, তখন তাকে মিলিটারি একাডেমিতে অফিসার হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণে ভর্তি করা হয়। অফিসার হওয়ার পর তার একাডেমিক দক্ষতার ভিত্তিতে সেই রেজিমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অধিক মজবুত, অর্থাৎ যে ক্যাডেটের দক্ষতা যত বেশি, তাকে তত পুরাতন ইতিহাসসমৃদ্ধ রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কার্যক্রমের অধীনে ১৯০৭ সালে কোয়েটা শহরে অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য 'কমান্ড ও স্টাফ কলেজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবেই তখন সেই বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলার এমন সিস্টেম চালু হয়, যার ফলে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির মুসলিম সিপাহি এবং অফিসাররাও ভবিষ্যতে উসমানিদেরকে
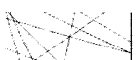
১ম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত করে উম্মাহকে টুকরা টুকরা করে বহু রাষ্ট্রে ভাগ করে ফেলতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

একদিকে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে নতুনভাবে গঠন করা হচ্ছিল। অন্যদিকে দিল্লি থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এক ছোট মাদরাসায় একজন মধ্যবয়সী ও দুর্বল শরীরবিশিষ্ট—কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিমে রব্বানি এই পরিস্থিতিকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে নিজেদের গাদ্দারির ফলে মুসলিমদের পতন তার চোখের সামনে ছিল। এই পতনের ফলে ইংরেজদের সেই শক্তি অর্জিত হয়, যার দ্বারা তারা খিলাফতকে ধ্বংসের পরিকল্পনা করছিল। ইউরোপ থেকে উসমানিদের ক্ষমতা বিলুপ্তির জন্য গ্রেট গেইমে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার গোপন চক্রান্তগুলোও তার সামনে স্পষ্ট ছিল। তার দূরদৃষ্টি এটাও দেখছিল যে, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এই তিন দুশমন মিলে মুসলিমদের কেন্দ্র খিলাফতকে ধ্বংস করে ফেলবে। তিনি জানতেন, ইতিহাসে পূর্বে যখনই মুসলিমদের ওপর এমন নাজুক পরিস্থিত এসেছিল, তখন সত্যপন্থী আলিমরা কোনোভাবেই বসে থাকেননি। তাই তিনিও কিছু করে যাওয়ার সংকল্প করেন।

তিনি জানতেন যে, ইংরেজদের মূল পুঁজি ছিল সেই সম্পদ, যা হিন্দুস্থান থেকে লুণ্ঠন করেছিল এবং মূল শক্তি ছিল সেই বাহিনী, যা হিন্দুস্থান থেকে সংগ্রহ করেছিল। হিন্দুস্থান ব্যতীত ইংরেজরা কিছুই করতে সক্ষম নয়। যদি হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের ক্ষমতা শেষ করে দেওয়া যায়, তাহলে তারা কোনোভাবেই উসমানিদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারবে না। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, মুসলিমদেরকে ব্রিটিশ বাহিনীতে ভর্তি হওয়া থেকে বাধা দিতে হবে। তাদেরকে এই কথা বোঝাতে হবে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে মিলে লড়াই করা সুস্পষ্ট কুফুরি, ইসলামে যার কোনো সুযোগ নেই। এই চিন্তাগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য তিনি জিহাদি বৃক্ষের সমস্ত শাখাকে একত্রিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন; যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জিহাদ শুরু হয়। সেই লক্ষ্যেই এই বুজুর্গ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দ মাদরাসায় নিজ হুজরা থেকে বের হয়ে পুরো হিন্দুস্থানে এক বিশাল আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

গ্রেট গেইম তখন তার সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৮৫৬ সালের প্যারিস কনফারেন্স থেকে ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া—এই তিন শক্তি মিলে এমন কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি, যার দ্বারা তারা ইউরোপে উসমানিদের শক্তিকে দুর্বল করতে পারবে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হোক বা বলকান রাষ্ট্র রক্ষা হোক; উদ্দেশ্য ছিল উসমানিদেরকে ইউরোপ থেকে উৎখাত করা বা দুর্বল করা। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফার্ডিনান্ড সার্বিয়া সফরে থাকাকালীন আততায়ির হাতে নিহত হয়। অস্ট্রিয়া তার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে হস্তান্তরের দাবি জানায়। অপরদিকে সার্বিয়া ব্রিটেনের সাহায্য আবেদন করে। কয়েক দিনের মধ্যেই ছোট এই বিষয় একটি বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়। ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স একজোট হয়ে যায়। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও উসমানিরা তাদের বিরোধী জোটে পরিণত হয়। জার্মানি বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে হামলা করে। তাদের বাধা দেওয়ার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স এক যৌথ বাহিনী তৈরি করে। জার্মানি ফ্রান্সে নিজের প্রতিরক্ষা-লাইনকে শক্ত করার জন্য মোর্চা দ্বারা এক প্রতিরোধ-লাইন তৈরি করে। এর বিপরীতে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও নিজ নিজ প্রতিরক্ষা-মোর্চা তৈরি করে ফেলে। তাই এই যুদ্ধকে মোর্চার যুদ্ধ বা ট্রাঞ্চ ওয়ারও বলা হয়।

অপরদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্য এটি ছিল এক সোনালি মুহূর্ত, যেখানে তারা উসমানিদের খতম করে উম্মতে মুসলিমার সমস্ত সম্পদ দখল করে নিতে পারবে। সেই সময় কিচেনার ছিল যুদ্ধমন্ত্রী এবং চার্চিল ছিল পরামর্শদাতা ও পরিকল্পনার দায়িত্বে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুর্কির ওপর সরাসরি হামলা করার ফয়সালা করে। কিন্তু মূল প্রশ্ন ছিল, ব্রিটেনের কাছে কি এত সামরিক শক্তি আছে, যার দ্বারা তারা যুদ্ধে লড়তে পারবে? জি, হ্যাঁ। ব্রিটেনের কাছে পনেরো লক্ষ হিন্দুস্থানি সেনা ছিল, যার অর্ধেকই ছিল মুসলিম। তারা হিন্দু ও শিখদের সাথে মিলে নিজেদের ভাই ও খিলাফতকে খতম করার জন্য ছিল পূর্ণ প্রস্তুত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিন্দুস্থান ও রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে এক্সপেডিশনারি ফোর্স বা দ্রুত আক্রমণকারী বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত করে :

- ব্রিটেনের প্রথম এক্সপেডিশনারি ফোর্স, যা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির লাহোর ও মিরাঠি বাহিনী থেকে গঠিত ছিল। তারা প্রথমে ফ্রান্স যায় এবং সেখানে অনেক ক্ষতির শিকার হওয়ার পর তাদেরকে চতুর্থ এক্সপেডিশনারি ফোর্সের সাথে মিশর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
- দ্বিতীয় এক্সপেডিশনারি ফোর্স, যা বেঙ্গালোর ব্রিগেড, সিকান্দারাবাদ ডিভিশন ও ইম্পেরিয়াল সোর্স ব্রিগেড থেকে গঠিত হয়েছিল। তাদেরকে পূর্ব আফ্রিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়; যাতে সেখানের জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

- তৃতীয় এক্সপেডিশনারি ফোর্স, যা ইম্পেরিয়াল সোর্স ও পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন থেকে গঠিত ছিল। তাদেরকে উগান্ডা থেকে মোম্বাসা রেললাইন রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

- চতুর্থ এক্সপেডিশনারি ফোর্স, যা গ্রিস ডিভিশন থেকে গঠিত ছিল। জেনারেল টাউনশেডের নেতৃত্বে তুর্কিদের হাতে পরাজিত হয়। এরপর ছয় ডিভিশন সেনা জেনারেল মোডির নেতৃত্বে সাজানো হয়। যা মিরাঠ ও ইন্ডিয়ান ডিভিশন থেকে গঠিত ছিল। তাদের কাজ ছিল বাগদাদ বিজয় করা।

- পঞ্চম এক্সপেডিশনারি ফোর্স ঘোড়-সওয়ার ডিভিশন, মিরাঠ ও লাহোরের পদাতিক ডিভিশন থেকে গঠিত হয়েছিল, যাদের নেতৃত্ব ছিল জেনারেল এলেনবির হাতে। তাদের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিন ও শাম বিজয় করা।

- ষষ্ঠ এক্সপেডিশনারি ফোর্স ইন্ডিয়ান ডিভিশন থেকে গঠিত হয়েছিল, তাদের লক্ষ্য ছিল সুয়েজ খালকে রক্ষা করা।

- সপ্তম এক্সপেডিশনারি ফোর্স, যা ২৯তম ইন্ডিয়ান ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা গ্যালিপলি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মিশর ফিরে আসে।

তুর্কি দখলে ব্রিটেনের পরিকল্পনা

১৯১৫ সালে চার্চিল ব্রিটেনের প্রশাসনকে একটি পরিকল্পনাপত্র পাঠায়। যেখানে ব্রিটেনের সামুদ্রিক ও স্থল বাহিনীকে মর্মর সাগরে যৌথ হামলা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথমে ব্রিটেনের সামুদ্রিক বহর মর্মর সাগরে হামলা করে ব্রিটিশ সেনাদের সেখানে নামিয়ে দেবে। তারপর মর্মর সাগরে প্রবেশ করে সাগরের অপর প্রান্ত দখল করবে এবং ইস্তাম্বুলকে ব্রিটেনের গোলার অধীনে নিয়ে আসবে। চার্চিলের ধারণা ছিল এর ফলে উসমানি হুকুমত যেকোনো মূল্যে সন্ধি করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যুদ্ধমন্ত্রী কিচেনার এই প্ল্যানকে এই বলে বাতিল করে যে, এখন ইউরোপের যেকোনো অঞ্চল থেকে সেনা সরানো অনেক ক্ষতিকর হবে। কিচেনার ও এডমিরাল জন ফিশারের অসম্মতির জবাবে চার্চিল পরামর্শ দেয় যে, যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে স্থলপথে হামলার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত বাহিনী দিয়ে শুধু সমুদ্রপথে হামলা করা হবে; তবুও এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। কিন্তু জন ফিশার এই প্ল্যানের ব্যাপারেও অসম্মতি জানায়। সেই সময় হঠাৎ উসমানি সামুদ্রিক বাহিনীর একটি তারবার্তা তাদের হাতে পৌঁছায়, যেখানে গোলা-বারুদের কমতির অভিযোগ করে কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। এই তারবার্তা পাওয়ার পর জন ফিশারের কাছে এই প্ল্যানের সফলতার ব্যাপারে বিশ্বাস জন্ম নেয় এবং সে এই প্ল্যান বাস্তবায়নে প্রস্তুত হয়ে যায়।

১৯১৫ সালের ১৫ মার্চ ১৬টি জাহাজের এক বহর এডমিরাল কার্ডনের নেতৃত্ব ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমুদ্রসীমা ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে তুর্কির দিকে রওয়ানা হয়। হামলার একদিন পূর্বে কার্ডনের মস্তিষ্কে রোগ দেখা দেয়। তাই সে এই হামলার নেতৃত্ব তার সহকারী রোবেকের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। ১৮ মার্চ এই বহর তুর্কির উপকূলীয় চৌকিগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, যেখানে প্রতিরক্ষার জন্য তুর্কি বাহিনী পানিতে মাইন বিছিয়ে রেখেছিল। রোবেক ভালোভাবেই জানত যে, এই মাইনগুলো বিছানো থাকবে। তাই সে সুড়ঙ্গ পরিষ্কারের আদেশ দেয়। সুড়ঙ্গ পরিষ্কারের কাজ শুরুর সাথে সাথে ইতালির একটি জাহাজ মাইনের সাথে টক্কর খেয়ে দুই মিনিটের মাঝে ডুবে যায়। জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজেকে কামরায় আবদ্ধ করে ফেলেছিল; যার ফলে সমস্ত প্ল্যান এই জাহাজের সাথেই ডুবে যায়। এ ছাড়া দুটি ব্রিটেনি জাহাজ মাইনের আঘাত লেগে ডুবে যায়। আরও তিনটি জাহাজ—যেখানে ব্রিটেনের একটি ও ফ্রান্সের দুটি ছিল—মাইনের সাথে টক্কর খেয়ে অকেজো হয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিত্র বাহিনীর ছয়টি জাহাজ ধ্বংসের ফলে রোবেকের তখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয় যে, সে এই হামলা জারি রাখবে নাকি ফিরে যাবে? সে কমান্ডারের সাথে পরামর্শ করে। সে পরামর্শ দেয় যে, পেছনে ফিরে আসার পূর্বে কিছু সেনা শুকনো ভূমিতে নামিয়ে একদিকের এলাকা দখল করে নেওয়া উচিত। এই প্ল্যানকে তারবার্তার মাধ্যমে লন্ডন পাঠানো হয়। ফলে তাদের এমনটা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

চার্চিল পেছনে ফিরে আসার কঠিন বিরোধিতা করে, কেননা ইস্তাম্বুল তখন শুধু কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত ছিল। সে দ্বিতীয়বার হামলার পরামর্শ দেয়; কিন্তু জন ফিশার আবারও হামলা করতে অস্বীকার করে। যার ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়।

তুর্কি বাহিনীর সুয়েজ খাল হামলা

১৯১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি উসমানিরা সিনাই মরুর দিক থেকে ব্রিটেনের দখলকৃত সুয়েজ খালে হামলার জন্য জামাল পাশার নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠায়। এই খাল ব্রিটেনের জন্য শাহরগের মতো ছিল। এই খালকে ব্রিটেন হিন্দুস্থান থেকে সম্পদ ও সামরিক সাহায্যের চলাচলের জন্য ব্যবহার করত। যদি এই রাস্তাকে দখল করা যেত, তাহলে ব্রিটেন কঠিন আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। জামাল পাশার নেতৃত্বে ১৫ হাজার সেনা সিনাই মরুতে শত মাইল সফর করে সুয়েজ খালের ওপর হামলার জন্য পৌঁছে। ২২ ফেব্রুয়ারি এই বাহিনী হামলা করে। জামাল পাশার মোকাবিলায় সুয়েজ খালের হিফাজতে থাকা বেলুচ রেজিমেন্ট এগিয়ে আসে, যা হিন্দুস্থানের ষষ্ঠ এক্সপেডিশনারি ফোর্স ও ইন্ডিয়ান বাহিনীর অংশ ছিল। ধারাবাহিক হামলা সত্ত্বেও জামাল পাশা সুয়েজ খাল দখল করতে পারেনি। ফলে তাকে পুনরায় মরুর দিকে ফিরে আসতে হয়।

গ্যালিপলির যুদ্ধ

জেনারেল কিচেনার প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্যে বাহিনী প্রেরণের কঠিন বিরোধী ছিল; কিন্তু এখন সে চার্চিলের প্ল্যান অনুযায়ী তুর্কির ওপর সামরিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্ল্যান সমর্থন করে নেয় এবং সেখানে স্থলবাহিনী প্রেরণে প্রস্তুত হয়ে যায়। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ বাহিনী যা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাহিনী থেকে গঠিত ছিল, মর্মর সাগরের পশ্চিম কিনারে গ্যালিপলির ওপর হামলার জন্য জাহাজে সওয়ার হয়। এই বাহিনীর কমান্ডার ছিল জেনারেল হ্যামিলটন। তার কাছে এই আদেশ আসে যে, গ্যালিপলি দখলের পর সে ইস্তাম্বুল দখল করে নেবে। লন্ডনে বসে ব্রিটিশ কমান্ডাররা কয়েক দিনের মধ্যে বড় এক বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। ১৯১৫ সালের ২৫ এপ্রিল ৮০ হাজারের ব্রিটিশ বাহিনী এনজ্যাক কোভ (Anzac Cove) ও ক্যাপ হেলেস (Cape Helles)-এ অবতরণ করে। অন্যদিকে ফ্রান্সের বাহিনী (Kum Kale) কোমকেলিতে অবতরণ করে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বাহিনী—যাদেরকে এনজ্যাক বলা হয়, তারা কাঙ্ক্ষিত স্থান থেকে এক মাইল দূরে অবতরণ করে। যার ফলে তারা সেখানে ধারণার বিপরীত সমতল ভূমির পরিবর্তে পাহাড়ি ভূমির মুখোমুখি হয়। উঁচু ভূমির অবস্থা এমন ছিল, যা তাদের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে রেখেছিল।

এনজ্যাক বাহিনী হামলা করে বসে। সেখানের কমান্ডার ছিল কর্নেল মুস্তফা কামাল[৪৮] ও তার সাথে ছিল তুর্কি এক ডিভিশন সেনা। হামলা এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, কামাল তার ঊর্ধ্বতন কমান্ডার থেকে কোনো আদেশ আনার সময় পায়নি। কিন্তু তাকে তো কিছু করতে হবে! তুর্কি বাহিনী আপন জায়গা ছেড়ে পিছপা হওয়া শুরু করে; কিন্তু সে তাদের স্থির থাকার আদেশ দেয় এবং নিজেই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ফয়সালা করে। সেই সময় হঠাৎ কামাল শক্তিশালী বাহিনীর সাহায্য পেয়ে যায় এবং ফলে সে এনজ্যাকদের হামলা প্রতিহত করে দেয়।

অপরদিকে হেলেস উপকূলে ব্রিটেনের বাহিনী দিনের আলোতে হামলা করে। তাদের দুই ব্যাটালিয়ন সেনা জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিল, তাদের অধিকাংশই উপকূলে পৌঁছার পূর্বেই তুর্কিদের গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটেনের এক বৈমানিক, যে সেই এলাকা দিয়ে বিমান উড়াচ্ছিল, সে রিপোর্ট পাঠায় যে, উপকূল থেকে ৫০ গজ পর্যন্ত সমুদ্রের পানি রক্তে লাল হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে তাদের আক্রমণের সুযোগ ছিল; কিন্তু জোট বাহিনী কোনো লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থান তুর্কিদের হাতে ছিল। এই অবস্থায় তিন সপ্তাহ পার হয়ে যায়। তুর্কিরা এনজ্যাক বাহিনীকে উপকূলের দিকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য হামলা করে। কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হয়। তখন এই

---

৪৮. সে-ই ছিল অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্ক, যে খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়েছিল এবং তুর্কি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রেখেছিল। সে-ই তুর্কিতে ইসলামের পরিবর্তে জোরপূর্বক সেক্যুলারিজম চালু করেছিল।

যুদ্ধের সাধারণ বিষয় হয়ে গিয়েছিল যে, ব্রিটেন অনেক কষ্টে সামরিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখলের কিছু দিন পরেই তুর্কি হামলা করে তা ফিরিয়ে নিত। এভাবেই লড়াই চলতে থাকে।

১৯১৫ সালের ৬ আগস্ট ব্রিটেনের বাহিনী এনজ্যাক কোভের উত্তরে অবস্থিত সুভেলা বের ওপর শক্তিশালী বাহিনী দ্বারা হামলা করে। যদিও এই হামলা অনেক দ্রুত করা হয়েছিল; কিন্তু তারপরেও এই হামলা ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পর মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুর্কিরা সুভেলা বের ওপর হামলা করে ব্রিটিশ বাহিনীকে আধা মাইল সমুদ্রের ভেতর ঠেলে দেয়। তুর্কিরা আরও একবার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। ব্রিটিশ বাহিনী সংখ্যায় তাদের থেকে কয়েক গুণ কম সেনাবাহিনীর হাতে বারবার পরাজিত হচ্ছিল। গরমের মৌসুম পার হয়ে গিয়েছিল এবং শীতের মৌসুম চলে আসছিল। কিন্তু গ্যালিপলির ময়দান তখনও গরম ছিল। তুর্কিরা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সকল স্থান এমনভাবে দখল করে রেখেছিল, যেমনভাবে শুরু থেকেই ছিল। ব্রিটিশ বাহিনীতে অসুস্থতা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেনাদের মধ্যে আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগ অনেক বেড়ে যায়। হিন্দুস্থান থেকে আসা ৭ম এক্সপেডিশনারি ফোর্সকে গ্যালিপলিতে পাঠানো হয়েছিল; যাতে তারা সেখানে ফেঁসে যাওয়া বাহিনীর সাহায্য করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই বাহিনীকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পর মিশর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯১৫ সালের পহেলা অক্টোবর লন্ডনে যুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে হ্যামিলটনের কাছে পেছনে ফিরে আসার ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া হয়। তখন সে জবাব দেয়, পেছনে ফিরে আসা এতটাই ভয়ানক হবে যে, এর ফলে অর্ধেক বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। কয়েক দিন পর হ্যামিলটনের জায়গায় চার্লসকে নতুন কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়। সে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পাঠায়, এই বাহিনী লড়াইয়ের উপযুক্ত নেই এবং তাদেরকে এখনই যুদ্ধ থেকে বের করে আনতে হবে। নভেম্বরে যুদ্ধমন্ত্রী স্বয়ং ময়দান পরিদর্শন করে পিছপা হওয়ার আদেশ জারি করে। ডিসেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে পেছনে ফিরে আসার জন্য সওয়ার হওয়া শুরু হয়। এই পরাজয়ের পর চার্চিলকে সাজা হিসেবে সাধারণ সেনা বানিয়ে দেওয়া হয়।

ইরাকে ব্রিটেনের প্রথম হামলা

অপরদিকে ব্রিটিশ বাহিনী ১৯১৫ সালের এপ্রিলে জেনারেল টাউন শেডের নেতৃত্বে দজলার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল ইরাকের তেলক্ষেত্র দখল করা। মে মাস পর্যন্ত তারা তুর্কিদেরকে নদীর অপর পাশে আটকিয়ে রাখে। জেনারেল জন নিক্সন, যে জেনারেল টাউন শেডের কমান্ডার ছিল, সে সেনা কম হওয়া সত্ত্বেও টাউন শেডের কাছ থেকে অধিক বিজয়ের আশায় চাপ দিতে থাকে। তার দাবি ছিল, বছরের শেষ পর্যন্ত বাগদাদ বিজয় করে নেওয়া যাবে। সেপ্টেম্বরে টাউন শেডের বাহিনী 'কুতুল ইমারা'র ওপর

হামলা করে এবং সন্ধ্যার পূর্বেই শহর বিজয় করে নেয়। টাউন শেডের সাথে হিন্দুস্থান থেকে আসা ৪র্থ এক্সপেডিশনারি বাহিনীও ছিল। জেনারেল নিক্সন শুধু এতটুকু বিজয়ে আশ্বস্ত হয়নি, সে আরও অধিক সামনে আগানোর জন্য চাপ দেয়। ফলে টাউন শেড ১১ হাজার সেনা নিয়ে টিজেফন আর্চের দিকে এগিয়ে যায়।

টিজেফন শহরে নুরুদ্দিন পাশার নেতৃত্বে ২০ হাজার তুর্কি সেনা তার মোকাবিলা করে। টিজেফনের লড়াই চার দিন ও চার রাত চলমান থাকে; কিন্তু জেনারেল টাউন শেড তুর্কিদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে কুতুল ইমারাতে ফিরে আসে। তুর্কি বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে চার দিন পর কুতুল ইমারা অবরোধ করে নেয়। টাউন শেডের কাছে অস্ত্র ও রসদের ভান্ডার ছিল; তাই সে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ফয়সালা করে। ইরাকের কুতুল ইমারা অঞ্চলে টাউন শেডের তেরো হাজার সেনা তুর্কিদের ঘেরাওয়ে ছিল। তুর্কিরা এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী কুতুল ইমারার জন্য একত্রিত করেছিল। সেই সময় ইস্তাম্বুল থেকে জার্মানির ফিল্ড মার্শাল ভন ডার গোল্টস গল (Colmar von der Goltz) ইরাকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বের জন্য পৌঁছায়। তার কর্মপদ্ধতি ছিল, শত্রুকে অবরোধ করে তাদেরকে হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য করা। তাই তারা ব্রিটেনের বাহিনীর ওপর অবরোধ কঠিন করতে থাকে।

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এফ.জে.এলমারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী বাইর থেকে তুর্কিদের অবরোধকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কঠিন আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সময় টাউন শেডের অবরুদ্ধ বাহিনীর কাছে রসদ ও অস্ত্রের ভান্ডার খতম হওয়া শুরু করে। জেনারেল এলমার[৪৯] দজলার নদীপথে নৌকার মাধ্যমে রসদ পৌঁছানোর চেষ্টা করে। চাঁদনি রাতে একটি নৌকা দজলাতে রওয়ানা হয়; কিন্তু এটি খুব দ্রুতই নদীতে থাকা তুর্কিদের হাতে আটক হয়ে যায়। স্পষ্ট পরাজয়ের প্রভাব দেখে ১৯১৫ সালের ২৭ এপ্রিলে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের তোপগুলো ধ্বংস করা শুরু করে; যাতে তা তুর্কিদের হস্তগত না হয়।

২৯ এপ্রিল তেরো হাজার ব্রিটিশ ও হিন্দুস্থানি বাহিনী তাদের কমান্ডারসহ তুর্কিদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দেয়। এই যুদ্ধে ব্রিটেনের ক্ষতি অনুমানের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, টাউন শেডের তেরো হাজার বাহিনীকে বন্দী করা ছাড়াও অবরোধকে ভাঙার চেষ্টায় এলমারের ২৩ হাজার সেনা নিহত হয়। এই যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনে মাতম শুরু হয়ে যায়। অপরদিকে তুর্কিরা দজলার কিনারে নিজেদের পজিশন দৃঢ় করতে থাকে। কেননা, তারা জানত অবশ্যই ব্রিটিশ বাহিনী বাগদাদ বিজয়ের জন্য আবারও চেষ্টা করবে।

৪৯. পরিচয়ে অস্পষ্টতা আছে।

ইরাকে ব্রিটেনের দ্বিতীয় হামলা

গ্যালিপলি ও কুতুল ইমারার পরাজয় ব্রিটেনের জনগণকে প্রধানমন্ত্রী হার্বার্ডের বিরোধী বানিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনে জনগণ ডেভিড জর্জকে প্রধানমন্ত্রী বানায়। জর্জ ছিল মুসলিমদের কঠিন শত্রু। সে উসমানিদের ধ্বংস করাকে নিজের মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। ইরাকের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রিটেনের যুদ্ধ-মন্ত্রণালয় ব্রিটেনের বাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করে এবং জেনারেল 'পার্সিলেক'কে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডার নির্ধারণ করে। পার্সিলেকের এক লক্ষের বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল হিন্দুস্থানি সেনা। সে জেনারেল স্টেনলে মোডিকে বাগদাদ বিজয়ের আদেশ দেয়। মোডির সাথে হিন্দুস্থানে ৪র্থ এক্সপেডিশনারি ফোর্স ছিল। এই বাহিনী ষষ্ঠ ইন্ডিয়ান ডিভিশন থেকে গঠিত ছিল। ১৯১৭ সালের জানুয়ারিতে তারা কুতুল ইমারা হামলা করে অবরোধ করে নেয়। তুর্কিরা বাগদাদের দিকে পিছপা হয়ে যায়। যার ফলে ব্রিটেনের বাহিনী দ্বিতীয়বার কুতুল ইমারা দখল করে নেয়। মোডি তুর্কিদের পিছু ধাওয়া করে এবং তাদেরকে বাগদাদের উত্তর দিকে নিয়ে যায়। যার ফলে বাগদাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে যায়। ১১ মার্চ মোডি কোনো ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই বাগদাদ দখল করে নেয়।

উসমানিদের রাশিয়ান যুদ্ধক্ষেত্র

১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে উসমানি বাহিনী ককেশাসের দিকে আগানো শুরু করে, যা আগ থেকেই রাশিয়া দখল করে রেখেছিল। তুর্কিরা চাচ্ছিল রাশিয়াকে সেখান থেকে হটিয়ে দেবে। কিন্তু বরফাবৃত অঞ্চলে তুর্কিদের অবস্থা অনেক নাজুক হয়ে যায়। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে তুর্কিরা অগণিত লাশ পেছনে ফেলে পিছু হটে আসে। ফলে ককেশাস অঞ্চল রাশিয়ানদের জন্য নিরাপদ ও উসমানিদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে যায়। ১৯১৫ সালের মে মাসে রাশিয়া এরজুরাম শহরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সেখানে জেনারেল নিকোলাই এর আশি হাজারের সেনাবাহিনী ভান শহর বিজয়ের পর মাশ শহরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় ৮৫ হাজার তুর্কি সেনা প্রতিরোধ করে। কিন্তু তাদের কাছে অস্ত্র ও রসদের ভান্ডার অনেক কম ছিল। এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত-মুহূর্তে অস্ত্র ও রসদ পৌঁছানো অনেক কঠিন ছিল। কেননা সড়ক ও রেললাইনগুলো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। ইরাক থেকে গ্যালিপলি পর্যন্ত বাহিনী যাওয়া তো সহজ ছিল; কিন্তু গ্যালিপলি থেকে পূর্ব যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছার জন্য ৬-৮ সপ্তাহ লাগত। এত বিপদ সত্ত্বেও তুর্কিরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণ চালায় এবং তাদের বিজিত এলাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

এই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই জান ও সম্পদের অনেক বেশি ক্ষতি হয়। এই অবস্থা দেখে রাশিয়ার জার ১৯১৫ সালে ককেশাস যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ চাচা গ্রান্ড ডিউক নিকোলাসকে পাঠায়। যুদ্ধের অবস্থা দেখে সে এক বছর পর্যন্ত যুদ্ধ না করার আদেশ দেয়। এই সময় সে পরবর্তী যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। ১৯১৬ সালে সে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু করে এবং তুর্কিদের আস্তে আস্তে পরাজিত করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। তুর্কিরা পিছু হটে এরজুরাম কেল্লাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এরজুরাম কেল্লাও তুর্কিদের হাত থেকে ছুটে যায়। এরজুরাম কেল্লার পতন ছিল তুর্কিদের জন্য অনেক বড় ধাক্কা। এই খবর কয়েক মাস পর্যন্ত সুলতানকেও জানানো হয়নি। আগস্ট পর্যন্ত এই বাহিনী উসমানিদের অনেক এলাকা দখলে নিয়ে নেয়। এই যুদ্ধে তুর্কির দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাহিনী রাশিয়ার হাতে অনেক আর্থিক ও দৈহিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তাহরিকে শাইখুল হিন্দ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেন মিলে উসমানিদের পতনের চক্রান্ত করছিল। তখন অপরদিকে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ﷺ হিন্দুস্থানে ইংরেজ বাহিনীর ওপর কঠিন হামলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি জানতেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের শক্তির উৎস হিন্দুস্থান। তাই তার পরিকল্পনা ছিল আফগান শাসক ও কাবায়েলি জনগণকে সাথে নিয়ে জিহাদ করে হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের হুকুমত খতম করে দেবেন। যদি হিন্দুস্থানে ব্রিটেন পরাজিত হয়, তাহলে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। এই পরিকল্পনা সফলতা লাভের জন্য আবশ্যক ছিল—প্রথমত, উসমানিদের কাছ থেকে ফতোয়া বা অনুমতিনামা এনে আফগান আমির হাবিবুল্লাহকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা। দ্বিতীয়ত, কাবায়েলি উলামা ও মুজাহিদদের জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা। তৃতীয়ত, হিন্দুস্থানের বাহিনীতে থাকা মুসলিম সেনাদেরকে এই কথা জানানো যে, ইংরেজদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফুরি। এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি সরাসরি কাফির ও জাহান্নামি।

মুজাহিদ ও কাবায়েলিদের মাঝে যেই সম্পর্ক ছিল, তার ফলে তারা সবাই প্রস্তুত ছিল। এভাবে শাইখুল হিন্দের আন্দোলনের মধ্যে জিহাদি বৃক্ষের সমস্ত শাখা একত্রিত হয়ে যায়। উত্তর কাবায়েল, বাজুর, মেহমান্দ ও আফ্রিদি এলাকা হাজি সাহেব তারাংজায়ির নেতৃত্বে এবং দক্ষিণ কাবায়েল ওয়াজিরিস্তানের শাহজাদা ফজলুদ্দিনের নেতৃত্বে একত্রিত ছিল। ১৯১৫ সালে শাইখুল হিন্দ মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে আমির হাবিবুল্লাহর কাছে পাঠান এবং নিজে হিজাজের গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কার দিকে রওয়ানা হন। যাতে উসমানিদের পক্ষ থেকে জিহাদ শুরু করার অনুমতি অর্জন করা যায়।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি ১৯১৫ সালের অক্টোবরে কাবুল পৌঁছান এবং আফগান আমির হাবিবুল্লাহকে হিন্দুস্থানে জিহাদের আহ্বান জানান। আমির হাবিবুল্লাহ ছিল ইংরেজদের রক্ষাকারী। কিন্তু সে তা প্রকাশ করতে পারত না। কেননা তার ভাই ও নায়িবে আমির নাসরুল্লাহ ইংরেজ-বিরোধী ছিল এবং আফগানের পুরো জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। আমির হাবিবুল্লাহ যখন এই কাজের জন্য আহলে শুরার পরামর্শ

চায়, তখন সমস্ত সদস্য জিহাদের পক্ষে রায় দেয়; ফলে হাবিবুল্লাহর সামনে সমর্থন করা ছাড়া কোনো পথ অবশিষ্ট থাকেনি।

হাবিবুল্লাহ তার দুটি চেহারা বানিয়ে নিয়েছিল। একটি ইংরেজদের দেখানোর জন্য, যা ছিল তার আসল চেহারা; দ্বিতীয়টি জিহাদি চেহারা, যা জনগণ ও মুজাহিদদের দেখানোর জন্য। সে ইংরেজদের কাছে এই কথা স্পষ্ট করেছিল যে, সে জনগণ ও মুজাহিদদেরকে বাধা দিতে পারবে না। কেননা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু সে ইংরেজদের এতটুকু গোলামি করতে সক্ষম ছিল যে, জনগণ ও মুজাহিদদের এই কার্যক্রমকে ধীর করে দেবে বা তাদের পথে বাধা তৈরি করবে যাতে ইংরেজদের উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো সমস্যা না হয়। ইংরেজরা তার এই চক্রান্তের সাথে সহমত পোষণ করে। হাবিবুল্লাহ সরাসরি জিহাদের বিরোধিতা না করে বলে, 'জিহাদের জন্য আমির ও বাইআতের প্রয়োজন। তাই যারাই জিহাদ করতে চায়, তারা যেন আমির নাসরুল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে।' অপরদিকে সে বাহানা বানায় যে, রাশিয়ার পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় রয়েছে, যা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া ব্যতীত ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্ভব নয়। হাবিবুল্লাহর এই বাহানায় আফগান জনগণ প্রভাবিত হয়ে যায়। কিন্তু কাবায়েলি এলাকাতে জিহাদের আগুন প্রজ্বলিত হতে থাকে। শাহজাদা ফজলুদ্দিন ও হাজি সাহেব তারাংজায়ি ময়দানে নেমে আসার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন।

যখন শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান ﷺ গালিব পাশা থেকে আফগান, কাবায়েলি ও হিন্দুস্থানের মুসলিমদের নামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি এবং ফতোয়া নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওয়ানা হন, তখন হিজাজে শরিফ হুসাইনের বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শরিফ হুসাইন শাইখুল হিন্দ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি ﷺ ও তাদের সাথিদের গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। ইংরেজরা তাদেরকে মাল্টার দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে তারা ১৯২০ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুক্তি পান। মুক্তির কয়েক মাস পরেই শাইখুল হিন্দ ইনতিকাল করেন। শাইখুল হিন্দের গ্রেফতারির ফলে জিহাদি আন্দোলনের বিশাল ক্ষতি হয়েছিল এবং এই কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কার্যক্রম হিন্দুস্থান ও আফগানে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। যার আলোচনা আমরা উপযুক্ত স্থানে করব।

ফিলিস্তিনে ব্রিটেনের হামলা

গ্যালিপলি ও কুতুল ইমারাতে (উসমানিদের) কঠিন পরাজয়ের পর ব্রিটিশ বাহিনী পরিকল্পনা করে যে, তারা এখন মিশর থেকে গিয়ে ফিলিস্তিনে হামলা করবে। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল জেনারেল আর্চিবাল্ড মোডির হাতে। এই হামলার পূর্বে জেনারেল মোডি হাজারো সেনা ও মিশরি শ্রমিকের সাহায্যে এক ফুট প্রস্থ পানির পাইপলাইন বিছায় এবং তার সাথে সাথে রেললাইন বিছানোর কাজ শুরু করে। এই সব কাজ জেনারেল মোডি ছয় মাসে শেষ করে।

যার ফলে ব্রিটিশ বাহিনী যুদ্ধের জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। উসমানিদের চতুর্থ বাহিনী ব্রিটেনের এই হামলাকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। জেনারেল মোডির সাথে হিন্দুস্থানি পঞ্চম এক্সপেডিশনারি ফোর্সও ছিল। এই বাহিনী আজকের পাকিস্তানের ঘোড়-সওয়ার রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

গাজার প্রথম লড়াই

জেনারেল মোডি গাজা দখলের সিদ্ধান্ত নেয়। সে জেনারেল চার্লস ডোবেলকে আদেশ দেয়, যাতে গাজার ওপর হামলা করে। ডোবেলের কাছে উপযুক্ত সামরিক শক্তি ছিল। বিশেষ করে তার সাথে মরুতে যুদ্ধের সক্ষমতা রাখে এমন ঘোড়-সওয়ার বাহিনী ছিল। কিন্তু এই ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর সাথে দশ হাজার ঘোড়াও ছিল, যেগুলোর পান করার জন্য পানির দরকার ছিল। আর পানির ভান্ডার ছিল গাজায়। তাই তার পরিকল্পনার সফলতা গাজার পানির উৎসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯১৭ সালে বসন্তের মৌসুমের শুরুতে জেনারেল মোডি নিজ বাহিনীর বড় অংশ গাজা বিজয়ের জন্য পাঠায়। উসমানিরাও শিবা লেক থেকে গাজা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা-মোর্চা তৈরি করে। ব্রিটিশ বাহিনী এই প্রতিরক্ষা-লাইনকে ভাঙার চেষ্টায় যুদ্ধের একসময় গাজাকে পূর্ণভাবে অবরোধ করে নেয়। তখন উসমানি বাহিনী গাজা থেকে বের হয়ে ব্রিটেনের ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর ওপর আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে; কিন্তু জেনারেল মোডি তাদের নিয়ে পেছনে ফিরে আসে। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনী তুর্কি বাহিনীর হামলায় পিছপা হতে বাধ্য হয়।

গাজার দ্বিতীয় লড়াই

১৯১৮ সালের ১৭ এপ্রিল জেনারেল মোডি গাজার ওপর দ্বিতীয় হামলা করে, যার জবাবে তুর্কি বাহিনী কঠিনভাবে লড়াই করে। তাদের বাহিনী এক মোর্চা থেকে অপর মোর্চাতে ছোটাছুটি করে যুদ্ধ করে এবং ইংরেজদের হামলাকে ব্যর্থ করে দেয়। তুর্কিদের এই জবাবি হামলার ফলে ব্রিটেনের বাহিনী পিছপা হতে বাধ্য হয়। এই ব্যর্থতার ফলে জেনারেল মোডিকে পরিবর্তন করে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জেনারেল এলেনবিকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। এলেনবি পুরো গরমকাল যুদ্ধপ্রস্তুতির মধ্যে ব্যস্ত থাকে।

গাজার তৃতীয় লড়াই

১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে এলেনবি গাজার ওপর তৃতীয় হামলা করে। ১৯১৭ সালের ৩১ অক্টোবর ব্রিটিশ বাহিনী গাজায় পৌঁছে যায়। এই বাহিনী একই সাথে গাজা ও শিবাহ লেকের ওপর হামলা করে। এলেনবির পরিকল্পনা ছিল দুই দিকে তুর্কিদের ব্যস্ত রেখে প্রথমে শিবাহ লেক দখল করে নেবে। অতঃপর দুই শক্তি একত্রিত করে গাজা দখল করে নেবে। তার এই প্ল্যান সফল হয়েছিল এবং শিবাহ লেক বিজয় হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন গাজার ওপর হামলা করে, তখন তুর্কি বাহিনী চরম সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পেশ করে। গাজার মুজাহিদরা নয় মাস সর্বোচ্চ বাহাদুরির সাথে তাদের থেকে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী

বাহিনীর মোকাবিলা করে। সর্বশেষে রসদ ও অস্ত্রের কমতির ফলে তারা পিছপা হতে বাধ্য হয়। যার ফলে গাজা ব্রিটেনের দখলে চলে যায়।

এলেনবির মূল লক্ষ্য ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস, যা মুসলিমদের প্রথম কিবলা ও সুলতান সালাহুদ্দিনের সময় থেকে তখন পর্যন্ত ৭৪০ বছর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ব্রিটেনের কট্টর প্রধানমন্ত্রী লর্ড জর্জ এলেনবিকে আদেশ দেয়, যেন জেরুজালেমকে যেকোনো মূল্যে খ্রিষ্টানদের 'বড় দিন' আসার পূর্বেই বিজয় করে নেয়—যাতে জাতিকে ইদে এই সুসংবাদ দিতে পারে। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা লিখে, এই যুদ্ধ মূলত ক্রুসেড যুদ্ধ ছিল। কিন্তু যেহেতু এলেনবির সাথে হিন্দুস্থান থেকে আসা মুসলিম সেনারাও ছিল, তাই সে এই যুদ্ধকে ক্রুসেড যুদ্ধ বলা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু খ্রিষ্টান সেনারা এটাকে ক্রুসেড যুদ্ধই মনে করত। ১৯১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর এলেনবি বাইতুল মুকাদ্দাসে হামলা করে, যেখানে মাত্র ১৫ হাজার তুর্কি সেনা তাদের থেকে কয়েক গুণ বড় বাহিনীর মোকাবিলা করে। কিন্তু তারা দ্রুতই পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। যার ফলে উসমানিদের চারশ বছরের ক্ষমতা শেষ হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যায়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

মুসলিম উম্মাহর গাদ্দার

এই পরাজয়ের পরেও ব্রিটেন এবং তার মিত্ররা জানত যে, মুসলিমদের মধ্যে তখনও এতটুকু শক্তি ছিল যে, তারা যেকোনো মুহূর্তে আবার উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের দখলকৃত জায়গাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা রাখে। ঠিক সেই সময় ব্রিটেন ও তাদের মিত্র-শক্তিরা তিনটি বড় ধাক্কা খায়।

প্রথমটি ছিল রাশিয়া, যেখানে জারদের হুকুমত ছিল এবং যে ব্রিটেনের মিত্রও ছিল। সেখানে হঠাৎ সমাজতন্ত্রের বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল ভ্লাদিমির লেলিনের হাতে। সে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জার্মানি ও উসমানিদের সাথে নিরাপত্তা-চুক্তি করে নেয়। যার ফলে এই দুই রাষ্ট্র বড় এক শত্রুর হাত থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে তাদের সমস্ত শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিকে নিবদ্ধ করে।

দ্বিতীয়টি ছিল আমেরিকা, যারা যুদ্ধে ব্রিটেনের সাথে মিলিত হওয়ার ওয়াদা করেছিল; কিন্তু তারা তখনও পর্যন্ত যুদ্ধে অবতরণ করেনি।

তৃতীয়টি ছিল, তারা জানতে পারে যে, জার্মানি ১৯১৮ সালে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে বড় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই তিনটি ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এলেনবিকে আদেশ দেয়; যাতে সে তার সব অতিরিক্ত অস্ত্র ও সেনা এই মুহূর্তে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। যার ফলে এলেনবি এশিয়াতে তার বিজয়ের ধারা জারি রাখার সক্ষমতা হারিয়ে

ফেলে। কারণ ধারাবাহিকতা জারি রাখার জন্য তার সেনা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের অধিকাংশ সেনা তখন ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিল। এলেনবি বিজয়কে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করে এবং মুসলিমদের মধ্য থেকেই গাদ্দার তৈরি করার চেষ্টা করে।

'শরিফ হুসাইন' ছিল হিজাজের কাবায়েলি সর্দার ও আরব জাতীয়তাবাদের আহ্বায়ক। ব্রিটেনের গোপন এজেন্সি তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং সে এই শর্তে ব্রিটেনের সাথে অংশ নিতে প্রস্তুত হয় যে, যুদ্ধের পর ব্রিটেন আরবদের জন্য আলাদা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। ব্রিটেন সমর্থন প্রকাশ করে; যদিও এই সবই ছিল মিথ্যা। ব্রিটেন শুধুই উসমানিদেরকে পতনের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল এবং মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিল। সেনা-ঘাটতির ফলে তখন কিছু সময়ের জন্য আরব কাবিলাগুলোর সাহায্য প্রয়োজন ছিল। আরব কবিলাগুলোকে এই এই মিথ্যা আশ্বাসে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। যেহেতু তাদের কাছে কোনো সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব ছিল না, তাই এলেনবি এডওয়ার্ড লরেন্সকে এই কাজের দায়িত্ব দেয়। লরেন্স এসে আরবের সামরিক বিদ্রোহকে সংগঠিত করে। অপরদিকে শরিফ হুসাইনের ছেলে ফয়সাল নেতৃত্বের ঘাটতি পূরণ করে।

লরেন্স বিদ্রোহের জন্য অস্ত্র ও স্বর্ণ সাপ্লাই দেয়। লরেন্স ও ফয়সাল গোপনে সাক্ষাৎ করছিল এবং এই দুজন মিলে আরব-বিশ্বে উসমানিদের ক্ষমতা নিঃশেষের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল। তাদের প্ল্যান ছিল যে, আরব কবিলাগুলো উসমানিদের সামরিক ঘাঁটিতে হামলার পরিবর্তে উসমানিদের বিরুদ্ধে 'আঘাত করো এবং পলায়ন করো' এই নীতিতে যুদ্ধ শুরু করবে। তাদের দ্বিতীয় প্ল্যান ছিল মদিনা থেকে দামেস্ক পর্যন্ত রেললাইনকে উড়িয়ে দেওয়া, যা ফিলিস্তিনের যুদ্ধের জন্য শাহরগের মতো ছিল। ১৯১৭ সালের ৭ জুলাই আরব গেরিলা বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে উসমানিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর আকাবা দখল করে নেয়। এটা ব্রিটেনের জন্য এমন এক সফলতা ছিল, যা ব্রিটিশ জেনারেল স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। আকাবা দখলের পর লরেন্স এলেনবির সাথে সাক্ষাতে মিশরে যায় এবং সেই সাক্ষাতে এলেনবি লরেন্সকে আরও অধিক স্বর্ণ ও অস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এই আরব বিদ্রোহ উসমানিদেরকে তাদের ৩০ হাজার সেনাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে এনে এই বিদ্রোহ দমানোর কাজে ব্যবহার করতে বাধ্য করে। আর এটাই ছিল বিদ্রোহ থেকে অর্জিত ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় সফলতা।

আরব বিদ্রোহীদের এই সফলতার ফলে এলেনবির জন্য স্বল্প সেনা নিয়ে দামেস্ক বিজয় করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে এলেনবি দামেস্কে হামলার প্রস্তুতি নেয়। এলেনবি এই হামলা শুরু করার পর আরব বিদ্রোহীরা সাহায্যের জন্য মদিনা থেকে দামেস্কের রেললাইনের চার মাইল লোহার পাত বারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়। এই হামলার ফলে উসমানিদের যুদ্ধের সক্ষমতা অনেক কমে যায় এবং তাদের পক্ষে দামেস্কের প্রতিরক্ষা অসম্ভব হয়ে যায়। যত সময় পার হচ্ছিল এই বিদ্রোহের শক্তি ততই

বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঐতিহাসিকরা লিখেছে যে, আরব বিদ্রোহীদের এই যুদ্ধ যতটা না ছিল স্বাধীনতার জন্য তার থেকে বেশি সম্পদ লুণ্ঠনের যুদ্ধ ছিল। এলেনবির দামেস্কের ওপর হামলার জবাবে উসমানিরা তাদের প্রতিরক্ষা পজিশন দৃঢ় করা শুরু করে এবং এর জন্য তারা জার্মান জেনারেলকে দায়িত্ব দেয়। বাহিনীর কাছে অস্ত্র ও রসদের সাহায্যও তারা পৌঁছে দিয়েছিল।

ম্যাগিডু'র যুদ্ধ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উসমানিদের পরিস্থিতি অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আনোয়ার পাশার ইরাক থেকে বাহিনী নিয়ে বের হয়ে আসা, আমেরিকার বাহিনী ইউরোপে পৌঁছা এবং শরিফ হুসাইনের গাদ্দারির ফলে ফিলিস্তিনে জেনারেল এলেনবির অবস্থা অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। আর সে এই সুযোগকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে উসমানিদের ওপর হামলা করে বসে। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ম্যাগিডু যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে উসমানিরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে এবং অনেক তুর্কি সেনা গ্রেফতার হয়। ব্রিটেনের বিমান হামলার ফলে রাস্তায় অসংখ্য লাশ পড়ে ছিল। ম্যাগিডু যুদ্ধের পরাজয়ের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যে উসমানিরা হেরে গিয়েছে এবং এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, কখন শত্রুবাহিনী তুর্কিতে প্রবেশ করবে।

কেন্দ্রীয় শক্তির পরাজয়

অপরদিকে জার্মানির ফিল্ড মার্শাল 'হিন্ডেনবার্গ' ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ১৯১৮ সালের ২১ মার্চ জার্মানি একটি বড় হামলা করে বসে। ফলে জার্মানির বিজয় প্রকাশ হতে শুরু করে। এই হামলার ফলে পেরেশান হয়ে ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী এলেনবিকে ৯০ হাজার সেনা, অস্ত্র-রসদসহ ফিরে আসার আদেশ দেয়। ঠিক সেই সময় উসমানিদের যুদ্ধমন্ত্রী ছিল আনোয়ার পাশা। সে সিদ্ধান্ত নেয় উসমানিদের সেই অঞ্চলগুলো ফিরিয়ে আনা আবশ্যক, যা রাশিয়া দখল করেছে। তাই আনোয়ার পাশা কাফকাজের (ককেশাসের) যুদ্ধক্ষেত্র দ্বিতীয়বার খুলে দেয় এবং হঠকারীমূলকভাবে ফিলিস্তিনে থাকা বাহিনীর দক্ষ সেনাদের বের করে কাফকাজের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। যার ফলে ফিলিস্তিনের প্রতিরক্ষা দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি সেখানের তুর্কি বাহিনীতে অস্ত্র ও রসদের ঘাটতি দেখা দেয়। অসুস্থ ও আহতদের দেখভাল করারও কেউ ছিল না। অপরদিকে আমেরিকান বাহিনী ইউরোপে পৌঁছা শুরু করে। ফলে জার্মানি এতদিন সফলতার দিকে এগিয়ে গেলেও এখন পিছপা হতে শুরু করে।

তখন তুর্কি বাহিনীও পিছু হটে তুর্কির সীমানায় ঢুকে পড়েছিল। এই অবস্থা দেখে সর্বশেষ উসমানি সুলতান মুহাম্মাদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে সন্ধির আবেদন করে; কিন্তু সে তাতে অস্বীকার করে। টাউন শেড যে কুতুল ইমারাতে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল,

সে তখন উসমানিদের হাতে বন্দী ছিল। সে সন্ধির কথাবার্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যার ফলে ব্রিটেন ও উসমানিদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হয়। এটাকে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি না বলে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার চুক্তি বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই চুক্তির অধীনে জোট বাহিনীর এই অধিকার অর্জিত হয়ে যায় যে, তারা উসমানি সাম্রাজ্যের যেকোনো অংশ চাইলেই দখল নিতে পারবে। অপরদিকে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানি বিজয়ের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার পরেও আমেরিকার নব উদ্যমী বাহিনীর আসার ফলে তারা পরাজিত হয়ে যায় এবং ১৯১৮ সালে যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

ভার্সাই চুক্তি

এটা ছিল প্রথম চুক্তি, যা বিজয়ী জোট (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা) ও জার্মানির মধ্যে ফ্রান্সের শহর ভার্সাইলে হয়েছিল। এটা ছিল জার্মানির পরাজয়ের চুক্তি। ভার্সাই চুক্তির চারটি মৌলিক পয়েন্ট ছিল :

১. এই যুদ্ধ শুরুর একক দায়ভার জার্মানির এবং সমস্ত অপরাধ জার্মানির। তাই তাদের বাদশাহর ওপর মুকাদ্দামা চালানো হবে।

২. জার্মান বাহিনীর সক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হবে। জার্মানিকে শুধু এক লাখ স্থলসেনা ও ১৫ হাজার নৌসেনা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। অথচ জার্মানির কাছে ১৮টি যুদ্ধজাহাজ ও ১২টি টরপেডো-বোট ছিল। এমনকি সাবমেরিন রাখতেও বাধা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও জার্মানির ওপর রাইফেল, মেশিন গান, ট্যাঙ্ক ও বিমান বানানোতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

৩. জার্মানির অঞ্চলগুলোকে বণ্টন করে দেওয়া হবে। বর্তমান আধুনিক জার্মানি ১৮৭১ সালের বিপ্লবের পর জার্মেনিক বংশের এলাকাগুলো একত্রিত করে গঠন করা হয়েছিল। পূর্বে যা ফ্রান্স, সুইডেন, পোল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের অধীনে ছিল। এই চুক্তির অধীনে অ্যালসেস ও লোরেইন এলাকা ফ্রান্সকে দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে রাইনল্যান্ড কোনো পক্ষের অধীনে না রেখে স্বতন্ত্র রাখা হয়। উত্তর শ্লেসভিগ এলাকা ডেনমার্ককে দিয়ে দেওয়া হয়। সাইলেসিয়ার কিছু অঞ্চল যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। সাইলেসিয়ার পূর্ব অংশ পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়। ইউপেন ও ম্যালমেডি এলাকা বেলজিয়ামকে দেওয়া হয়। ক্লেপেডো এলাকা লিথুনিয়াকে দেওয়া হয়, প্রুশিয়ার কিছু অঞ্চল পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়।

৪. মিত্রবাহিনীর যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার জার্মানিকে পূরণ করতে হবে। এর পরিমাণ ছিল ২২৬ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা, যা পরে কমিয়ে ১৩২ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রায় নিয়ে আসা হয়। ১৯২৯ সালে সিদ্ধান্ত হয়, জার্মানি এই ব্যয়ভার ৫৯ বছরব্যাপী কিস্তিতে ১৯৮৮ সালে পূরণ করবে।

ঐতিহাসিকরা বলেন, এই চুক্তি বিশ্বের বুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই চুক্তির ফলে জার্মানির অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যাকে হাত-পা বেঁধে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হয়ে জান বাঁচানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত নিরপেক্ষ দর্শক ও ঐতিহাসিকগণ এই চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করে বলেন, এখন জার্মানির সামনে সারা জীবন গোলাম হয়ে থাকা অথবা এই চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগানো ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ২৮ বছর পর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীই বাস্তবায়িত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠা

অন্যদিকে ১৯১৮ সালে ফয়সাল ও তার সাথিরা বিজয়ীবেশে দামেস্কে প্রবেশ করে। যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্যের ফলে আরব সাগর থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিশাল আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের নিকটবর্তী চলে এসেছিল। কিন্তু যখন তারা জেনারেল এলেনবির সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন সে তাদের সামনে এই কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, যে ওয়াদা ব্রিটেন তাদের জন্য করেছিল, তা পূরণ করা অসম্ভব। কারণ শাম ও লেবানন ফ্রান্সের এবং ফিলিস্তিন, হিজাজ ও ইরাক ব্রিটেনের অধীন থাকবে। এ ছাড়া ফয়সালের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ফিলিস্তিনে ব্রিটেনের অধীনে এক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই কথায় ফয়সাল অনেক অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তাদের কাছে এক গাদ্দারের অসন্তুষ্টির কোনো গুরুত্ব ছিল না।

এলেনবি ব্রিটেনের যুদ্ধ-মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করে যে, বাহিনী ঘর থেকে বের হওয়ার পর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন যদি তাদেরকে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে। এই আবেদনকে যুদ্ধ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাহিনীর বড় অংশকে ফিরে আসার আদেশ দেয়। কিন্তু এভাবে বাহিনী কমিয়ে ফেলার দ্বারা ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্যে দখলকৃত এলাকাগুলোতে নিজেদের মনমতো কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। তাই তখন তাদের আরেকটি মিত্রের প্রয়োজন হয়, যা পূরণে এগিয়ে ছিল গ্রিস। গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ভেনিজেলোসের ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ তুর্কিকে গ্রিসের অংশ বানানো। তাই তারা তাদের সেনা পাঠাতে সম্মত হয়। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর গাদ্দার ফয়সাল ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে তখন ইউরোপে জায়োনিস্টরা চেম উইজম্যানের নেতৃত্বে জোরেশোরে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে থাকে। এর জবাবে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ১৯১৭ সালের দুই নভেম্বর জায়ানবাদী আন্দোলনের উদ্দেশে এক অভিশপ্ত চিঠি পাঠায়, যা ইতিহাসে 'বেলফোর ঘোষণা' নামে প্রসিদ্ধ। এই চিঠিকেই ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘোষণা বলা হয়।

সেভ্রে চুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট উসমানি এবং জোট বাহিনীর (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি) মধ্যে ফ্রান্সের সেভ্রে অঞ্চলে এক চুক্তি হয়, যাকে সেভ্রে চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তি মূলত মুসলিম উম্মাহর মানচিত্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করার চুক্তি ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ পঞ্চমের অবস্থা তখন জোট বাহিনীর হাতে কয়েদির মতো ছিল। মিত্রবাহিনী তাকে যা-ই আদেশ করত, সে তার ওপরেই দস্তখত করত। সেভ্রে চুক্তির অধীনে ইরাক, হিজাজ, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জর্ডান ব্রিটেনকে দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে শাম, আনাতুলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ফ্রান্সকে দেওয়া হয় এবং বাকি অংশ গ্রিসকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই চুক্তি ছিল মূলত সাইক্স-পিকোর গোপন চুক্তির বাস্তবায়ন[৫০], যা ১৯১৬ সালে ফ্রান্স-ব্রিটেনের মধ্যে ইসলামি বিশ্বকে বণ্টনের জন্য হয়েছিল।

মুস্তফা কামালের উত্থান ও উম্মাহকে ছিন্নভিন্ন করা

সেভ্রে চুক্তি সম্পাদন ও যুদ্ধ বন্ধের সাথে সাথে সমস্ত ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও উসমানি এলাকাগুলো দখল করা শুরু করে। আর্মেনিয়ার বাহিনী পূর্ব তুর্কি দখল করে নেয়। দক্ষিণ মধ্যপ্রাচ্যের আদনাহ অঞ্চল ফ্রান্স ও আর্মেনিয়ার বাহিনী দখল করে নেয়। ইতালি দক্ষিণ তুর্কি দখল করে নেয়। পশ্চিম তুর্কি অঞ্চল গ্রিস দখল করে। এই সময়টাতে উসমানিদের কেন্দ্র তুর্কির ওপর পুরো দুনিয়ার শক্তিগুলো দখল প্রতিষ্ঠার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আইনহীনভাবে দেশ চলছিল। ইস্তাম্বুলে থাকা সুলতানের অবস্থা জোট বাহিনীর হাতে কয়েদির মতো ছিল। পুরো তুর্কিতে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। এটা এমন এক শূন্যতা ছিল, যা কামাল আতাতুর্ক পূরণ করেছিল। সে সামরিক ও বেসামরিক নেতাদেরকে তুর্কি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার স্লোগানের অধীনে একত্রিত করে। কামালের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল আরববিশ্ব থেকে বিমুখ হয়ে শুধু তুর্কিকে পশ্চিমা শক্তির হাত থেকে স্বাধীন করে নেওয়া। সে সুলতানকে পশ্চিমা শক্তির খেলনা হিসেবে ঘোষণা করে এবং বলে, 'সুলতান তুর্কিকে বিক্রি করে ফেলছে।' সে একই সাথে সুলতান ও পশ্চিমাদের বিরোধিতা করছিল। তুর্কি জাতি যারা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুস্তফা কামালের স্লোগানে তারা নতুন জীবন ফিরে পায়। ১৯১৯ সালে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে কামালের সাথিরা বিজয় অর্জন করে নেয়।

---

৫০. এই চুক্তি মূলত সেই গোপন বৈঠকগুলোতে হয়েছিল, যা ১৯১৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে হয়েছিল, তখন রাশিয়ার সাথেও তাদের সৌজন্যমূলক সম্পর্ক ছিল। এই বৈঠকগুলোতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স খিলাফতে উসমানির অধীনে থাকা আরব অঞ্চলকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা অবস্থাতেই নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিয়েছিল, যেখানে ভবিষ্যতে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করবে। চুক্তির নাম সাইক্স-পিকো চুক্তি এই জন্য হয়েছিল, কারণ এই চুক্তি ফ্রান্সের কূটনৈতিক জর্জ পিকো ও ব্রিটেনের কূটনৈতিক মার্ক সাইক্সের মধ্যে হয়েছিল।

এই বিজয় কামালের আন্দোলনকে এক নতুন জীবন দান করে। তখন তারা আংকারাতে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে পশ্চিমাদের থেকে স্বাধীন এক গণতান্ত্রিক তুর্কি রাষ্ট্রের দাবি জানাতে থাকে এবং সেভ্রে চুক্তিকে মেনে নেওয়াকে অস্বীকার করতে থাকে। এই জায়গা থেকে তুর্কির যুদ্ধ নতুন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এখন তুর্কির যুদ্ধে মূল লক্ষ্য হয়ে যায় সমস্ত মুসলিম এলাকা থেকে মুখ ফিরিয়ে তুর্কি জাতীয়তা সংরক্ষণ এবং এই জাতীয়তার অধীনে তুর্কি রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা। ফলে এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে গিয়েছিল, যাদের নেতা ছিল কামাল আতাতুর্ক। এই জাতীয়তাবাদী জজবা ছিল খিলাফতের মৃত্যু।

১৯১৮ সালে যখন রাশিয়ান বাহিনী আর্মেনিয়া থেকে ফিরে যায়, তখন সেখানে এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং আর্মেনিয়ার নতুন রাষ্ট্র পূর্ব তুর্কিকে আর্মেনিয়ার অংশ মনে করতে থাকে। যেহেতু তারা উসমানিদের দুর্বলতার ফলে পূর্ব তুর্কি দখল করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে কামাল এটাকে তুর্কির অংশ মনে করত। ১৯১৯ সালের শীতের মৌসুমে তুর্কি বাহিনী জেনারেল কাজেমের নেতৃত্বে আর্মেনিয়ার ওপর হামলা করে তাদের বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৯২০ সালে আর্মেনিয়া তুর্কির সাথে শান্তিচুক্তি করে। সেই বছরেই কামাল রাশিয়ার সাথে চুক্তি করে নেওয়ার ফলে তুর্কির পূর্ব সীমানা নিরাপদ হয়ে যায়।

পূর্ব সীমানা নিরাপদ হয়ে যাওয়ার পর তুর্কিরা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার দিকে ধাবিত হয়, যেখানে আর্মেনিয়া ও ফ্রান্সের বাহিনী ছিল। তুর্কি বাহিনীর হামলার ফলে ফ্রান্সের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার কামালের সাথে সন্ধি করতে চাচ্ছিল; কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এর বিরোধিতা করে তার অতিরিক্ত সেনাদেরকে ইস্তাম্বুল পাঠিয়ে দেয়। সেই সময় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন কামালের হুকুমতকে অর্থ দিয়ে সাহায্যের ঘোষণা দেয়। ১৯২১ সালে গরমের মৌসুমে ফ্রান্স কামালের হুকুমতের সাথে শান্তিচুক্তি করে; যার ফলে ফ্রান্স প্রথমবার অফিসিয়ালভাবে কামালের হুকুমতকে মেনে নেয়। এর অর্থ ছিল, জোট বাহিনীর সেই সেভ্রে চুক্তি, যা তারা সুলতানের সাথে করেছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যার ফলে ব্রিটেনের পজিশনও খারাপ হয়ে যায় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জোট বিপদে পড়ে যায়। ১৯২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই চুক্তির অধীনে ফ্রান্স ও আর্মেনিয়ার সকল বাহিনী তুর্কি থেকে বের হয়ে যায়।

এখন কামালের হুকুমতের পূর্ণ লক্ষ্য সামনে গ্রিসের বাহিনীর দিকে ফিরে। ১৯২০ সালের জুন মাসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লর্ড জর্জ কামালের শক্তিকে বাধা দেওয়ার জন্য গ্রিসের বাহিনীকে তুর্কির ওপর হামলা করতে উসকে দেয়। তুর্কি বাহিনী গ্রিসের তিনটি হামলাকে ব্যর্থ করে দেয়। ফলে গ্রিসের বাদশাহ কনস্টান্টাইন নিজেই বাহিনীর নেতৃত্ব সামলিয়ে এগিয়ে আসেন এবং তার প্রথম হামলার ফলেই তুর্কিরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই অবস্থা দেখে কামাল তার পার্টির কাছে তিন মাসের জন্য গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাহিনীর পূর্ণ নেতৃত্ব কাঁধে নেওয়ার দাবি জানায়। ফলে তাকে এর অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯২২ সালের আগস্টে তুর্কিরা বার্সাহ ও আজমিরে একই সাথে হামলা করে। কয়েক দিনের কঠিন

যুদ্ধে গ্রিসের বাহিনী পরাজিত হয়ে আজমিরের দিকে চলে যায়। তুর্কিরা পিছু ধাওয়া করে আজমিরে চলে আসে। গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী লর্ড জর্জের কাছে সাহায্যের দাবি জানায়। কিন্তু সে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। তখন গ্রিসের বাহিনী এই দুরবস্থার মধ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে আজমির থেকে পলায়নে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় আজমির শহরে হঠাৎ আগুন লেগে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। কামালের বাহিনী যখন শহরে প্রবেশ করে, তখন সেখানে গ্রিসের কোনো সেনা উপস্থিত ছিল না। তখন কামাল তার সব নিশানা ব্রিটেনের বাহিনীর দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যারা তখন ইস্তাম্বুল দখলে রেখেছিল। ব্রিটেন বিপদ আঁচ করে কামালের সাথে সন্ধি করে নেয়; ফলে কামাল বিজয়ী বেশে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করে।

লুজিয়ান চুক্তি

যেহেতু কামালের আন্দোলন সেভ্রে চুক্তিকে বাতিল করে ফেলেছিল, তাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইসলামি অঞ্চলগুলো ভাগ-বণ্টনের জন্য সেভ্রে চুক্তিকে দ্বিতীয়বার উজ্জীবিত করার প্রয়োজন পড়ে। তাই ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি সুইজারল্যান্ডের লুজিয়ান শহরে আরও একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে, যেখানে সুলতান মুহাম্মাদের পরিবর্তে কামালের জাতীয়তাবাদী পার্টিকে দাওয়াত দেওয়া হয়। ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই আট মাসের আলোচনার পর লুজিয়ান চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে তুর্কিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। আনাতুলিয়া ও তুর্কির কয়েকটি এলাকাকে তুর্কির সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। মর্মর সাগরকে আন্তর্জাতিক অঞ্চল বানিয়ে দেওয়া হয় এবং বাকিগুলো সেভ্রে চুক্তিতে যেমন ছিল তেমনই থাকে। সেভ্রে ও লুজিয়ান চুক্তি ফ্রান্সে হওয়া সাইক্স-পিকোর গোপন পরিকল্পনার বাহ্যিক বাস্তবায়ন ছিল। যা ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে টুকরো টুকরো করার জন্য করেছিল।

মুসলিম উম্মাহর কী অর্জিত হলো?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। মুসলিমদেরকে স্বাধীনতা, সমতা, উন্নতি ও দেশপ্রেমের ধর্মহীন স্লোগান শেখানো হয়ে গেছে, এখন তারা এই সব স্লোগানের ভিত্তিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ বানানো শুরু করে দিয়েছে। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ শরিফ হুসাইন ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ ও ফয়সালের মতো গাদ্দারও পেয়ে গেছে; যারা ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে বিক্রি করে ইহুদিদের হাওয়ালা করে দিয়েছে। আরবের বাদশাহ হওয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং আরব জাতির উন্নতির দাবিদাররা এখন আরবকেই হিজাজ, ইরাক ও জর্ডানে ভাগ করে নিয়েছে। শরিফ হুসাইন হিজাজে, ফয়সাল ইরাকে ও আব্দুল্লাহ জর্ডানের বাদশাহ হয়ে গেছে। ১৯২৭ সালে শেখ আব্দুল আজীজ আলে সৌদ শরিফ হুসাইন থেকে

হিজাজ ছিনিয়ে নেয় এবং সে ১৯৩১ সালে জর্ডানে দেশান্তরিত অবস্থায় মারা যায়। ১৯৩৩ সালে তার ছেলে ফয়সাল ইরাকে মারা যায়। ১৯৩৯ সালে ফয়সালের ছেলে গাজি গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা যায়। গাজির পাঁচ বছরের ছেলেকে ফয়সাল ২য় নামে সিংহাসনে বসানো হয়। ১৯৫৮ সালে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। এটাই ছিল উম্মাহর ঐক্যকে বিনষ্টকারী বংশের পরিণতি, যারা আরব-বিশ্বের বাদশাহ হওয়ার জন্য পুরো উম্মাহকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তারা এখন শুধু জর্ডানেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। ১৯৫১ সালে ফয়সাল ২য় এর ছেলে আব্দুল্লাহকে হত্যা করা হয়। অতঃপর তার ছেলে তালাল বাদশাহ হয়; কিন্তু মানসিক অসুস্থতার ফলে তাকে অপসারণ করা হয়। তারপর তালালের ছেলে শাহ হুসাইন বাদশাহ হয়। ১৯৯৯ সালে শাহ হুসাইনের মারা যাওয়ার পর তার ছেলে শাহ আব্দুল্লাহ ২য় নামে জর্ডানের বাদশাহ হয়, যে আজও রয়েছে।

তুর্কিতে কামাল পুরো জাতিকে স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র ও উন্নতির স্লোগান শিখিয়ে দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তুর্কিতে আরবি শব্দের ব্যবহার বিলুপ্ত করে ইংরেজি শব্দ চালু করা হয়। ইংরেজদের পোশাক গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং সেটাকে তুর্কিদের জাতীয় পোশাক ঘোষণা দেওয়া হয়। ধর্মীয় নিদর্শন আজান, পর্দা, দাড়ি ইত্যাদিকে বিলুপ্ত করে পশ্চিমা সংস্কৃতি চালু করা হয়। সময়ের সাথে সাথে তুর্কিতে কামালের প্রভাবে ধর্মহীন সংবিধান বাস্তবায়িত হতে শুরু করে, যা আজও চলমান রয়েছে। আল্লাহর নবি ﷺ যখন দুনিয়া থেকে অফাত হন, তখন নিজের পরে খিলাফতে রাশিদাকে রেখে যান। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বড় বড় শক্তিশালী সুলতানগণ অতিবাহিত হয়েছেন। যাদের মধ্যে গজনবি, সেলজুকি, আইয়ুবি, জিংকি ও মামলুকরা অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রত্যেকেই আব্বাসি খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখাকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করেছেন। তাতারদের হামলার পর যখন বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের পতন হয়, তখন সুলতান বাইবার্স হালাকু খানকে আইনে জালুতে পরাজিত করার পর খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করা নিজের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে নেন এবং দ্বিতীয়বার আব্বাসি খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করে মুসলিমদের কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদের আসল শাসনব্যবস্থা হলো খিলাফত।

মানবাধিকার, ধর্ম ও বিজ্ঞানে দ্বন্দ্ব, বুদ্ধি ও ইলমে ওহির দ্বন্দ্বের মতো স্লোগান ও পরিভাষা ব্যবহার করে পশ্চিমারা ফরাসি বিপ্লবে খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিমদের মুনাফিক শাসকরা এই সমস্ত বাস্তবতা-বিবর্জিত স্লোগান ও মিথ্যা পরিভাষাগুলো মুসলিমদের শিক্ষা দেয় এবং পুরো উম্মাহকে এই কথা বোঝায় যে, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য এর দ্বারাই অর্জিত হবে এবং সবকিছুর সমাধান স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতি এসব গণতন্ত্রের মাধ্যমে অর্জিত হবে। উসমানিদের পতনের পর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া মুসলিমদের সমস্ত সম্পদ দখল করে নেয়। এই যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল ব্রিটেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দুস্থানের বাহিনী ছাড়া ব্রিটেন কি এই বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হতো? এর জবাব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে

শুধুই 'না' ব্যতীত আর কিছু হবে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া মিলেও এমন অবস্থানে ছিল না যে, তারা উসমানিদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম তিন বছরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে কোনোই সফলতা অর্জিত হয়নি।

ইস্তাম্বুলে ব্যর্থ হামলা, গ্যালিপলিতে পরাজয়, কুতুল ইমারাতে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় এবং গাজার প্রথম দুই যুদ্ধের পরাজয়সহ এই ঘটনাগুলো আমাদের চিৎকার করে বলছে, উসমানিদের পতন ব্রিটেন করেনি; বরং ১৫ লাখ হিন্দুস্থানি সেনাই করেছিল। যাদের ৭৪ হাজার সদস্য যুদ্ধে মারা যায় এবং ৬৪ হাজার সেনা আহত হয়। এই পনেরো লাখের বাহিনীতে পাঞ্জাব রেজি., বেলুচ রেজি. ও ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সমস্ত সেনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পনেরো লাখের মধ্যে অর্ধেকই মুসলিম ছিল, যাদের মধ্যে বেলুচিস্তানের খুদাদাদ খান, ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের দোস্ত খান, পাঞ্জাব রেজি.-এর শাহ আহমাদ খান ইংরেজদের সাথে লড়াই করে ব্রিটেন থেকে নিজেদের বাহাদুরির সম্মানস্বরূপ ভিক্টোরিয়া ক্রস অর্জন করে। তারা কি মুসলিম ছিল? তারা বাহাদুরি দেখিয়েছে কীসের জন্য? যে বাহাদুরির সম্মান তাদের অর্জিত হয়েছে, তা কী ধরনের বাহাদুরির জন্য ছিল? এই ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআনের ফয়সালা স্পষ্ট এবং যার ব্যাখ্যায় উলামায়ে সালাফ ও খালাফের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। যে কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেকোনোভাবে কাফিরদের সাহায্য করে, সে কুফুরি করেছে এবং সে কুফুরির সর্বনিকৃষ্ট অবস্থায় লিপ্ত হয়েছে।

শাইখুল হিন্দের আন্দোলন, যাকে রেশমি রুমাল আন্দোলনও বলা হয়, এই আন্দোলন আপন উদ্দেশ্য তথা হিন্দ থেকে ইংরেজদের হুকুমতকে বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয়নি। এর মূল কারণ ছিল, মাওলানা মাহমুদুল হাসান ﷺ-এর গ্রেফতারি ও আমিরে আফগান হাবিবুল্লাহর দ্বিমুখী নীতি, যে এই আন্দোলনকে সঠিক সময়ে কাজ করা থেকে বাধা দিয়েছিল। ফলে যদিও হাবিবুল্লাহর কোনো ফায়দা হয়নি এবং ১৯১৯ সালে জালালাবাদে সে মারা যায়; কিন্তু তা ইংরেজদেরকে উসমানিদের পতন ঘটানোর অনেক সুন্দর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা এই কথার ওপর একমত যে, যদি হাবিবুল্লাহ দ্বিমুখী না হতো এবং মুজাহিদদের সাহায্য করত, তাহলে সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলে গভীর প্রভাব ফেলতে পারত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উপমহাদেশে ব্রিটেনের অবস্থা

শাইখুল হিন্দের আন্দোলনের পর ইংরেজরা সেই পুরাতন প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে পেয়ে গিয়েছিল, হিন্দুস্থানে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ কী হবে? এর জবাব ইংরেজদের গোপন রিপোর্টে এটা ছিল যে, যদি বিশ্বযুদ্ধের মতো অবস্থা থাকে, তাহলে হিন্দুস্থানকে ভবিষ্যতে ইংরেজরা দখল করে রাখা অসম্ভব। তাই ইংরেজরা যুদ্ধের পর হিন্দুস্থানে এমন ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা শুরু করে, যার সাহায্যে হিন্দুস্থান ছেড়ে যাওয়ার পরেও তার ওপর তারা পরোক্ষ দখলদারিত্ব ধরে রাখতে পারবে।

এই নীতির ওপরেই বাহিনী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানো শুরু করে। ১৯২২ সালে বাহিনীকে চতুর্থবারের মতো নতুনভাবে গঠন করে, যাকে 'হিন্দুস্থানি-করণ' বলা যায়। ১৯৩৭ সালে ও পরে ১৯৪৬ সালে নির্বাচন সংঘটিত হয়। যা ইংরেজদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার আলামত ছিল। ইউরোপে ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং ১৯৩৯ সালে হিটলারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু এই দুঃস্বপ্নের মধ্যে সর্বশেষ পেরেক হিসেবে কাজ করেছিল। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়ে আলাদা পাকিস্তান গঠিত হয়ে যায়। পাকিস্তান আন্দোলনের সফলতায় মুসলিম লীগের ভূমিকা বাড়িয়ে বলে বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তান আন্দোলন এমন এক প্লাটফর্ম ছিল, যেখানে বিভিন্ন পার্টি ও পক্ষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলিম লীগ শুধু একটি পক্ষ ছিল, যেখানে তাহরিকে মুজাহিদিন ও কাবায়েলি মুজাহিদিন থেকে নিয়ে শাইখুল হিন্দ পর্যন্ত সবারই শক্তিশালী ভূমিকা ছিল। সৎ ধারণার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের প্রচেষ্টাকে মুসলিমদের রক্ষার এমন এক চেষ্টা বলা হয়, যা প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত। অন্যদিকে মুজাহিদ ও আলিমদের চেষ্টা শুধুই দ্বীন বিজয়ের চেষ্টা ছিল। এই দুই গ্রুপ যদি একত্রিত হয়ে থাকে, তাহলে শুধু এই কথার ওপরেই ছিল যে, আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে কেবলই ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়িত হবে। সত্যপন্থী আলিমরা যখন এই আন্দোলনের সাথে অংশগ্রহণ করে, তখন এমন এক শক্তি অর্জিত হয়, যা দ্বারা বাংলা ও সীমান্তের বিদ্রোহ সফল হয়েছিল এবং পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল।

তৃতীয় আফগান-যুদ্ধ (১৯১৯-১৯২০ খ্রি.)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উসমানি সাম্রাজ্যের পতন সত্ত্বেও শাইখুল হিন্দের আন্দোলন উপমহাদেশে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছিল। অনেক হিন্দু ও শিখ আন্দোলন তাদেরকে সাহায্য করতে শুরু করে। হিন্দুস্থানের ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে শক্তিশালী বিদ্রোহ শুরু হয়। তন্মধ্যে সিঙ্গাপুর বিদ্রোহ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। এই বিদ্রোহে এক হাজার থেকেও অধিক মুসলিম সেনা বিদ্রোহ করেছিল এবং এই বিদ্রোহ পুরো সিঙ্গাপুরে ছড়িয়ে

গিয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়ান সামুদ্রিক বহরকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয়েছিল। তেমনিভাবে লাহোর, ফিরোজপুর ও আগ্রার বাহিনীতেও বিদ্রোহ হয়েছিল। বাঙ্গাল বিদ্রোহ এতটাই ছড়িয়েছিল যে, সেখানের সব কাজ স্থবির হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ ইরান, সিজিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু বেলুচ কবিলা ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করে দেয়। ফলে ইংরেজরা বেলুচ থেকে করাচি পর্যন্ত এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে আফগান হাবিবুল্লাহ—যে ইংরেজদের একনিষ্ঠ সেবক ছিল এবং আফগান জনগণকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিল—তার গোলামি তার জন্যই ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে। ১৯১৯ সালে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তাকে দেশান্তরিত অবস্থায় হত্যা করা হয়। অতঃপর তার ছেলে আমানুল্লাহকে আফগানের আমির নির্ধারণ করা হয়। সে আমির হওয়ার প্রথম দিনেই ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে গান্দামাক চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয় এবং বলে দেয়, 'আজকের পর আফগান নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কাজে স্বাধীন। আফগান এখন চাইলে ব্রিটেনের সাথে থাকতে পারবে বা চাইলে রাশিয়ার সাথে থাকবে অথবা ইচ্ছা করলে কারোর সাথেই থাকবে না।' আমানুল্লাহর এই ঘোষণার ফলে তৃতীয় আফগান জিহাদ শুরু হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের বিপরীতে তৃতীয় আফগান-যুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আফগানরাই প্রথম হামলা করতে এগিয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও ব্রিটেনের শক্তি দুর্বল হতে দেখে আফগান-আমির আমানুল্লাহ হিন্দুস্থানের ওপর তিন দিকে অর্থাৎ খাইবার, করম ও কান্দাহার থেকে হামলা করে। এর ফলেই তৃতীয় আফগান-যুদ্ধের শুরু হয়। এই যুদ্ধের ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধের ফলে কাবায়েলি এলাকায় জিহাদের নতুন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। যখন আফগান বাহিনী পাকিস্তানের থাল অঞ্চল দখল করে, তখন খাইবার ও ওয়াজিরিস্তানের বাহিনী বিদ্রোহ করে মুজাহিদদের সাথে অংশ নেয়। ফলে ইংরেজ বাহিনী দুই বছরের জন্য ওয়াজিরিস্তান খালি করে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং ব্রিটেন সাম্রাজ্যের সাথে আফগানের একটি চুক্তি হয়, যা 'রাওয়ালপিন্ডি চুক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। এই চুক্তির ফলে ব্রিটেন সাম্রাজ্য আফগানকে স্বাধীন ও স্বকীয় রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেয়, যারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কাজে স্বাধীন হবে এবং পাশাপাশি ভবিষ্যতে আফগানে অনুপ্রবেশ না করার ওয়াদাও করে। আফগান সর্বদাই স্বাধীন ছিল, তবে শেষ ৭০ বছরে ব্রিটেন তাদের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কার্যক্রমে বারবার অনুপ্রবেশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু জিহাদের বরকতে তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কখনোই সফল হয়নি।

শাহজাদা ফজলুদ্দিন (দক্ষিণ কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র)

শাইখুল হিন্দের আন্দোলনের প্রভাবে দক্ষিণ কাবায়েলি জিহাদি কার্যক্রমের আকার ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এখানে মোল্লা পাওয়েন্দা ﷺ-এর মৃত্যুর পর মাসুদ কবিলা একটি বৈঠকের আয়োজন করে, যাদের নেতা ছিল মোল্লা হামজা উরফে মৌলভি আব্দুল হাকীম। এই বৈঠকে মোল্লা পাওয়েন্দা ﷺ-এর অসিয়ত পাঠ করা হয়। যেখানে কাবায়েলিদের সাধারণ নাসিহার পাশাপাশি তার ১৪ বছরের সন্তান ফজলুদ্দিনকে তার স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়টিও ছিল। সবাই শাহজাদা ফজলুদ্দিনকে নিজেদের বাদশাহ বানিয়ে নেয় এবং মোল্লা পাওয়েন্দার সমস্ত ক্ষমতা তাকে দিয়ে দেয়। অন্যদিকে সরকারী প্রশাসন তার বড় ভাই সাহেবুদ্দিনকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাচ্ছিল। তাই প্রথমে তারা ইংরেজদের পক্ষ থেকে মৌলভি আব্দুল হাকীমকে বলে, তিনি যেন ফজলুদ্দিনের পক্ষাবলম্বন না করেন। কিন্তু মৌলভি সরাসরি তা অস্বীকার করে দেয়। অতঃপর তারা সাহেবুদ্দিনকে প্ররোচিত করে মৌলভি আব্দুল হাকীমকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা সাজায়। কিন্তু এই হামলা থেকেও তিনি বেঁচে যান।

ঘরোয়া মতানৈক্য থেকে মুক্ত হয়ে শাহজাদা ফজলুদ্দিন কাবুলে সফর করেন, যেখানে আফগান-বাদশাহ আমানুল্লাহ তাকে অনেক আগ্রহভরে অভিনন্দন জানান এবং একুশ হাজার পাঁচশ রুপি হাদিয়া দেন। সেই সময় ইংরেজরা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফেঁসে গিয়েছিল এবং আমানুল্লাহও ইংরেজদের ওপর কঠিনভাবে হামলা করেছিল। কাবুল থেকে ফিরেই ফজলুদ্দিন এক বড় বৈঠকের মধ্যে হুকুমতকে ১৪ দিনের নোটিশ দেয়; যাতে বেলুচ রেজি.-এর পাহারাধীন মাসুদ গোত্রের মুজাহিদদের মুক্ত করে মাসুদ কবিলাকে ছেড়ে যায়। সময় শেষ হওয়ার পর মুজাহিদরা কিজুরির ওপর হামলা করে, যেখানে দশ সিপাহি মারা যায় এবং তিনজন আহত হয়। এরপর তিনি মুজাহিদদের আদেশ দেন, যাতে তারা ছোট ছোট টুলের ওপর আক্রমণ করে এবং কাফিরদের ওপর ধারাবাহিক হামলা শুরু করে। ইংরেজরা এই হামলাগুলোর ফলে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, হিন্দুস্থানের ভাইসরয় ঘোষণা দেয়, 'মাসুদ কবিলার অপরাধের সীমা পার হয়ে গেছে এবং আমরা বহিরাগত যুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়েই তাদের থেকে হিসাব মিটিয়ে নেব।'

কিন্তু আন্তর্জাতিক যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই তারা মাসুদ গোত্রের মুজাহিদদের ওপর সেনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এই জন্য তাদের যাতায়াত ও রসদ আনা-নেওয়ার জন্য মানজাই থেকে সুরুইকাই পর্যন্ত সড়ক পথের দরকার ছিল। যখনই ইংরেজরা সড়ক নির্মাণ শুরু করে, তখন মাসুদ কবিলা ঘোষণা দেয় যে, ঘোমল এলাকাতে ইংরেজদের কোনো ধরনের সড়ক বানাতে দেবে না। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মোল্লা হামজা ও শাহজাদা ফজলুদ্দিন সুরুইকাই-এর ওপর বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নেয়। যার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে কঠিন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মুজাহিদরা ইংরেজদের অনেক ক্ষতি সাধন করে সুরুইকাই কেল্লাতে অবরুদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু ট্যাংক রোড থেকে ইংরেজদের জন্য রসদ পৌঁছা ও

জিহাদি বাহিনীর রসদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে অবরোধ ছেড়ে আসতে হয়। এই ঘটনার পরও ইংরেজদের ওপর হামলার ধারা চলমান ছিল। সর্বশেষ ইংরেজ বাহিনী বিমানের মাধ্যমে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সেনা অবতরণ করায়; যার ফলে ইংরেজ ও মাসুদ গোত্রের মধ্যে চুক্তি হয়। যেখানে ইংরেজদের সমস্ত এলাউন্স ও সেবা চালু করা এবং সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করার ফয়সালা হয়। পাশাপাশি এই সিদ্ধান্তও হয় যে, এই এলাকাতে তারা কোনো ধরনের সড়ক নির্মাণ করতে পারবে না।

যখন আমানুল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আফগান-যুদ্ধ শুরু করে, তখন মাসুদ মুজাহিদরাও পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেয়। এই যুদ্ধে ওয়াজিরিস্তানের পাঠান মিলিশিয়া বিদ্রোহ করে শাহজাদা ফজলুদ্দিনের সাথে মিলিত হয় এবং নিজেদের বাহিনীকে ডেরা ইসমাইল খানের সীমান্ত পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে যায়। এর পর শাহজাদা ফজলুদ্দিন ব্যক্তিগত কারণে জিহাদের দায়িত্ব মির্জা আলি খানের কাঁধে সোপর্দ করে দেয়।

মির্জা আলি খান উরফে ফকির আই.পি. (১৮৯৭-১৯৬০ খ্রি.)

হাজি মির্জা আলি খান ওয়াজিরিস্তানে ফকির আইপি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার জন্ম উত্তর ওয়াজিরিস্তানে কামসাম গ্রামে; কিন্তু তার সম্বন্ধ ছিল ওয়াজিরিদের শাখা তুরিখাইলের সাথে। ১৯৩১ সালে তিনি বড় দুই ছেলেসহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে তার দুই ছেলেই শহিদ হয়ে যান এবং তিনিও আহত হন। হাজি সাহেব তখন জালালাবাদে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে শাহজাদা ফজলুদ্দিনের সাথে মিলে জিহাদ শুরু করেন। শাহজাদা ফজলুদ্দিন তার স্তর বৃদ্ধি করে নিজের পরামর্শক বানিয়ে নেন। শাহজাদা ফজলুদ্দিনের এই অনুভূতি হয় যে, মাসুদ কবিলা এখন নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়; তাই হাজি সাহেবকে তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দিকে অভিমুখী হওয়ার জন্য বলেন। হাজি সাহেব কিছুদিন অপেক্ষা করে অল্প সরঞ্জাম সংগ্রহ করে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে জিহাদ শুরু করে দেন। তিনি জিহাদের পাশাপাশি মাদরাসাতেও দরস আরম্ভ করেন। আলেকজান্ডার পোস্ট, খাইসুরা, কোট ও সিপলাটুই স্থানে লড়াই করে তিনি ইংরেজদের কঠিনভাবে পরাজিত করেন। এমনকি সীমান্ত প্রদেশের ইংরেজ গভর্নর ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি ফকির আইপি ও প্রশাসনের মাঝে সন্ধি করে দিতে পারবে, তাকে অনেক বড় পুরস্কার দেওয়া হবে। ফকির আইপিকেও বার্তা দেওয়া হয় যে, যদি সে বন্ধুত্ব করে, তাহলে ওয়াজিরিস্তানকে সোয়াতের মতো আলাদা রাষ্ট্র বানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইংরেজদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের দক্ষিণ সীমান্তের গভর্নর মিস্টার ডান্ডাস, পলিটিক্যাল এজেন্ট ও কাবায়েলি এজেন্ট মেজর কাক্স-সহ এরা সবাই ইংরেজদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছিল। যারা ব্রিটেনের বিরোধীদের পাকিস্তানেরও বিরোধী মনে করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যখন পাকিস্তানে প্রথম মুসলিম প্রধান নির্বাচিত হয়, তখন সেও ব্রিটেনের

নীতিকেই গ্রহণ করে নেয়। এবং ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের পলিটিক্যাল এজেন্ট আতাউল্লাহ হাজি সাহেবের বৈঠকের ওপর পাকিস্তানি বিমান বাহিনী দ্বারা হামলা করায়। যার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করে। এরপর হাজি সাহেব উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের এজেন্সির কাছে একটি স্বাধীন ও স্বকীয় রাষ্ট্রের দাবি জানায়। যাদের বহিরাগত নীতি, প্রতিরক্ষা ও কারেন্সি পাকিস্তানের অধীনেই থাকবে; কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে শরিয়াহ মুতাবিক পরিচালিত হবে। কিন্তু পাকিস্তানি হুকুমত না বুঝে এবং মুনাফিকি করে এমনটা হতে বাধা দেয়। শেষ জীবনে হাজি সাহেব অক্ষম হয়ে যান এবং ১৯৬০ সালে তিনি মারা যান।

রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির দ্বিতীয় গঠন (১৯২২ খ্রি.)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির গঠন পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনকে বাহিনীকে হিন্দুস্থানি-করণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তখন বাহিনীতে অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। দুই ধরনের অফিসার বৃদ্ধি করা হয়; এক. যাদের শিক্ষা ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে হয়েছে, তাদের ভাইসরয় কমিশন নাম দেওয়া হয়। এই অফিসারদের শুধু ইন্ডিয়ান বাহিনীর ওপরেই ক্ষমতা ছিল। দুই. সে সমস্ত অফিসার, যাদেরকে কংগ্রেস কমিশন বলা হতো, তাদের প্রশিক্ষণ হতো 'রয়েল সেন্ট হার্ট মিলিটারি একাডেমি ব্রিটেনে'। এই অফিসারদের ক্ষমতা হিন্দুস্থানি ও ব্রিটিশ উভয় বাহিনীর ওপর ছিল।

এই বাহিনীকে নতুন গঠনে মাদ্রাজ বাহিনীর পাঞ্জাব ও পাঠান রেজিমেন্টের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়, যা আজকের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অংশ। এ ছাড়া বোম্বাই রেজি.-এর বেলুচ ইনফেন্টারি এবং মাদ্রাজ বাহিনীর মিক্লাউড প্লাটুনকে মিলিয়ে বেলুচ রেজি. বানিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ পাক বেলুচ রেজি.। তেমনিভাবে গাইডের ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিকদের আলাদা বাহিনী বানিয়ে দেওয়া হয়। পদাতিক বাহিনীর নাম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাখা হয়, যা আজও এই নামে রয়েছে।

পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের নতুন গঠন এই সময়েই হয়েছিল। সেই যুগে তখনও ট্যাঙ্ক ব্যাপক হয়নি; তাই এই বাহিনীকে ঘোড়-সওয়ার ফোর্স বা কেভেলরি বলা হতো। এই বাহিনী ঘোড়া ও লাঞ্চার চালাত। আজও এই রেজিমেন্টকে এই নামেই ডাকা হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আজ এই রেজিমেন্টের কাছে ঘোড়ার পরিবর্তে ট্যাঙ্ক ও গাড়ি রয়েছে।
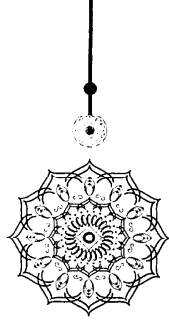
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দ্বিতীয় যুগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের
সমাপ্তি পর্যন্ত (১৯১৯-১৯৪৫ খ্রি.)

ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের যুদ্ধ

যেমনটা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভার্সাই চুক্তির ফলে। কারণ এর মাধ্যমে জার্মানির ওপর সামরিক অবরোধ আরোপ করা হয়। তাদের সম্পদসমৃদ্ধ এলাকা ফ্রান্সকে দিয়ে দেওয়া হয়। শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জার্মানিকে যুদ্ধ শুরুর অপরাধে সমস্ত জোটশক্তির যুদ্ধব্যয় আদায়ে বাধ্য করা হয়। জার্মানির কাছে তখন সম্পদসমৃদ্ধ এলাকা এবং জমানো কোনো অর্থ বাকি ছিল না। জার্মান জাতির মধ্যে এই চুক্তির বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল। বিশেষ করে চুক্তির সেই পয়েন্টের কারণে যেখানে জার্মানিকে যুদ্ধের একক দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। জার্মান জাতি এই চুক্তিকে জাতীয় অপমান হিসেবে গণ্য করে। এই চুক্তি জার্মান জাতির জন্য এটা ব্যতীত আর কোনো রাস্তা খোলা রাখেনি যে, তারা হয়তো সারা জীবন গোলামের মতো ট্যাক্স আদায় করে যাবে, নতুবা এই চুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহের জন্য তাদের শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল, যা হিটলার এসে পূরণ করে দেয়।

হিটলার ও ফ্যাসিবাদের উত্থান

হিটলার ১৮৮৯ সালে অস্ট্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করে। তার ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে আর্টিস্ট হবে, তাই আর্টিস্ট হওয়ার জন্য সে অস্ট্রিয়ার ভিয়ানাতে আসে। কিন্তু সে আর্ট কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। ফলে তার ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শন নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়। সেগুলো অধ্যয়নের পর হিটলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ইউরোপের সমস্যাগুলোর বড় কারণ দুটি। এক. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আর দুই. ইহুদি জাতি। তার ধারণামতে ইহুদিরা পুরো বৈশ্বিক বাণিজ্যকে দখল করে নিয়েছে এবং প্রত্যেক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পেছনে তাদের হাত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সে ধারণা করত গণতন্ত্র ইহুদিদের শাসনব্যবস্থা। যা মানুষকে দুর্বল নেতৃত্ব দেয় এবং সেই নেতৃত্বকে ইহুদিরা সহজেই কব্জা করে নেয়। সে ভিয়ানাতে

থাকাকালীন ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। হিটলার তাতে অংশ নেওয়ার জন্য জার্মান বাহিনীতে ভর্তি হয়, যেখানে সে দুবার আহত হয়। যুদ্ধে হিটলারের বীরত্ব অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার বাহাদুরির ফলে তাকে জার্মানির সবচেয়ে বড় সামরিক সম্মাননা আইরোন ক্রস প্রদান করা হয়। ১৯১৯ সালে সে যুদ্ধের ময়দানে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই জার্মানির পরাজয়ের খবর তার কাছে পৌঁছায়।

এই পরাজয় হিটলারের জীবন পরিবর্তন করে দেয়। সে রাজনীতিতে প্রবেশের ইচ্ছা করে। কিন্তু হিটলারের সামনে তখন এই প্রশ্ন আসে যে, সে রাজনীতির জন্য কোন পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই সময় তার সাক্ষাৎ হয় একটি ছোট দল নাজি পার্টির সাথে, যেখানে সর্বসাকুল্যে ২৫ জন সদস্য ছিল। এই পার্টি জার্মান জাতিকে বিদ্যমান সমস্যা থেকে বের করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখত। হিটলারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও তাদের সাথে মিলে যায়। সে এই পার্টিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় জার্মানির অবস্থা ছিল এমন যে, ভার্সাই চুক্তি জার্মানির সমাজকে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই অবস্থা হিটলারের কাছে উপযুক্ত মনে হয়। তার ভাষণগুলো পুরো জার্মানিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সে মৃতপ্রায় জার্মান জাতির মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, জার্মানরা দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম জাতি এবং এই জাতিকে গোলাম বানানোর অধিকার কারও নেই। পুরো ইউরোপকে শাসন করার অধিকার একমাত্র জার্মানিদেরই রয়েছে। সে ভার্সাই চুক্তিকে বিলুপ্ত করে দেয় এবং এই চুক্তির ওপর দস্তখত করার সমস্ত অভিযোগ রাষ্ট্রের সকল স্যোশালিস্ট ও ইহুদি পার্টির ওপর চাপিয়ে দেয়। সে জার্মানিদের সমস্যার মূল কারণ ইহুদিদেরকে সাব্যস্ত করে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে যে, সে শক্তিশালী হওয়ার পর পুরো ইউরোপ থেকে ইহুদিদের বের করে দেবে। সে জার্মান জাতির সাথে প্রতিজ্ঞা করে, যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে ভার্সাই চুক্তির বাস্তবায়নকে বন্ধ করে দেবে। এটাই ছিল সেই স্লোগান, যা ১৯২০ সালের সেই সময়ে জার্মান জাতি শুনতে এবং মানতে উন্মুখ হয়ে ছিল।

১৯৩১ সালে হিটলারের নাজি পার্টি সামান্য কিছু ভোট নিয়ে পার্লামেন্টে যায়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে এই পার্টি ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হয়ে যায়। সেই বছরেই হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হয়ে যায়; কিন্তু সে চ্যান্সেলর উপাধি ধারণের পরিবর্তে 'ফুয়েরার' উপাধি ধারণ করে। যার অর্থ ছিল 'নেতা'। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তার সমস্ত কাজ ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে যাওয়া শুরু করে। সে সমস্ত ধারা বাস্তবায়নে বাধা দেয় এবং অপরদিকে সে জার্মান বাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করতে থাকে। সেই সাথে সে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান বানানোর আদেশ জারি করে। ১৯৩৬ সালে সে রাইনল্যান্ড হামলা করে দখল করে নেয়। ১৯৩৮ সালে যুদ্ধ ছাড়াই সে অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। এরপর ১৯৩৮ সালে হিটলার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে যুগোস্লাভিয়ার জার্মানির অংশ দখল করে নেয় এবং কয়েক মাসে পুরো দেশ দখল করে নেয়।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে হিটলার মুসোলিনির পেশ করা ফ্যাসিবাদকে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। হিটলারের উত্থানের সাথে সাথে ফ্যাসিবাদও ইউরোপে উত্থান হতে থাকে। ফ্যাসিবাদের উত্থানের ফলে ইউরোপে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র বিপদে পড়ে যায়। ফ্যাসিবাদের ভিত্তি ছিল দুটি থিউরির ওপর :

- জাতীয়তাবাদ
- একনায়কতন্ত্র

হিটলার একদিকে জার্মান জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করে নিজেকে সবচেয়ে উত্তম ও সবার ওপর রাজত্ব করার অধিকারী প্রমাণ করে। অপরদিকে সে এই পদ্ধতিতে জার্মানিদের পরিচালিত করে যে, পুরো জাতি শুধু একজন ব্যক্তির ইশারায় চলতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালে হিটলার পোল্যান্ডে হামলা করে ১৮ দিন যুদ্ধের পর পোল্যান্ড দখল করে নেয়। পোল্যান্ড দখল করার সাথে সাথেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য লাফঝাঁপ শুরু করে। আর এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে ইতালি জার্মানির সাথে অংশ নেয়। জার্মানরা পোল্যান্ডের পর ফ্রান্স ও নরওয়ে দখল করে নেয়। পশ্চিম ইউরোপের পর জার্মানি তার নিশানা পূর্ব ইউরোপের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে রাশিয়ার ওপর তিনবার হামলা করে; কিন্তু প্রতিকূল মৌসুমি অবস্থার ফলে মস্কো দখল করতে পারেনি। আর এখান থেকেই তার পতন শুরু হয়। রাশিয়ার ওপর হামলার সাথে সাথে সে ইতালির সাহায্যে ব্রিটেনের অধীন মিশরের ওপরও হামলা করে বসে।

জার্মানির এই বিজয়গুলোর সামনে ১৯৪১ সালে যখন ব্রিটেনের পরাজয় নিশ্চিত হচ্ছিল, তখনই আমেরিকা তাদের সাহায্যে ময়দানে নামে। অন্যদিকে জাপান আমেরিকার সাথে শত্রুতার ভিত্তিতে জার্মানির সাথে অংশ নেয়। যার ফলে একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জোট হয় এবং অপরদিকে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের জোট হয়। রাশিয়া কোনো জোটে প্রবেশ করা ব্যতীতই জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। হিটলারের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল, সে বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে একই সাথে যুদ্ধফ্রন্ট খুলে রেখেছিল। যার ফলে এই অবস্থায় যুদ্ধকে দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখতে সে সক্ষম হয়নি। এই যুদ্ধে আমেরিকা জাপানের ওপর এটম বোমা নিক্ষেপ করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির পরাজয় জোটবাহিনীকে চতুষ্পার্শ্ব থেকে জার্মানির ওপর হামলা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। যার ফলে জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। পশ্চিমারা এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ব্রিটেন হিন্দুস্থানের রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে ব্যবহার করে। রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি তার প্রভুদের গোলামির জন্য ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাহিনী গঠন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের ২১টি পদাতিক ডিভিশন ও চারটি আর্মার্ড ডিভিশন অংশ নিয়েছিল। যা সর্বমোট ২৫ লাখ সদস্যের সমষ্টি ছিল। এই সেনারা বার্মা, মালয়, ইরাক, ইরান, শাম, লেবানন, ইতালি, সিঙ্গাপুর, তিউনিসিয়া, মিশর ও পূর্ব আফ্রিকার অঞ্চলগুলোতে ব্রিটেনের খিদমত আঞ্জাম দেয়। এই বাহিনীর ৮৭ হাজার সেনা যুদ্ধে নিজের প্রভুদের জন্য জান কুরবান করে এবং ৩০ জন ব্রিটেনের সামরিক পদক ভিক্টোরিয়া ক্রেস্ট অর্জন করে। এই যুদ্ধে বাহিনীতে সেনা ভর্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পাঞ্জাবে থাকা ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রধান সিকান্দার হায়াত খান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কার্যতভাবে পশ্চিমাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়, যার স্বপ্ন তারা দেখছিল। এই সফলতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা, ইসরাইল রাষ্ট্রকে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দেওয়া, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং জার্মান-ইতালির ফ্যাসিবাদের সমাপ্তি।
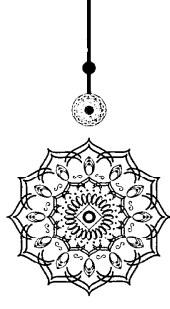
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের তৃতীয় যুগ

রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ (১৯৪৫-১৯৯১ খ্রি.)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদিও রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলো জার্মানি ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ছিল; কিন্তু তারা এমন প্রাণীর মতো ছিল, যারা ঝড়ের সময় টিলার কাছে একত্রিত থাকলেও ঝড় শেষ হওয়ার পর একে অপরের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূলত এমনটাই পশ্চিমা দেশগুলো ও রাশিয়ার মধ্যে হয়েছিল। যখনই যুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্রশক্তির বিপদ শেষ হয়ে যায়, তখন তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। রাশিয়া ও আমেরিকার এই যুদ্ধকে স্নায়ুযুদ্ধ (কোল্ড ওয়ার) বলা হয়।

১৯১৭ সালে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট বিপ্লব হয়। সে সময় বিপ্লবের প্রধান ছিল লেলিন। লেলিনের মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে জোসেফ স্টালিন রাশিয়ার বিপ্লবের নেতা হয়ে যায়। সে রাশিয়ার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে; ফলে অনেক কম সময়ে রাশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে হিটলার ও স্টালিনের মধ্যে পূর্ব ইউরোপের বণ্টন নিয়ে একটি গোপন চুক্তি হয়। এই চুক্তিকে মোলোটোভ-রিবেনট্রপ চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তি ছিল একটি ধোঁকা, কারণ ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়ার ওপর হামলা করে বসে। এই হামলার পর রাশিয়া এসে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে রাশিয়া পূর্ব জার্মানিসহ পুরো পূর্ব ইউরোপ দখল করে নেয়। এই দখলের পর রাশিয়া কিছু রাষ্ট্রকে সরাসরি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে আর কিছু রাষ্ট্রকে বিভিন্ন মাধ্যমে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই অন্তর্ভুক্তির পর রাশিয়া একে 'প্রাচ্যীয় জোট' নাম দেয়। এই জোটের মধ্যে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, বগ্রাত, রোমানিয়া ও আলবেনিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৯ সালে চীনে মাওসেতুং এর কমিউনিস্ট বিপ্লব হয়। স্টালিন চীনের সাথে চুক্তি করে। পশ্চিমারা এই চুক্তিকে নিজেদের জন্য বিপদ মনে করে। চীনের এই বিপ্লবের ফলে পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে কোরিয়া ও ভিয়েতনামে বিপ্লবের অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। ১৯৫৩ সালে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর হামলা করে। তখন আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্যের জন্য তার বাহিনী পাঠায়। ১৯৫৯ সালে আমেরিকা ভিয়েতনামে বাহিনী পাঠায়, যার ফলে ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু হয়, যা দশ বছর চলমান থাকে। সেই সময় রাশিয়া ও চীনের পরিকল্পনা ছিল স্পষ্ট। কারণ সমাজতন্ত্র প্রত্যেক

রাষ্ট্রেই চিন্তাযুদ্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তারা রাষ্ট্রের শিক্ষিত প্রভাবশালী শ্রেণিকে সংগঠিত করে শ্রমিকদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করত, যারা সেই রাষ্ট্রে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দিত। অতঃপর তাদের কাছে রাশিয়া বা চীনের সাহায্য চলে আসত। রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হওয়ার পর সেই রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব শুরু হয়ে যেত। আমেরিকা ও ইউরোপ রাশিয়া ও চীনের এই সম্প্রসারণ নীতির ফলে কঠিন ভীত ছিল।

আমেরিকার মোকাবিলায় রাশিয়া এটম বিস্ফোরণ ঘটায়, যাকে আমেরিকা তার জাতীয় নিরাপত্তার বিরোধী মনে করতে থাকে। যার ফলে বিশ্ব এক নতুন ধরনের যুদ্ধে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে কিছু মূলনীতি ছিল; কিন্তু এখানে মূল কৌশল ছিল, দুই পরাশক্তি সামনাসামনি আসার পরিবর্তে নিজেদের অঞ্চল থেকে দূরে কোনো ছোট রাষ্ট্রে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করত। দ্বিতীয় কৌশল ছিল, দুই পরাশক্তি বৈশ্বিকভাবে নিজেদের অক্ষে রাষ্ট্র-সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করে। রাশিয়ার সরাসরি সম্প্রসারণ নীতির ফলে পশ্চিমারা বিশেষ করে আমেরিকা অনেক ভীত ছিল।

রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে তখন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান এক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে, যাকে ট্রুম্যান ডকট্রেইন বলা হয়। এই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়, দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে তাদের অধীন করার জন্য বড় সেনা-সাহায্য পাঠাবে; যাতে তারা রাশিয়ার মোকাবিলা করতে পারে। এই সাহায্যকে 'পারস্পরিক সেনা সহযোগিতার কৌশল' বলা হয়। যে এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাকে ফ্রন্ট লাইন মিত্র ঘোষণা দেওয়া হতো। পাকিস্তানও এটাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই সময় এই যুদ্ধের নাম 'মোরাল ক্রুসেড' তথা নৈতিক ক্রুসেড যুদ্ধ রাখা হয়। ভারত এগুলোর দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি, কেননা তারা রাশিয়ার দিকে ধাবিত ছিল। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধান লিয়াকত আলি খান এবং তারপর জেনারেল আইয়ুব খান লাজ-শরম হারিয়ে 'মোরাল ক্রুসেডে' আমেরিকার সাথে জোট করে।

এই জোটের অধীনে পাকিস্তান আমেরিকাকে নিজের ভূমিতে বিমানঘাঁটি করার সুযোগ দেয়। প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা-বিমান ইউ-২ এই ঘাঁটি থেকেই উড়ে যেত। ট্রুম্যানের কার্যপদ্ধতি মুতাবিক পূর্ব ইউরোপেও স্বাধীন ঘাঁটি তৈরির ফয়সালা হয়, যা পরবর্তী সময়ে ন্যাটোর আকৃতি ধারণ করে। সেই সময় কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর হামলা করে। আমেরিকা এই কৌশলের অধীনে এই যুদ্ধেও সরাসরি নিজেদের বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। ফলে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সেনাঘাঁটি দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় আমেরিকা আরও বেশি আগ্রহী হয়ে কমিউনিস্ট ভিয়েতনামের ওপর হামলা করে। অন্যদিকে রাশিয়া ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট স্বাধীনতাপন্থীদের সর্বোচ্চ সাহায্য করে তাদেরকে আমেরিকার জন্য মরণফাঁদ বানিয়ে দেয়। এই যুদ্ধ থেকে আমেরিকা খালি হাতে ফিরে যায়; বরং সেখানে উলটো তাদের বিশাল ক্ষতির অঙ্ক গুনতে হয়। আমেরিকা ১৯৬৯ সালে তার বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

৬০ এর দশকে ফ্রান্সের জেনারেল 'আন্দ্রে বিউফার' মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের থিউরি পেশ করে, যা আমরা পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার থিউরি অনুযায়ী পুনরায় আমেরিকা নিজ বাহিনীকে সজ্জিত করে। তার থিউরি অনুযায়ী আমেরিকা রাশিয়ার শক্তিকে তিন পদ্ধতিতে কাবু করতে সক্ষম হবে :

- ভয় সৃষ্টি করা, যার ফলে শত্রু কোনো ধরনের বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া থেকেই দূরে থাকবে। যাকে 'ডিটারেন্স তত্ত্ব' বলা হয়।

- যদি শত্রুকে ভীত রাখা না যায়, তাহলে দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাদের নিজেদের শক্তিকে এতটুকু উন্নত করা; যাতে শত্রু কোনো আক্রমণ করে সফল হতে না পারে।

- শত্রুকে অবরোধ দেওয়া; যাতে তারা নিজেকে সম্প্রসারিত করতে না পারে।

এই কৌশল বাস্তবায়নের জন্য আমেরিকা তার বাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করে এবং তাদের বাহিনীকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেয়। যার মাধ্যমে আমেরিকা পুরো বিশ্বের চতুষ্পার্শ্বে একটি সামরিক অবরোধ তৈরি করে। অপরদিকে ষাটের দশকে রাশিয়া একটি পরাজয়ের শিকার হয়। তারা নতুন এক প্ল্যানের ভিত্তিতে কিউবা থেকে আমেরিকার ওপর মিসাইল হামলার চেষ্টা করে; কিন্তু বিপরীতে আমেরিকা পরমাণু-যুদ্ধের ধামাকা লাগিয়ে দেয়। যার ফলে রাশিয়া তার পরিকল্পনা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এটাকে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস বলা হয়। যার পর ১৯৭৯ সালে রাশিয়া—যারা নিজেদের সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নে ওয়ার্ম ওয়াটারের তালাশে আফগানে প্রবেশ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল উপকূল পর্যন্ত রাস্তা করে নেওয়া। ফলে আফগানে অবারও জিহাদ শুরু হয়।

আফগান জিহাদ মূলত ইতিহাসের এক চূড়ান্ত মোড়, যেখানে পুরো দুনিয়ার ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলো এক প্লাটফর্মে একত্রিত হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। আমেরিকা ও পাকিস্তান যখন দেখল, মুজাহিদরা রাশিয়াকে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে, তখন তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুজাহিদদের সাহায্য করা শুরু করে। ফলে রাশিয়ার পরাজয় হয় এবং ১৯৯১ সালে USSR (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ভেঙে যায়। যার ফলে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং এরপর বিশ্ব নতুন এক মেরুকরণের যুগে প্রবেশ করে।

কোল্ড ওয়ারে রাশিয়া ও আমেরিকার কর্মপদ্ধতি

কোল্ড ওয়ার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ও ইউরোপ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের অর্থব্যবস্থাও ধসে পড়ে। এই অবস্থা থেকে উন্নতির জন্য এই রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের ঘোষণা দেয় এবং পুরো দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে এই প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান করে। কোল্ড ওয়ারে যুদ্ধক্ষেত্র ছিল তিনটি : ১. রাজনৈতিক ২. অর্থনৈতিক ৩. সামরিক। এই তিনটি যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল। আমরা এই দুই রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

কোল্ড ওয়ারে রাশিয়ার কর্মপদ্ধতি

রাশিয়া মূলত সমাজতন্ত্রের[৫১] আহ্বান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজতন্ত্রের জনক ছিল জার্মানির দার্শনিক কার্ল মার্ক্স। এই থিউরি ছিল ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিক্রিয়া। সেই সময় এই ব্যবস্থার উত্থান হয়, যখন ১৯১৭ সালে লেলিন রাশিয়ার জারকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। লেলিনের মৃত্যুর পর সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় বড় লিডার ছিল স্টালিন, যে এই বিপ্লবকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। রাশিয়ার প্রভাবে সমাজতন্ত্র অন্যান্য রাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট বিপ্লব তিনটি ধাপ পাড়ি দেয় :

- প্রথম ধাপ, রাষ্ট্রের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণিকে রাশিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা। যার ফলে একটিভ একটি শিক্ষিত বিপ্লবি দল তৈরি হয়ে যেত।
- দ্বিতীয় ধাপ, উল্লেখিত দলকে নিজ রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, যেখানে তারা বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করত। তারা নিজেদের দেশে শ্রমিক, মেহনতি ও শিক্ষিত শ্রেণিকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিত এবং বেসামরিক বিদ্রোহীদের আন্দোলন সৃষ্টি করত। অপরদিকে সামরিক গেরিলা কার্যক্রমের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করত।
- তৃতীয় ধাপ, প্রশাসন দখল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

---

৫১. সমাজতন্ত্র হলো সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায়। তৎকালীন রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন যদিও একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র ছিল; কিন্তু আমরা এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজবাদ ও সাম্যবাদকে একক শক্তি হিসেবেই আলোচনা করব। সাম্যবাদ হলো সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ।

এই কার্যক্রম অনেক সফলতা লাভ করে। অনেক কম সময়েই সমাজতন্ত্র পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দুটি অতিরিক্ত বিষয় অনেক বেশি সাহায্য করেছিল।

একটি ছিল জাতীয়তাবাদ ও অপরটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স সাম্রাজ্যের কলোনিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়া। যার সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্র সেই রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নামে গেরিলা আন্দোলন চালু করে দিত। এর মধ্যে ভিয়েতনাম ও আল-জাজায়িরের স্বাধীনতা আন্দোলন অধিক প্রসিদ্ধ। এভাবে সমাজতন্ত্রের বিস্তার পুঁজিবাদী পশ্চিমাদের কঠিন পেরেশানিতে ফেলে দেয়।

রাশিয়া ও চীনের অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি

স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিতীয় অংশ ছিল ইকোনমিক সিস্টেম। সমাজতন্ত্র ছিল মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীত। পুঁজিবাদ হচ্ছে স্বাধীন বাণিজ্যব্যবস্থা এবং এমন এক সিস্টেম, যেখানে প্রশাসনের অনুপ্রবেশ সর্বোচ্চ কম হয়ে থাকে এবং পুঁজিবাদীদের যেখানে ও যেভাবে ইচ্ছা পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ থাকে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদকে গরিব ও শ্রমিক শ্রেণির জন্য ক্ষতিকর মনে করে এবং প্রশাসনকে সমস্ত জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বশীল মনে করে। এই জন্য তারা এমন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, যা পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় কন্ট্রোলে পরিচালিত হতো। এই নীতিকে ন্যাশনালাইজেশন পলিসি বলা হয়। এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পুরো রাষ্ট্রের প্রয়োজন হিসেব করে কাঁচামাল আমদানি, শিল্পোন্নতি ও মার্কেটে বিক্রি করার পরিকল্পনা তৈরি করত।

এই ধরনের বাণিজ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এবং তারপর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অনেক সফলতার সাথে এগিয়ে যেতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল, এই দুই যুদ্ধের পর রাশিয়া ও বাকি বিশ্বের বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে উন্নতির অনেক সুযোগ তৈরি হয়, তখন ঋণও ছিল অনেক বেশি। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘাটতি কাটিয়ে উঠে, তখন এই ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয় এবং এই নিষ্ক্রিয়তা তার পতনের কারণ হয়। এর আরেকটি কারণ ছিল, রাশিয়া বড় বড় মিশন ও অস্ত্র-শিল্পের দিকে অধিক ধাবিত হয়ে পড়ে। ফলে জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে যায়। যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মার্কেট পতনশীল হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ও লাভ অনেক বেড়ে যায়। অন্যদিকে অস্ত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, অনেক অস্ত্র স্টোরে পড়ে থাকত; কিন্তু মানুষের খাওয়ার আটা থাকত না।

এ ছাড়া নিত্যদিনের জিনিসপত্রেও কোনো ভারসাম্য ছিল না। কিছু জিনিস এতটাই বেশি বানানো হতো, যার ফলে তার কোনো চাহিদা থাকত না। অন্যদিকে অধিক চাহিদার জিনিসপত্র বাজারে পাওয়াই যেত না। টর্চ লাইটের ব্যাটারি পাওয়া যেত না; অথচ দামি স্যাম্পুর অভাব হতো না। এই সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টাই করা হয়নি; যার ফলে দামি জিনিস স্টোরে পড়ে থাকত, মার্কেটে তার কোনো মূল্য থাকত না। আফগান জিহাদের ফলে এই ব্যবস্থা আরও অধিক নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয় এবং রাশিয়ার বাণিজ্যের ওপর আঘাত পড়ে। যার ফলে রাশিয়ার কাছে যুদ্ধ তো দূরের বিষয়, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল না। রাশিয়ার মতো একই অবস্থা তার মিত্রদেরও হয়েছিল। তবে চীন এই সিস্টেমকে অনেক সতর্কতার সাথে পরিচালনা করেছিল; যার ফলে তাদের অবস্থা রাশিয়ার মতো হয়নি।

স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার রাজনৈতিক পলিসি

স্নায়ুযুদ্ধ ছিল আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ার ফলে পশ্চিমারা মুসলিম উম্মাহকে লুণ্ঠন করে শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে যেই উন্নতি লাভ করেছিল, তা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়। যা তাদের জন্য মেনে নেওয়ার মতো ব্যাপার ছিল না। অপরদিকে রাশিয়া পুরো ইউরোপ দখল করে নিয়েছিল। তৃতীয় দিকে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রেও কমিউনিজম বাস্তবায়ন করে ফেলেছিল। এই সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমেরিকা ইউরোপের সাথে মিলে সমাজতন্ত্রকে অবরুদ্ধ ও সীমাবদ্ধ করার এক সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে। এই কর্মপদ্ধতির প্রস্তুতকারক ছিল আমেরিকার সেই সময়ের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। ট্রুম্যানের পরের প্রেসিডেন্টরা এই ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করে। যাদের মধ্যে ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই কার্যপদ্ধতি ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক সর্বক্ষেত্রে। প্রত্যেক এলাকার জন্য আলাদা আলাদা কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আমেরিকা স্যাটো (SEATO)[৫২] নামে জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাথে একটি চুক্তি করে। দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে তারা সরাসরি বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। অপরদিকে ফিলিপাইন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াতে সেনাঘাঁটি তৈরির জন্য জায়গা নিয়ে নেয়। এ ছাড়াও যে রাষ্ট্রগুলো সামরিকভাবে দুর্বল, তাদেরকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সামরিক সাহায্য প্রেরণ করে।

---

৫২. (SEATO) South East Asia Treaty Organization

একই ধরনের দ্বিতীয় জোট ছিল স্যান্টো (CENTO)[৫৩] যাকে বাগদাদ প্যাক্ট বলা হয়। এই চুক্তিতে ইরাক, ইরান, তুর্কি ও পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চুক্তির অধীনে আমেরিকা পাকিস্তানকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম সারির মিত্র ঘোষণা দিয়ে সামরিক সাহায্য পাঠায়। পাকিস্তান নিজ দেশে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে ঘাঁটি তৈরির সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ইরাক বার্থ পার্টির বিপ্লবের পর এই চুক্তি থেকে বের হয়ে যায়। কয়েক বছর পরেই তুর্কি এবং ১৯৭৯ সালে শিয়া-বিপ্লবের পর ইরানও এই চুক্তি থেকে বের হয়ে যায়। শুধু প্রথম সারির গোলাম পাকিস্তানই বাকি রয়ে যায়, যে পরবর্তী সময়ে আফগানেও নিজ গোলামির দায়িত্ব আদায় করে।

সেই সময়ের তৃতীয় জোট ছিল ন্যাটো (NATO)[৫৪]। যেখানে আমেরিকাসহ সমস্ত ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি এমন একটি পরিপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সামরিক জোট ছিল, যার অধীনে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হওয়া ক্ষতি পূরণের জন্য মার্শেল প্ল্যানের[৫৫] ঘোষণা দেয়। এটাই ছিল ইউরোপকে নতুনভাবে গঠনের কার্যপদ্ধতি। এই পরিকল্পনার অধীনে ইউরোপের মধ্যে উন্নতির দ্বার খুলে যায়, যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: মার্কেট ইকোনমি (ইহুদিদের বৈশ্বিক শাসনের পূর্ণতা)

স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সফলতা ছিল পুরো দুনিয়াতে তাদের নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যাকে আজকের যুগে মার্কেট ইকোনমি বা বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি বলা হয়। এটা সেই সিস্টেম, যা এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিকরা পশ্চিমাদের দিয়েছিল এবং পশ্চিমে যার বাস্তবায়ন ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে শুরু হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই সিস্টেম সেই পদ্ধতি ও কাঠামোর ওপরেই রয়েছে, যা তা তৈরির সময় ছিল। সেই কোম্পানি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এডাম স্মিথের স্বাধীন অর্থনীতির স্লোগান ও মানুষের উন্নতির সবুজ বাগান এখনো আছে। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিস্টেম মূলত ইহুদি পুঁজিবাদীদের দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর বানানো এক সিস্টেম। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহুদিরা দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে বৈশ্বিক ব্যবস্থা বা গ্লোবালিজমের নতুন দর্শন জন্ম দেয়। পাশাপাশি পুরো বিশ্বকে এমন এক কন্ট্রোলিং সিস্টেমের গোলাম বানিয়ে দেয়, যার থেকে মুক্ত হওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পারস্পরিক মুখাপেক্ষী বানানোর ফলে অর্থনীতি একটি শক্তিশালী

৫৩. (CENTO) Central Treaty Organization
৫৪. (NATO) North Atlantic Treaty Organization
৫৫. এই পরিকল্পনাও প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের পলিসির অংশ ছিল। আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট জর্জ মার্শেল ১৯৪৭ সালে এই পরিকল্পনা উপস্থাপনা করে। এ জন্য একে মার্শেল প্ল্যান বলা হয়।

সামরিক অস্ত্রে পরিণত হয়। যদি কোনো জাতিকে পরাজিত করতে হয়, তখন তার ওপর শুধু অর্থনৈতিক অবরোধ বসিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কোনো সেনা আক্রমণ ছাড়াই অর্ধেকের বেশি বিজয় করা সম্ভব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ইউরোপ পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তখন তাদের দৃষ্টি ১৯৩৩ সালে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে আবিষ্কৃত তেলের খনির ওপর পড়ে। পশ্চিমাদের ইচ্ছা ছিল ইউরোপকে আবারও বিশাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের আবিষ্কৃত তেল দখল করে নেবে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য অগণিত নগদ পুঁজি দরকার ছিল, যা তাদের হাতে ছিল না। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে তাদের অর্থনীতির কোমর ভেঙে গিয়েছিল। ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রের হাতেই এতটুকু পুঁজি ছিল না, যার দ্বারা নিজেদের রাষ্ট্রকে দাঁড় করাতে পারবে। ইতিপূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন পুরো দুনিয়ার উন্নত রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ দেশে আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তখন ইউরোপ ১৯২৯ সালে কঠিন অর্থনৈতিক মন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেশনের শিকার হয়। পশ্চিমা স্বাধীন বাণিজ্যের থিউরি পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং অধিক উৎপাদনকারী উন্নত রাষ্ট্রগুলোর জন্য বৈশ্বিক বাণিজ্যের বাজারগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই অবস্থাতেও পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য উন্নতি করা ও বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের স্থান করে নেওয়া আবশ্যক ছিল।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৫ সালে আমেরিকার ব্রিটন উডসে একটি কনফারেন্স হয়। যেখানে সেই সময়ের অর্থনৈতিক সিস্টেমে বিশাল পরিবর্তনের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনা বাহ্যিকভাবে ক্ষতিহীন ও মানুষের জন্য লাভজনক মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে এটা ছিল পুরো দুনিয়াকে গোলাম বানানোর এক পরিকল্পনা। এই কনফারেন্সে শুধু উন্নত রাষ্ট্রগুলোকে ডাকা হয়। তারা সম্মিলিতভাবে যে সিস্টেম প্রণয়ন করে, তাকেই মার্কেট ইকোনমি বলা হয়। স্নায়ুযুদ্ধ রাশিয়ার আদর্শিক ও সামরিক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। সেই সাথে এই যুদ্ধ রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আমেরিকার বাজার-ভিত্তিক সিস্টেমের মাঝেও চলমান ছিল।

বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে পুনর্গঠন করা ও উন্নতির জন্য সীমাহীন পুঁজি ও মুক্ত বাণিজ্যিক বাজারের দরকার ছিল। ব্রিটন উডস কনফারেন্স মূলত এই দুটি সমস্যার সমাধানের জন্য হয়েছিল। এই কনফারেন্সে ডলারের সাথে স্বর্ণের সম্পর্ক ছাড়াই কারেন্সি তৈরি, ব্যাংক ও কোম্পানিগুলোকে নতুন বাজারের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত হয়। এখানে আমরা সেই কার্যক্রম ও তার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ আলোচনা করব।

ব্যাংক ও পেপার কারেন্সির পারস্পরিক সম্পর্ক

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে পুরো ইউরোপে স্বর্ণের দ্বারা ব্যাংকের কারেন্সির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারও কোনো দখল ছিল না। ১৮১২ সালেও ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রের কারেন্সি স্বর্ণ দ্বারাই পরিমাপ হতো; কিন্তু এই কাজের দায়িত্ব ব্যাংকের হাতে চলে যায়। ফলে ইহুদিদের বৈশ্বিক রাজত্বের স্বপ্ন বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য ছিল স্বর্ণ দ্বারা কারেন্সির মূল্য নির্ধারণের নীতি বাতিল করা। এই লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে প্রথমবারের মতো তারা আমেরিকাতে প্রাইজ বন্ড চালু করে। এর পরে ১৯১৩ সালে আমেরিকা ফ্রেডারেল রিজার্ভ নামে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যাংক ১৯৩৫ সালে বিশ্বের ৭০% স্বর্ণ ক্রয় করে নিজের কাছে জমা করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশির ভাগ সময়ে আমেরিকা নিষ্ক্রিয় ছিল, তারা বরং যুদ্ধকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান হিসেবে পেয়ে যায়। যুদ্ধ থেকে দূরে অনেকটা নিরাপদ থেকে ইউরোপে ব্যাপক মাত্রায় পণ্য সরবরাহ করে পুরো বিশ্বের কিয়দাংশ স্বর্ণের মজুদ গড়ে তোলে। অন্যদিকে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র ও পণ্যের জোগান দিতে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড লঙ্ঘন করে ব্যাপক পরিমাণে কারেন্সি তৈরি করে ফেলে। ফলে যুদ্ধের পর অন্যান্য কারেন্সিগুলোর বিপরীতে ডলারের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৫ সালে ব্রিটন উডস কনফারেন্সে বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে আলোচনা হয় যে, কেবল ডলারকে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত রেখে বাকি সকল কারেন্সিকে স্বর্ণের পরিবর্তে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ পূর্বের স্বর্ণ = ডলার; স্বর্ণ = ব্রিটিশ পাউন্ড; স্বর্ণ = জাপানিজ ইয়েন ইত্যাদি বাদ দিয়ে, স্বর্ণ = ডলার = পাউন্ড/ইয়েন/লিরা করে দেওয়া হবে। এটাকে 'ব্রিটন উডস সিস্টেম' বলা হয়। এই সিস্টেমের অধীনে আমেরিকা যেকোনো রাষ্ট্রের চাহিদার ভিত্তিতে ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে যখন ফ্রান্স সঞ্চিত ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণের দাবি করে, তখন আমেরিকা তাতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। যার ফলে 'ব্রিটন উডস সিস্টেম' বাতিল হয়ে যায় অথবা এটাকে জেনে বুঝে বাতিল করা হয়। ফলে এখন থেকে ডলারও আর স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। অতঃপর ১৯৭৯ সালে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেবল ডলারের মাধ্যমেই তেলের আমদানি-রপ্তানি হবে। ফলে ডলার পেট্রোডলারে পরিণত হয় এবং এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়িম হয়ে যায়। এরপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের কারেন্সির মূল্য ওপেন মার্কেটে বৈশ্বিক চাহিদা ও জোগানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। আর এভাবেই কারেন্সিকে এক কঠিন সিস্টেম (প্রাইজ ইন্ডেক্স)-এর অনুগত করে দেওয়া হয়, যার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তাদের নিজেদের হাতেই ছিল এবং থাকবে। আন্তর্জাতিক কারেন্সিকে স্বর্ণ থেকে আলাদা করা ছিল মানব ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এটা ছিল পশ্চিমা ও ইহুদিদের বৈশ্বিক ক্ষমতার পূর্ণতা। কারণ তখন যেহেতু কারেন্সিকে স্বর্ণ দ্বারা পরিমাপ করার ব্যাপারটি বাতিল করে দেওয়া হয়; ফলে তাদের কাছে এই অধিকার চলে আসে যে, তারা কোনো কাগজের টুকরোকে চাইলে ৫ হাজার লিখে দেবে আর চাইলে এক টাকা লিখে দেবে।

ব্যাংকের অংশিক তহবিল ব্যবস্থা চালু
(ফ্রাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং)

কারেন্সিকে স্বর্ণ থেকে আলাদা করার পরই মূলত ইহুদি ও পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। এই সিস্টেম পশ্চিমাদের জন্য অগণিত সম্পদ তৈরির সুযোগ করে দেয়। এখন আর স্বর্ণ কারেন্সি মূল্য নির্ধারণ করে না। কারণ পুরো বিশ্বেই ব্যাংকের এক নতুন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একটা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হবে নিজ রাষ্ট্রে কারেন্সির মূল্য নির্ধারণ ও কন্ট্রোল করা। এর অপর আরেকটি কাজ হবে অন্যান্য বৈশ্বিক ব্যাংকগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক নীতিমালার অধীনে সম্পর্ক রাখা। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকবে। এই সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হবে, যাতে তাদের ক্লায়েন্টদের সঞ্চিত অর্থের ডিপোজিটের ২০% সিকিউরিটি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। অবশিষ্ট ৮০% থেকে ২০% অর্থ-সঞ্চয়কারীদের দেওয়ার জন্য রেখে বাকি ৬০% অর্থ ব্যাংক তাদের নিজস্ব ব্যবসা বা ক্লায়েন্টকে লোন দেওয়ায় ব্যবহার করবে। সেই সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে অনুমতি দেয় যে, তারা সঞ্চিত সমস্ত অর্থের দশগুণ বেশি অর্থ ব্যবসা বা লোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। এটাকে অর্থ তৈরি (মানি ক্রিয়েশন) বলা হয় এবং ব্যাংকের এই সিস্টেমকে ফ্রাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং বলা হয়। আমরা এখানে এই কাজের বিস্তারিত আলোচনা করব না। এর জন্য এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় বইগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা এখানে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যক্তিগত ও বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। ব্যাংকের মানি ক্রিয়েশনের ফলে প্রথমত পুরো বিশ্বে অগণিত কারেন্সি তৈরি হয়ে যায়। যে সমস্ত কারেন্সি স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং শুধু কাগজের কিছু টুকরো, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের দস্তখত দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা তৈরির ফলে পুরো বিশ্বে বাহ্যিক উন্নতি দেখা যেতে শুরু করে। বিগত বিশ বছরে দুবাই, হংকং ও সিঙ্গাপুরের মতো শহর তৈরি হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিগত বিশ সালের ভেতর ব্যবসায়িক লোনের ব্যাপক সয়লাব ঘটায়। ফলে বর্তমানে সম্ভবত এমন কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তি, বাচ্চা বা যুবক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণের গোলাম নয়। অপরদিকে পশ্চিমাদের বৈশ্বিক কোম্পানিগুলো এই ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিয়ে পুরো বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদ দখল করে নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক কারেন্সিকে কন্ট্রোল করা

প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কারেন্সির মূল্যকে কীভাবে কন্ট্রোল করে? কারেন্সি দুটি মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয়; প্রথমটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মার্কেটে কারেন্সি কন্ট্রোল ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মার্কেটে কারেন্সি কন্ট্রোল। কারেন্সি কন্ট্রোলের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিক টাকা ছাপিয়ে মার্কেটে ছেড়ে দেয়, তখন কারেন্সির চাহিদা কমে যায় এবং এর মূল্য হ্রাস পেয়ে যায়। যার ফলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং অর্থ ব্যয়কারীর ক্রয়শক্তি কমে যায়। এটাকে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। এর বিপরীতে যখন মার্কেটে ছাপানো টাকার পরিমাণ কমে যায়, তখন কারেন্সির চাহিদা বেড়ে যায় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়। যার ফলে সম্পদের মালিকের ক্রয়শক্তি বেড়ে জিনিসপত্রের মূল্য কমে যায়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের কারেন্সি-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুটি মাধ্যমে কন্ট্রোল করে। প্রথমটি হচ্ছে সুদের পরিমাণ কম বা বেশি করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাইজ বন্ড কেনাবেচা করা। যদি মার্কেটে কারেন্সির মূল্যস্ফীতি হয়ে যায়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ বৃদ্ধি করে দেয়; যার ফলে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে টাকা মার্কেটের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভল্টেই রয়ে যায়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এই নীতি মানতে বাধ্য করে যে, তাদেরকে অবশ্যই জমানো টাকা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাইজ বন্ড কিনতে হবে; যার ফলে টাকাগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসে জমা হয়ে যায়। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখে যে, এখন মূল্যস্ফীতি ও কারেন্সির মূল্যের মধ্যে ভারসাম্য এসে গেছে, তখন তারা সুদের রেট কমিয়ে দেয় এবং প্রাইজ বন্ড ফিরিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে টাকা ছেড়ে দেয়। আর এই পদ্ধতিতে টাকা আবারও মার্কেটে যাওয়া শুরু হয়ে যায়।
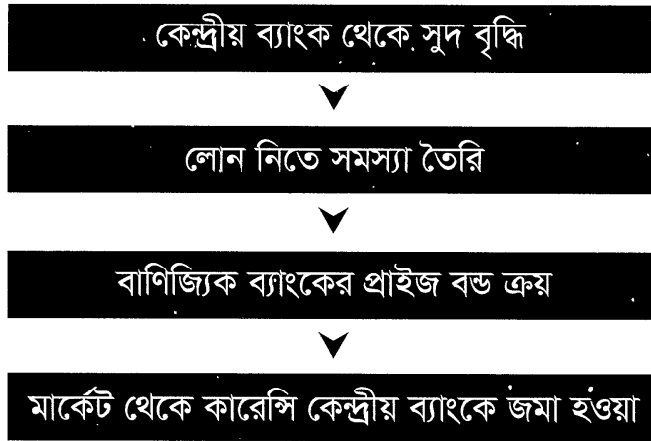
চিত্র ১ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে কারেন্সির মূল্য বৃদ্ধি
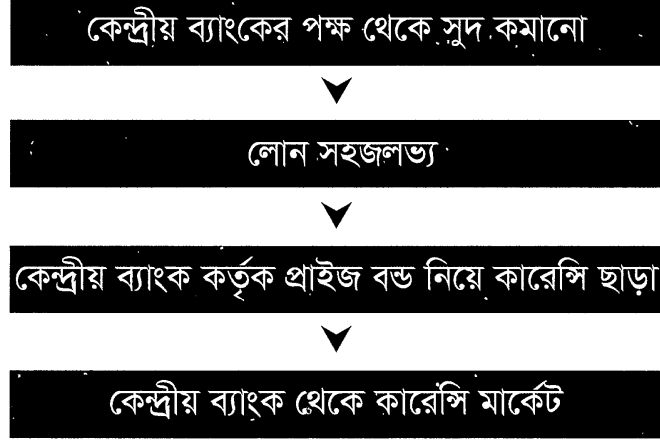
চিত্র ২ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে কারেন্সির মূল্য হ্রাস

সাধারণত আন্তর্জাতিকভাবে কারেন্সির মূল্য নির্ধারণ রাষ্ট্রের আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর পদ্ধতি হচ্ছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই জিনিসপত্র যেমন রপ্তানি করে, তেমন আমদানিও করে। দেখার বিষয় হচ্ছে, পুরো বছরে সামষ্টিকভাবে রাষ্ট্রের আমদানি বেশি নাকি রপ্তানি বেশি। অতঃপর প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা করে; যার ফলে এক রাষ্ট্রের কারেন্সি অপর রাষ্ট্রের কারেন্সি দ্বারা আদান-প্রদান হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবসার হিসাব সংগ্রহের পর সব রাষ্ট্রের কারেন্সিকে একে অপরের মোকাবিলায় মূল্যমান পরিমাপ করা জরুরি হয়ে যায়।

এই সমস্ত হিসাবের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালার অধীনের অনেক দুর্বোধ্য এক সিস্টেম প্রচলিত হয়। এই সিস্টেম কিছুটা এমন, পুরো দুনিয়ার ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন আমদানি-রপ্তানির জন্য একটি তালিকা করা হয়, যাকে 'ব্যবসার টুকরি বা গুডস বক্স' বলা হয়। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র কী পরিমাণ উৎপাদনশীল পণ্য রপ্তানির জন্য এই টুকরিতে রেখেছে এবং অন্য রাষ্ট্র থেকে আমদানির জন্য কতটুকু মাল এই টুকরি থেকে বের করেছে। যদি রাষ্ট্রের রপ্তানি আমদানির তুলনায় বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের কারেন্সির চাহিদা বেড়ে যায়; যার ফলে সে রাষ্ট্রের কারেন্সির মূল্যও বেড়ে যায়। যেমনটা আজকের ডলার, পাউন্ড ও ইউরোর অবস্থা।[৫৬]

৫৬. সাধারণত একটি কারেন্সির মূল্যমান নির্ধারিত হয় দুটি পদ্ধতিতে। প্রথমত, চাহিদার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনো কারেন্সির চাহিদা বেশি হলে সে কারেন্সির মূল্য বেশি হবে। যেমন আন্তর্জাতিক ট্রেডিংয়ের জন্য ডলারের চাহিদা অনেক বেশি; তাই ডলারের রেট বেশি। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কত পরিমাণ ডলার রিজার্ভ রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে উক্ত রাষ্ট্রের কারেন্সির রেট নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশে ফরেন রিজার্ভ বা ডলারের রিজার্ভ পাকিস্তানের চাইতে বেশি; তাই বাংলাদেশি টাকার এক্সচেঞ্জ রেট পাকিস্তানি রুপির চাইতে বেশি। রুপির চাইতে টাকা এখন দামি। আমদানির চাইতে পরিমাণ যত বেশি হবে, বৈদেশিক রিজার্ভ তত বেশি হবে। লেখক এখানে এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

সারকথা হলো, নতুন মার্কেট ইকোনমির অধীনে এই ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি একে অপরের প্রতি আবশ্যকীয়ভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। যার ফলে যদি কোনো ব্যক্তি দুর্গম অঞ্চলেও এক পয়সা ব্যাংকে রাখে, তাহলে এর একটা অংশ আবশ্যকীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যম হয়ে বিশ্ব ব্যাংকে যাবে। অপরদিকে ফ্রাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং এর কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত কারেন্সি দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। সর্বশেষ এই সিস্টেমগুলোর কারণে গরিব দেশগুলো উক্ত সিস্টেমের নিয়ন্ত্রকদের গোলামে পরিণত হয়। এভাবেই ইহুদিদের বৈশ্বিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খনি দখল করে দুনিয়াকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়।

বাজার-ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা

পুঁজি জমা ও কারেন্সি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল পুরো বিশ্বের বাণিজ্যকে কব্জা করা। আর এর জন্য আবশ্যক হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত যাতায়াত-পথ ও বাজার আয়ত্তে নেওয়া। এই লক্ষ্যে এডাম স্মিথের 'স্বাধীন বাণিজ্যের থিউরি'[৫৭]কে নতুন ব্যাখ্যাসহ পেশ করা হয়। এখন স্বাধীন অর্থনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত রাষ্ট্র থেকে তাদের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়া এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাজারে ব্যবসা করার জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে সুযোগ করে দেওয়া। এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, তার বিস্তারিত আলোচনা নিচে করা হচ্ছে :

প্রথম পদক্ষেপ : বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কন্ট্রোল করার জন্য 'গাট' (GATT)[৫৮] নামে একটি সংস্থা তৈরি করা হয়, যাকে ১৯৯৫ সালে (WTO)[৫৯] নাম দেওয়া হয়। প্রথমে সমস্ত রাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্য হয়ে এর প্রশাসনিক নীতিগুলো মেনে নেবে এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গঠন করবে। WTO তাদের ওপর আবশ্যক করে দেয় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের আঞ্চলিক বাজারে কিছু অর্থনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করবে বাণিজ্যিক ব্যাংক। যার উদ্দেশ্য সমাজের প্রত্যেক সদস্য ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে সেই ব্যবস্থার সাথে জুড়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত প্রতিষ্ঠা করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা সমস্ত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের মাঝে সম্পৃক্ত

---

৫৭. স্বাধীন বাণিজ্য কী? এই ব্যাপারে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। এটি একটি বাস্তবতা যে, আজ পশ্চিমারা যে স্বাধীন বাণিজ্যের কথা বলে এবং যার নামে তারা পুরো দুনিয়ার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা কখনোই সেই বাণিজ্য নয়, যার থিউরি এডাম স্মিথ পেশ করেছে। বরং পশ্চিমারা এডাম স্মিথের থিউরিকে ব্যবহার করেছে এবং নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে। ফল কী হলো? ظلمات بعضها فوق بعض (অবিচারের ওপর অবিচার)

৫৮. (GATT) General Agreement on Tariffs and Trade

৫৯. (WTO) World Trade Organization

করে এবং তাদের নির্দেশনা বাস্তবায়নের তদারকি করে। তৃতীয়ত প্রতিষ্ঠা করবে স্টক মার্কেট, এগুলো হচ্ছে এমন কোম্পানি, যা অন্যান্য বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর স্টক অর্থাৎ মালিকানার অংশ খরিদ করে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এই সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের মধ্যে বাজার-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির স্বাধীনতা

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির স্বাধীনতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, WTO-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের সমস্ত সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেবে এবং বাহিরাগত আমদানি ও বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর ওপর থেকে সমস্ত বাধ্যবাধকতা দূর করে দেবে। এই কাজকে তিনটি ধাপে সম্পাদন করা হয় :

প্রথম ধাপ : লিবারেলাইজেশন (Liberalization) অর্থাৎ ব্যবসাকে স্বাধীন করে দেওয়া।

দ্বিতীয় ধাপ : স্টেবিলাইজেশন (Stabilization) অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থনীতিকে স্থির করে দেওয়া হয়।

তৃতীয় ধাপ : প্রাইভেটাইজেশন (Privatization) অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করে দেওয়া।

- প্রথম ধাপ : লিবারেলাইজেশন (স্বাধীন বাণিজ্য)

এই ধাপে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হয়, যাতে তারা সেসব নীতি পরিবর্তন করে দেয়, যেগুলো মুক্ত বাণিজ্যের পথে বাধা। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র বহিরাগত আমদানি-রপ্তানির জন্য এবং রাষ্ট্রীয় উৎপাদিত পণ্যকে উন্নতি ও বিক্রি করার জন্য আমদানিকৃত বেসরকারী পণ্যের ওপর ট্যাক্স বসায়, যাকে কাস্টম ডিউটি বা ট্যারিফ বলা হয়। এ ছাড়াও প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের তৈরি পণ্যকে রপ্তানির জন্য ভূমি মালিক ও কারখানার মালিকদের সহায়তা দেয়; যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্যগুলোর মূল্য অন্যান্য রাষ্ট্রের পণ্যের মোকাবিলা করতে পারে। উদাহরণত, আমরা কখনো সরকারের পক্ষ থেকে তুলা থেকে তৈরি পণ্য ও রেশম থেকে তৈরি পণ্যের সাবসিডির (ভর্তুকি) ঘোষণা শুনি। সাবসিডি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতটুকু রেশম ও তুলা বাইরে রপ্তানি করা হবে, এর মূল্যের দশ বা বিশ শতাংশ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আদায় করবে। এটাকে সাবসিডি বলা হয়, যা লিবারেলাইজেশন বা স্বাধীন বাণিজ্যের পথে বাধা, যাকে দূর করা ব্যতীত স্বাধীন বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই লিবারেলাইজেশনের ধাপে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হয়; যাতে তারা ট্যারিফ বা সাবসিডিকে বিলুপ্ত করে দেয়।

এমন স্বাধীন বাণিজ্যের ফল শুধু বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর মালিক আটটি প্রধান রাষ্ট্রেরই ঘরে ওঠে। আর অন্য গরিব ও অনুৎপাদনশীল রাষ্ট্রগুলো ভয়াবহ গোলামিতে আটকে যায়। নিজেই নিজেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও বাকি রাষ্ট্রগুলোকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির চেষ্টাকারী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা ব্যক্তিরাই গত শতাব্দীতে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে হামলা করে তাদের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছিল। তাদের দখলকৃত সম্পদের দ্বারা নিজ দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটায় এবং বস্তুগত উন্নতিতে এতটাই আগে বেড়ে যায় যে, তাদের মোকাবিলা করা এখন তৃতীয় বিশ্বের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। সেই সাথে ট্যারিফ ও সাবসিডি ইত্যাদি দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো হয়তো বা কিছুটা হলেও এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এখন স্বাধীন অর্থনীতির চকচকে স্লোগানের ধোঁকায় ফেলে এটা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে বোঝা যায় যে, স্বাধীন বাণিজ্যের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রধান রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনভাবে অর্থ লুট করার বৈধতা দিয়ে দেওয়া।

স্বাধীন বাণিজ্যিক সিস্টেমের ফলে রাষ্ট্রগুলো নিজ দেশের বাণিজ্যের ওপরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এখন যে দেশ নিজের নাগরিক, শ্রমিক, কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ীদের কোনো উপযুক্ত লাভ এনে দিতে সক্ষম হয় না এবং যারা নিজ দেশে বহিরাগত কোম্পানির ব্যবসায় বাধ্যবাধকতা আরোপে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ যাদের ভেতরগত ও বহিরাগত মূল ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়, সেটাকে কি তখন স্বাধীন রাষ্ট্র বলার মতো সুযোগ থাকে? বর্তমানে এটা কোনো গোপন বা ছোট বিষয় নয়; বরং এর বাস্তবতা প্রতিদিন আমাদের জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৬০]

- দ্বিতীয় ধাপ : স্টেবিলাইজেশন বা অর্থনীতি স্থির করা

স্বাধীন বাণিজ্যের নীতিমালা বাস্তবায়নের পর দেশীয় অর্থনীতিতে কঠিন এক ধাক্কা লাগে। কেননা, রাষ্ট্রের লাভজনক শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিকে তার থেকে কয়েক গুণ বড় নির্দয় ও হিংস্র আকৃতির আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্যের মোকাবিলায় ময়দানে আসতে হয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি কঠিন অস্থিরতার শিকার হয়। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো দেশীয় অর্থনীতিকে ধ্বংসের মূল ভূমিকা পালন করে, তারা এখন দয়ালুবেশে লোন দিতে থাকে। যাতে তাদের কথামতো অর্থনীতিকে চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এটাও নেক সুরতে ধোঁকার মতোই। এটাকে বাহ্যিকভাবে বলা তো হয় অর্থনীতিতে স্থিরতা তৈরি করা; কিন্তু এই বিশাল ভারী সুদ ও দীর্ঘমেয়াদি লোনের মাধ্যমে মূলত গোলামির শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়।

---

৬০. ২০০৮ সালে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মন্দা এর চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত।

• তৃতীয় ধাপ : প্রাইভেটাইজেশন (ব্যক্তি মালিকানাধীন-করণ)

{বহিরাগত (বৈদেশিক) বিনিয়োগের মাধ্যমে} অর্থনীতিকে স্থির করার ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি যখন সমস্যায় পতিত হতে থাকে, তখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিক্রির পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশীয় উৎপাদন, কৃষি ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর শেয়ারকে ভাগ করে বিশ্বের বাজারে শেয়ারে বিক্রির জন্য পেশ করা। এর জন্য এই বাহানা তৈরি করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের অধীনে থাকার কারণেই অর্থনীতিতে নড়বড়ে অবস্থা ও পেশাদারিত্বে গাফিলতির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে এর লাভ বৃদ্ধির পরিবর্তে উলটো তা রাষ্ট্রের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু রাষ্ট্র নিজেই অন্যান্য অনেক সমস্যায় জর্জরিত, তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এ ছাড়া এই কাজ সরকারের দায়িত্বের মধ্যেও নয়। দ্বিতীয়ত, সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক কাজ করা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু শেয়ার অন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রির ফলে দেশের মধ্যে অর্থ পরিবর্তনের জন্য অপর দেশ থেকে রেমিটেন্স আসবে এবং রোজগার করা সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো প্রশাসনকে ঘুষ দিয়ে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোই শুধু প্রাইভেট করে নেয়। শুধু এতটুকুই নয়, প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ শেয়ার আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং এটাও তার আসল মূল্য থেকে অনেক কম দামে। এভাবেই ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পর লাভজনক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও আন্তর্জাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং দেশ পূর্ণভাবে গোলাম বনে যায়।

ব্রিটন উডস কনফারেন্সের বৈশ্বিক সংস্থা

লিবারেলাইজেশন বা স্বাধীন বাণিজ্য, স্টেবিলাইজেশন বা অর্থনীতিকে স্থির করা ও প্রাইভেটাইজেশন বা ব্যক্তি মালিকানাধীন করার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটন উডস কনফারেন্সে তিনটি সংস্থা দাঁড় করানো হয়। প্রথমটি 'গিট' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯৯৫ সালে WTO-তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এদের কাজ বিশ্বের সমস্ত বাণিজ্যকে স্বাধীন করা অর্থাৎ ট্যারিফ ও সাবসিডি বিলুপ্ত করা এবং লাইসেন্স, মানদণ্ড ইত্যাদির আইন প্রণয়ন করা, যার মাধ্যমে—তাদের পরিভাষা অনুযায়ী—ব্যবসা স্বাধীন হিসেবে থাকবে।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফান্ড (IMF)[৬১]। এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও কারেন্সির আদান-প্রদানের রেট কন্ট্রোল করা। এ ছাড়া এই সংস্থা গরিব রাষ্ট্রের

৬১. International monetary fund

বাজারগুলো স্বাধীন করার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করে। যে সমস্ত রাষ্ট্র কালো বাজারির শিকার অথবা যাদের শিল্পোন্নতি বা জাতীয় প্রয়োজন পূরণের পুঁজি দরকার হয়, তাদেরকে এই সংস্থা বিভিন্ন শর্তে লোন হিসেবে পুঁজি দেয়।

তৃতীয় প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। এর কাজ হলো, গরিব দেশগুলোর অর্থনীতিকে স্থির এবং প্রাইভেট করার জন্য লোন দেওয়া।

আর এভাবেই ব্রিটেন উডসের তিন প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে অর্থনীতির পুরো সিস্টেমকে কন্ট্রোল করে। আজকে পুরো বিশ্বের অর্থনীতিকে এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমা ক্রুসেড-ইহুদি জোট পরিচালনা করে থাকে।

স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার সামরিক নীতি ও আমেরিকান বাহিনীর নতুন গঠন

আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি যে, স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার কার্যপদ্ধতি ছিল সমাজতন্ত্রকে বাধা দেওয়া ও সীমাবদ্ধ করে ফেলা। একদিকে তারা নিজেদের অনুগত রাষ্ট্রগুলোকে যুদ্ধে সক্ষম বানানোর জন্য অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাঠাত এবং অপরদিকে তারা নিজেদের সামরিক শক্তিকে বিভিন্ন মাধ্যমে পূর্ণভাবে সংগঠিত করা শুরু করে। বিশ্বের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোনো বাহিনীকে এভাবে সংগঠিত করা হয়নি।

আমেরিকার বাহিনীকে তিনটি লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয় :

- প্রথম লক্ষ্য, কোনো শত্রু যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণের ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে তা বাস্তবায়নে সক্ষম হিসেবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং শত্রুকে পূর্ণভাবে অক্ষম করে দিতে হবে। এটাকে দূরদর্শিতার থিউরি বলা হয়।

- দ্বিতীয় লক্ষ্য, যদি কোনো শত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে সেই শত্রুকে এই কথা বিশ্বাস করাতে হবে যে, এই আক্রমণের দ্বারা তার ফায়দার তুলনায় ক্ষতিই বেশি হবে। এটাকে ভয়ের থিউরি বলা হয়।

- তৃতীয় লক্ষ্য, যদি এই দুই কৌশল প্রয়োগ সত্ত্বেও শত্রু যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়, তাহলে তার সাথে সীমাবদ্ধ পরিসরে যুদ্ধ করা হবে। এটাকে সীমাবদ্ধ যুদ্ধের থিউরি বলা হয়।

এই তিনটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমেরিকার বাহিনীকে গঠন করা হয়। আমেরিকার বাহিনীর নতুন এই গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক থিউরির ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. 'মাহান' (Alfred Thayer Mahan)-এর সমুদ্র-শক্তি (Sea power) থিউরি।

২. 'লিডল হার্ট' (Henry Liddell Hart)-এর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ (Indirect Approach) থিউরি।

৩. 'আন্দ্রে বিউফার' (Andre Beaufre)-এর আনবিক যুগের পরোক্ষ কর্মপদ্ধতির (Indirect Strategy) থিউরি।

মাহানের থিউরি

আমেরিকার সামুদ্রিক ভাইস এডমিরাল মাহান Mahan রিটায়ার্ড হওয়ার পর ১৮৯০ সালে নিজের প্রসিদ্ধ বই 'মানব ইতিহাসে সামুদ্রিক শক্তির প্রভাব' (The Influence of sea power upon History) লিখে। যার ফলে সে এক ঐতিহাসিক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বই আমেরিকার প্রশাসনের কার্যপদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে। এমনকি সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt) তার পূর্ণ লক্ষ্য সামুদ্রিক শক্তি অর্জনে নিবদ্ধ করে ফেলেছিল।

Race to the Swift বইয়ে আধুনিক যুগের সমরবিদ রিচার্ড লিখেছে, যত সামরিক থিউরি আজ পর্যন্ত পেশ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটার কোনো না কোনো সীমা ছিল; কিন্তু মাহানের থিউরির কোনো সীমা নেই।

অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক

মাহান তার বইয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে যে, সামরিক শক্তি ব্যতীত অর্থনীতি শক্তিশালী করা সম্ভব নয় এবং অর্থনীতি ব্যতীত সামরিক শক্তি অর্জনও সম্ভব নয়। কেমন যেন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একে অপরের সাথে খুব গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দাবিকে সে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করে।

সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের (সি পাওয়ার) থিউরি

সে আরও বলে, আন্তর্জাতিক সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য সমুদ্রের মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। এই জন্য সমুদ্রের ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয় অর্জন করা জরুরি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরাশক্তি বা সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য বৈশ্বিক বাণিজ্যের সামুদ্রিক পথগুলোর ওপর সি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। ইতিহাস ও ভূগোলের সাহায্যে মাহান প্রমাণ করে যে, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে অবস্থিত, যেখান থেকে পুরো দুনিয়াতে বাণিজ্যিক পণ্য আসা-যাওয়া করে। এগুলোকে দখলের ফলে বিশ্ববাণিজ্য আমেরিকার হাতে চলে আসবে। তাই আমেরিকার জন্য আবশ্যক হলো, যেকোনো মূল্যে এই বন্দরগুলোতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, সেখানে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোকে সে (Strategic Points)[৬২] 'কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান' হিসেবে চিহ্নিত করে। মাহানের থিউরি অনুযায়ী সেই স্থানগুলো নির্বাচন করা উচিত, যা বড় সমুদ্রের পরিবর্তে ছোট সমুদ্রে অবস্থিত। যেগুলোর নিকটে বাণিজ্যিক পথ রয়েছে এবং সেটা ভৌগলিক দিক থেকে এমন

---

৬২. স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য এমন স্থান যেগুলো যুদ্ধের কার্যক্রমের দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ও ফলদায়ক গুরুত্ব রাখে।

কৌশলগত স্থান, যেখান থেকে অন্যদের ওপর হামলা করা যাবে এবং অন্যদের হামলার মোকাবিলায় নিজের প্রতিরক্ষা করা যাবে। সে তার বইয়ে আমেরিকার প্রশাসনকে পরামর্শ দেয়, যাতে এই কার্যপদ্ধতি আমেরিকার সাথে সংযুক্ত সমুদ্রে এখন থেকেই বাস্তবায়ন শুরু করে। বর্তমান আমেরিকার সামুদ্রিক বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলগুলোর ওপর তাদের উপস্থিতি দেখে আমেরিকার রাজনীতিতে এই থিউরির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে যায়।

লিডল হার্টের (পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ) থিউরি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক টেকনোলজিতে হঠাৎ অনেক উন্নতি হয়। ফলে খুবই ধ্বংসাত্মক ধরনের হাতিয়ার তৈরি হতে থাকে। কিন্তু বাহিনীকে এই নতুন টেকনোলজির জন্য উপযোগী করে নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে Attrition Warfac 'ধ্বংসযজ্ঞের যুদ্ধ-কৌশল'-এর আবিষ্কার হয়। এটা ছিল সেই পদ্ধতির যুদ্ধ, যেখানে আক্রমণের মৌলিক লক্ষ্য হতো, শত্রুকে এত বেশি ক্ষতি করা; যাতে তাদের বস্তুগত শক্তি পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং যুদ্ধের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এখানে বস্তুগত শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য সেনা, শিল্প, সামরিক শক্তি এবং সব সম্পদ ও রসদ। এই যুদ্ধ-কৌশলে শত্রু বাহিনীর সমস্ত সরঞ্জাম, নাগরিক আবাদি, কারখানা, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রকে অধিক থেকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়।[৬৩] এই পদ্ধতিতে দুই পক্ষই অকল্পনীয় ধ্বংস ও ক্ষতির শিকার হয় এবং বিজয় তখনই অর্জিত হয়, যখন শত্রু নিজ নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও অস্তিত্ব টিকানোর জন্য পরাজয় স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এই যুদ্ধের কৌশলকে সামরিক পরিভাষায় লক্ষ্যহীন কসাইখানা বলা হয়। কেননা, যেসব সামরিক লক্ষ্য অনেক কম ধ্বংসের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব, এই পদ্ধতিতে তা অনেক বেশি ধ্বংসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাস্তবেই এই কসাইখানা দেখা যায়, কারণ এখানে ইউরোপের বিভিন্ন কাফির জাতি একে অপরের ওপর পাগলের মতো হামলা করে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং অসংখ্য মানুষকে হত্যা ও আহত করে।

এই যুদ্ধের ভয়ানক ফলাফলকে সামনে রেখে অনেক সমরবিদরা নতুন সামরিক থিউরি পেশ করে, যাকে (Maneuver Warfare) 'কৌশলের যুদ্ধপদ্ধতি' বলা হয়। এখানে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ছিল সমরবিদ লিডল হার্টের পরোক্ষ কর্তৃত্বের (Indirect Approach) থিউরি।

---

৬৩. আমরা এখানে কাফিরদের যুদ্ধ থিউরি এবং পদ্ধতিগুলো বোঝার চেষ্টা করছি; যাতে এটা বুঝে তাদের সর্বোত্তমভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হই। তবে আমরা নিজেরা যুদ্ধের জন্য যেই কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করব, তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে শরিয়ার দিকে ফিরে যেতে হবে এবং জায়িজ লক্ষ্য ও নাজায়িজ লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

তার থিউরির ব্যাখ্যা হচ্ছে :

শত্রুকে সরাসরি মোকাবিলার পরিবর্তে তার দুর্বল অংশে নিজের শক্তিশালী অংশ দ্বারা হামলা করতে হবে। যাতে শত্রু তার আপন অবস্থান থেকে হেলে (dislocate) যায়। আর এর ফলে তার লড়াইয়ের ইচ্ছাও (Will to Fight) নষ্ট হয়ে যাবে। এর সহজ একটি উদাহরণ হচ্ছে, সিংহ ষাড়ের শিঙে আঘাতের পরিবর্তে শক্তিশালী থাবার মাধ্যমে তার গর্দান নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেয়; ফলে ষাড় স্থির থাকতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। আর তখন সে তার শিং বা পা কোনোটিই ব্যবহার করতে পারে না। তেমনিভাবে শত্রুর সামনে এসে (Direct) হামলার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে (Indirectly) বা পার্শ্ব ঘুরে হামলা করার ফলে কম সময় ও কম শক্তি দ্বারা যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়।

শত্রুকে (Dislocation) নড়বড়ে করার পদ্ধতি

লিডল হার্ট তার থিউরিতে বলেছে যে, শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছাকে নিঃশেষ করার জন্য বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক দুই ক্ষেত্রেই লড়াই করা আবশ্যক। আর তা চার পদ্ধতিতে সম্ভব :

- যুদ্ধক্ষেত্রকে পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা।
- শত্রুর শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া।
- তার রসদের জোগান কেটে দেওয়া।
- তাদের ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া।

এই চার ধরনের হামলা পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়, যার উদ্দেশ্য শত্রুকে সরাসরি হামলা করে ধ্বংসের পরিবর্তে তার স্বাধীনভাবে কাজের সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া (Restriction of Freedom of Action)। যেখানে আপনি আপনার সামনের সমস্ত দরজা খোলা রাখতে পারবেন। আর তখন শত্রুর নেতাদের ওপর কঠিন মানসিক ধাক্কা লাগবে। তারা মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে অনেক বেশি বস্তুগত শক্তি থাকার পরেও শত্রু নড়বড়ে হয়ে যাবে। এতে বড় থেকে বড় শত্রুকে সহজেই কাবু করা সম্ভব হবে। এই থিউরি পশ্চিমাদের কাছে অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই থিউরি ছিল একটি সামরিক থিউরি, যার প্রভাব শুধুই সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

আন্দ্রে বিউফারের আনবিক যুগের পরোক্ষ কর্তৃত্বের থিউরি

আন্দ্রে বিউফার একজন ফরাসি জেনারেল ছিল। সে ন্যাটো গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই ছিল ওই ব্যক্তি, যে ১৯৫৫ সালে আল-জাজায়িরের যুদ্ধ ও ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল যুদ্ধে তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৯৬৩ সালে সে পরমাণু যুগের পরোক্ষ কর্মপদ্ধতি বা ইন্ডাইরেক্ট স্ট্রেটেজির থিউরি পেশ করে। যাকে সমরবিদ লিডল হার্ট আধুনিক যুগের সবচেয়ে উন্নত থিউরি ঘোষণা দিয়েছিল। বিউফারের দাবি অনুযায়ী তার থিউরি মাহান ও লিডল হার্টের থিউরি থেকে মিশ্রভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। সে এই দুই থিউরির ভালো বিষয়গুলো স্বীকার করে সেগুলোকে সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে শক্তির সবগুলো ক্ষেত্রে একই সাথে প্রয়োগ করে।

বিউফার ও লিডল হার্টের থিউরির মাঝে পার্থক্য

বিউফার নিজেই তার থিউরি ও লিডল হার্টের পরোক্ষ কন্ট্রোলের থিউরির পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলে যে, লিডল হার্টের থিউরি শুধু সামরিক দিক এবং বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ও ম্যানুয়েভার ওয়্যারফায়ারে সীমাবদ্ধ ছিল। বিউফার লিডল হার্টের থিউরি থেকে শত্রুর স্বাধীন চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। অতঃপর এটাকে আরও বিস্তৃত করে মাহানের সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের থিউরির সাথে মিলিয়ে দেয়। যার ফলে পুরো বিশ্বকে অবরোধ করার এক পরিপূর্ণ থিউরি তৈরি হয়। সে এটাও স্পষ্ট করে যে, যদি এই থিউরির ওপর কাজ করা হয়, তাহলে পরমাণু-যুদ্ধের আশঙ্কা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।

বিউফারের এই থিউরিকে পরোক্ষ বলার কারণ হলো, এখানে পরস্পরে সরাসরি লড়াই হয় না। এই থিউরি অনুযায়ী শত্রুর ওপর তিন ধরনের অবরোধ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে দুটি শত্রুর এলাকার বাইরে এবং তৃতীয়টি শত্রুর এলাকার ভেতরে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগানো হবে। কারণ শত্রু মূলত বহিরাগত দুই অবরোধের মাধ্যমেই পরাজিত হয়ে যায়।

বিউফারের থিউরির গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- সে দূরদর্শী পদ্ধতিতে যুদ্ধকে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ সে বিপদ আসার পূর্বেই তার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করার দাবিদার।
- বিউফারের কথা অনুযায়ী যদি সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর অবরোধ দিয়ে তাদের কার্যক্রমের সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে দুনিয়ার বড় শক্তিগুলোর কোনো বিপদ থাকবে না।

● অপরের কাজের সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার ফলে বড় শক্তিগুলো নির্দিষ্ট শক্তিকে সীমাবদ্ধ ভৌগলিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে নিজেদের বিশাল লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বিউফারের থিউরির বাস্তবায়ন

বিউফার নিজ থিউরির বাস্তবায়নের ব্যাপারে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছে। সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. প্রথমত, বৈশ্বিকভাবে সামরিক ভীতি সৃষ্টিকারী একটি শক্তি থাকা চাই, যারা সর্বদা শত্রুর ওপর মানসিক চাপ দিতে থাকবে। এই শক্তিতে পরমাণু ও অ-পরমাণু অস্ত্র উভয়টা থাকা আবশ্যক। এটাকে সে নাম দিয়েছে 'সামরিক ভীতি সৃষ্টিকারী বৈশ্বিক শক্তি' (Millitary Deterrent Force)। অর্থাৎ শত্রুকে যেকোনো মাধ্যমেই হোক বাধা দিয়ে রাখতে হবে। এমনটা তখনই হওয়া সম্ভব, যখন শত্রুকে এই বিশ্বাস করানো যাবে যে, যদি সে কোনো নিরাপত্তা ভেঙে কোনো প্রকার আক্রমণের পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তার জবাবে তাকে কয়েক গুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এই সামরিক শক্তিতে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও সাধারণ উভয় প্রকারের সেনা থাকবে। নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থায় আমেরিকা এই শক্তিকে নিজ বাহিনীর পাশাপাশি ন্যাটো ও জাতিসংঘের বাহিনীকেও মিলিত করে গঠন করেছে। যার ফলে এই সামরিক অবরোধ বৈশ্বিক আকৃতি ধারণ করে।

   এই শক্তির লক্ষ্য শত্রুর আক্রমণের সক্ষমতাকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা, যেভাবে লিলিপুটরা গেলিভারকে বেঁধেছিল। লিলিপুট ও গেলিভার হচ্ছে পশ্চিমা সাহিত্যে বাচ্চাদের একটি কাল্পনিক কাহিনি। যেখানে গেলিভার এমন এক দ্বীপে যায়, যেখানের বাসিন্দারা ছিল তার আঙুল থেকেও ছোট। গেলিভার যখন ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, তখন আঙুলের সমান লিলিপুটরা শক্ত রশির মাধ্যমে তার শরীর কঠিনভাবে মাটির সাথে বেঁধে ফেলে। ফলে সে জেগে ওঠার পর কোনোভাবেই নড়াচড়া করতে পারছিল না। তেমনিভাবে এই বাহিনীও শত্রুর ওপর বহিরাগত অবরোধ সৃষ্টি করে এবং এই অবরোধ মাহানের সামুদ্রিক কন্ট্রোল থিউরির মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি পায়।

২. এই বৈশ্বিক অবরোধের সীমার ভেতরে আরও একটি বেসামরিক অবরোধ প্রতিষ্ঠা করা। যদিও এই অবরোধটি বেসামরিক; কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন। এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রকে শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছা দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই অবরোধকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, এনজিও, প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি, ইউএনও এবং গোপন সংস্থা ইত্যাদি সাহায্য করে থাকে। এই অবরোধের পরিব্যাপ্তি আঞ্চলিক হয়ে থাকে।

বিউফারের মতে, যদি ভীত রাখা ও বহিরাগত সামরিক অবরোধের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ অবরোধের মধ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে শত্রুর যুদ্ধের চিন্তাকে ভুল ও ভ্রান্ত সাব্যস্ত করা যায় এবং তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছা এতটাই দুর্বল হয়ে যাবে, যার ফলে সে লড়াই করার চিন্তাও করতে পারবে না।

৩. এত কিছুর পরেও যদি শত্রু যুদ্ধে নেমে আসে, তাহলেও পূর্বের দুই অবরোধের ফলে তার যুদ্ধের সীমা বিশেষ ভৌগলিক অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এর ভেতরেই সীমাবদ্ধ যুদ্ধ চালাবে। তৃতীয়ত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অবরোধ, যা শত্রুর রাষ্ট্রের ভেতর বা কোনো একটা অংশের ওপর হয়ে থাকে। এই লড়াই কৌশলের যুদ্ধপদ্ধতির অধীনে করা হয়, যেখানে বাহ্যিক শক্তি, মানসিক শক্তি ও সময় ব্যবহার হয়ে থাকে। যদি বস্তুগত শক্তি ব্যবহার সহজ হয়, তাহলে মানসিক চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং শত্রুকে কম থেকে কম সময়ে বস্তুগত শক্তি দ্বারাই পরাজিত করা সম্ভব হবে। আর যদি বাহ্যিক শক্তি কম হয়, তাহলে বাহ্যিক ও মানসিক শক্তিকে বারবার ব্যবহার করে শত্রুকে পরাজিত করা হবে। কৌশলের জন্য সে দুটি পদ্ধতি প্রণয়ন করে :

ক. প্রথম পদ্ধতিকে Piecemeal maneuver বলা হয়, অর্থাৎ স্তর-ভিত্তিক কৌশলের যুদ্ধ। এখানে কৌশলের যুদ্ধপদ্ধতির সমস্ত কৌশল প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করে শত্রুকে ধীরে ধীরে পরাজিত করা হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে একটি সীমার ভেতর বিজয় অর্জনের ওপর বিউফার এ জন্য জোর দিয়েছে; যাতে যুদ্ধ তার বিশেষ ভৌগলিক এলাকা থেকে বের হয়ে গ্লোবাল হয়ে না যায়।

খ. শক্তি কম থাকা অবস্থায় তার মত হচ্ছে, মাওসেতুং এর গেরিলা যুদ্ধের থিউরি গ্রহণ করা উচিত। যেখানে আঞ্চলিক গেরিলাশক্তিকে যুদ্ধে এনে দাঁড় করাতে হবে এবং সকল স্থানে মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক যুদ্ধকে চলমান রাখতে হবে।

তিন অবরোধ

বিউফারের থিউরিকে বাস্তবায়নের ফলে শত্রুর ওপর তিনটি অবরোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার ফলে তাদের স্বাধীনভাবে কাজের ক্ষমতা এতটাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা তখন হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হয়। বিউফারের থিউরি অনুযায়ী মূল যুদ্ধ বহিরাগত দুই অবরোধের মাধ্যমে করা হবে, যেখানে তৃতীয় অবরোধকে শুধু প্রয়োজনের সময় ও প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করা হবে।

বিউফারের থিউরি অনুযায়ী যদি পশ্চিমা শক্তিগুলো নিচে বর্ণিত তিনটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত রাখে, তাহলে অন্য কোনো শক্তির পক্ষে পশ্চিমাদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণকে ভেঙে দেওয়া অসম্ভব হবে :

- প্রথমত, পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি ও উন্নত হওয়ার কথা এমনভাবে প্রচার করতে হবে; যাতে পুরো বিশ্বের মানুষ এই বিশ্বাস করে নেয় যে, পশ্চিমা ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি বিশ্বকে ঠিকভাবে চালাতে সক্ষম নয়; ফলে সবাই তা গ্রহণ করে নেবে। সেই সাথে উন্নতি ও আধুনিকতার এই প্রভাবকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে স্থানান্তরিত করাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- দ্বিতীয়ত, শত্রুর পক্ষ থেকে সমস্ত সম্ভাব্য বিপদগুলোকে ধারাবাহিক নিশানা বানিয়ে শেষ করে দিতে হবে।
- তৃতীয়ত, বহিরাগত ভীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার শক্তিকে একত্রিত করে সর্বোচ্চ শক্তিশালী করতে হবে, অর্থাৎ আমেরিকার বাহিনীর সাথে ন্যাটো ও জাতিসংঘের বাহিনীকে একত্রিত করে কাজ করবে। এবং তারা ছাড়াও সামষ্টিক আন্তর্জাতিক জোট তৈরি করা হবে।

ফলে এই কার্যক্রমকে পরাজিত করা বিউফারের মতে অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেননা তার মতে, এই কার্যক্রমের ফলে সমস্ত বিশ্বে এবং বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে—যাদের উদাহরণ সে অনেক জায়গায় দিয়েছে—এত পরিমাণ ভয় ছড়িয়ে পড়বে যে, কোনো উল্লেখযোগ্য শক্তি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে না মাথা উঠাতে সক্ষম হবে, আর না মাথা ওঠানোর দুঃসাহস করবে।

সারকথা : ইউরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধপদ্ধতি

মাহান ১৮৯০ সালে যখন তার সমুদ্র কন্ট্রোলের থিউরি পেশ করে, তখন আমেরিকা সুপার পাওয়ার ছিল না; বরং একটি সাধারণ শক্তি হিসেবে উন্নতি করে যাচ্ছিল। তখন তাদের বাণিজ্যকে আরও অধিক বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর ও সমুদ্র দখল করা আবশ্যক ছিল। এটা ছিল সে সময়, যখন ভূমধ্য সাগরের রাস্তা উসমানিদের হাত থেকে ছুটে ব্রিটেনের দখলে এসে গিয়েছিল। অপরদিকে লিডল হার্ট তার থিউরি সেই সময় পেশ করে, যখন শিল্প-বিপ্লবের নতুন হাতিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেনারা অক্ষম ছিল। বিউফারের থিউরি সেই সময় আসে, যখন ইউরোপ ও আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোল্ড ওয়ারে ব্যস্ত ছিল। মাহান থেকে বিউফার পর্যন্ত ৬০ বছরের মধ্যে আমেরিকা এই থিউরিগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের ৪৫ বছরে আমেরিকা নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই তিনটি থিউরি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে।

যদি ওপরে বর্ণিত এই তিনটি থিউরি নিয়ে খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে এই থিউরি থেকে কিছু মৌলিক বিষয় দৃষ্টিগোচর হবে। এই তিনটি থিউরি শত্রুর যুদ্ধের সক্ষমতাকে নিঃশেষ করার জন্য পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধ যুদ্ধের মাধ্যমে নিজ লক্ষ্য অর্জনের ওপর জোর দিয়ে থাকে। এই তিনটি থিউরিই এই কথার ওপর একমত যে, শত্রুর

যুদ্ধের ইচ্ছাকে নিঃশেষ করার পদ্ধতি তার আক্রমণের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাই মাহান সমুদ্রে দখল প্রতিষ্ঠাকে জোর দিয়েছে এবং শত্রুর ওপর এমন অবরোধ তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যা পুরো দুনিয়ার সমস্ত শত্রুকে আমেরিকা বা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে।

লিডল হার্ট সরাসরি যুদ্ধের পরিবর্তে পরোক্ষ পদ্ধতিকে গ্রহণের কথা বলেছে। বিউফার প্রথম দুই থিউরিকে একত্র করার সাথে সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকেও মিলিয়ে দিয়েছে এবং অর্থনীতিকে একটি সামরিক অস্ত্রে পরিণত করেছে। সেই সাথে সে পুরো বিশ্বের ওপর তিনটি অবরোধ প্রতিষ্ঠার থিউরি পেশ করে। এই তিনটি থিউরি স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার বাহিনীকে নতুন গঠন ও রাশিয়ার কার্যক্রমকে রুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এখন আমরা আলোচনা করব, এই থিউরিগুলো মুতাবিক আমেরিকা নিজ বাহিনীকে কীভাবে সজ্জিত করেছে।

আমেরিকান বাহিনীর গঠন

আমেরিকান বাহিনীকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে, যাতে এদের মধ্যে তিনটি স্তরের যুদ্ধের সক্ষমতা তৈরি হয়, যা মাহান, লিডল হার্ট ও বিউফারের থিউরিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দূরদর্শিতা, ভীতি সৃষ্টি করা এবং শত্রুকে প্রকম্পিত করে শত্রুর যুদ্ধের সক্ষমতাকে নিঃশেষ করে যুদ্ধের ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া। আমেরিকান বাহিনীকে দুটি অংশে গঠন করা হয়েছে, একটি সাধারণ বাহিনী ও অপরটি জোটবদ্ধ কমান্ড (Unified Combatant Command)।

আমেরিকার সাধারণ বাহিনী

আমেরিকার সাধারণ বাহিনীকে অন্য সমস্ত সাধারণ বাহিনীর মতোই গঠন করা হয়েছে। এই গঠনের উপকারিতা হচ্ছে, যখন কোনো সেনা আমেরিকান বাহিনীতে ভর্তি হয়, তখন সে সাধারণ সেনাদের যেকোনো অংশে ভর্তি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সিপাহি বিমান-বাহিনীতে ভর্তি হয়, তাহলে সে বিমান-বাহিনীর সদস্য হিসেবে থাকবে এবং তার বেতন বিমান-বাহিনীর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু সে যেকোনো যৌথ কমান্ডের অধীনে ডিউটি করতে পারবে।

সাধারণ আমেরিকান বাহিনীকে পাঁচটি বড় অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের আলাদা লক্ষ্য রয়েছে, যা আমরা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করছি :

১. আমেরিকার স্থল-বাহিনী

২. আমেরিকার বিমান-বাহিনী

৩. আমেরিকার নৌ-বাহিনী

৪. আমেরিকান মেরিন ফোর্স (US Marine)

৫. আমেরিকান কোস্টগার্ড (US Coast Guard)

আমেরিকার স্থল-বাহিনী

আমেরিকার স্থল-বাহিনীর চারটি লক্ষ্য :

১. আমেরিকার প্রতিরক্ষা করা।

২. পুরো বিশ্বে আমেরিকার অপারমাণবিক বা সাধারণ বাহিনীর ভীতি সৃষ্টি করা।

৩. অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপানো আমেরিকা ও জাতিসংঘের অবরোধ বাস্তবায়ন করা।

৪. প্রয়োজনের সময় মেরিন ফোর্সের সাথে যেকোনো রাষ্ট্রের ওপর হামলা করা।

স্থল-বাহিনীর নয়টি কেন্দ্রীয় হেড কোয়ার্টার রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি অপারেশনাল (Operational), পাঁচটি থিয়েটার (Theatre) এবং একটি মডুলার (Modular) হেডকোয়ার্টার। এগুলোর পাশাপাশি চারটি কোর হেডকোয়ার্টার রয়েছে। এই বাহিনীর সংখ্যা ১২ লাখ ৪৬ হাজার (১২৪৬০০০)। যার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭২ হাজার (৪৭২৫৯৫) রিজার্ভ সেনা এবং বাকিরা অ্যাকটিভ সেনা।[৬৪] আমেরিকার স্থল-বাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত :

একটি আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত বাহিনী, যারা আমেরিকার প্রতিরক্ষা করবে। অপরটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বাভাবিক ভীতি টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়োজিত বাহিনী, যার হেডকোয়ার্টার জার্মানি, ইতালি, কোরিয়া, কাতার ও আফ্রিকাতে রয়েছে।

আমেরিকার নৌ-বাহিনী

আমেরিকার সামুদ্রিক বাহিনীর উদ্দেশ্য :

১. বিশ্বের ওপর পরমাণু-যুদ্ধের ভয় সৃষ্টি করা।

২. সাধারণ ভয় টিকিয়ে রাখা।

৩. আমেরিকান মেরিন ফোর্সকে স্থলে অবতরণ করানো।

৪. সাধারণ সামুদ্রিক যুদ্ধ করা।

---

৬৪. এই পরিসংখ্যান ২০০৯ সালে আমেরিকার সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত সার্ভে থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার নৌ-সেনাদের সংখ্যা ৪৩৮৫০০ জন। আমেরিকার ছয়টি বড় নৌ-বহর রয়েছে :

১. প্রথম নৌ-বহর[৬৫] উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে।

২. দ্বিতীয় নৌ-বহর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে।

৩. তৃতীয় নৌ-বহর দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে।

৪. চতুর্থ নৌ-বহর ভারত সাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে।

৫. পঞ্চম নৌ-বহর ভূমধ্য সাগরে।

৬. ষষ্ঠ নৌ-বহর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে।

আমেরিকার এই নৌ-বহরগুলোকে গঠনের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, কীভাবে আমেরিকা পুরো বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে।

আমেরিকার বিমান-বাহিনী

আমেরিকার বিমান-বাহিনীর সেনা সদস্য ছয় লাখের কাছাকাছি।[৬৬] আমেরিকার বিমান-বাহিনীর লক্ষ্য :

১. আমেরিকার আকাশ প্রতিরক্ষা করা।

২. যৌথ কমান্ডের সাথে মিলে যুদ্ধে আমেরিকার নৌ, স্থল ও মেরিন ফোর্সকে সাহায্য করা।

৩. সাধারণ ও পরমাণু ভীতি টিকিয়ে রাখার বাহিনীকে সাহায্য করা।

আমেরিকার বিমান-বাহিনী দশটি অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশে ৯০টি যুদ্ধ-বিমান থাকে এবং ৩১টি পেট্রোলবাহী বিমান ও ১৩টি গোয়েন্দা বিমান থাকে।

আমেরিকান মেরিন ফোর্স

যদি আমেরিকার দূরদর্শিতা বা ভয় সৃষ্টি করা বা প্রকম্পিত করার কৌশল ব্যর্থ হয়, তাহলে সাধারণ যুদ্ধে নামার জন্য আমেরিকা মেরিন ফোর্সের নামে সর্বদা প্রস্তুত এক বাহিনীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। যাদের কাজ তৎক্ষণাৎ সাধারণ হামলা করে বসা। এই বাহিনী সাধারণত ভীতি সৃষ্টিকারী আমেরিকার সামুদ্রিক বহরে অবস্থান করে। এটি একটি এক্সপেডিশনারি ফোর্স, যা তিনটি ডিভিশনে গঠিত :

---

৬৫. এখানে গণনায় ভিন্নতার কারণ হলো, আমেরিকার প্রথম সামুদ্রিক বহর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মেরামত করার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয় এবং মেরামতের পর ফিরিয়ে এনে তাদেরকে তৃতীয় বহর বানিয়ে দেওয়া হয়।
৬৬. এই সংখ্যা ২০১০ সালে airman magazine এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করেছিল।

১. মেরিন স্পেশাল ফোর্স

২. মেরিন হেলিকপ্টার ফোর্স

৩. মেরিন রিজার্ভ ফোর্স

এদের সংখ্যা দুই লাখ ৪৩ হাজার সেনা।[৬৭]

আমেরিকান কোস্টগার্ড

এরা আমেরিকার সবচেয়ে ছোট বাহিনী, যাদের সংখ্যা ৮৫ হাজার থেকে কিছু কম বা বেশি। এই বাহিনীর লক্ষ্য আমেরিকার উপকূলীয় এলাকাগুলো রক্ষা করা।

আমেরিকান বাহিনীর যৌথ কমান্ড

দ্বিতীয় প্রকার এই বাহিনী পূর্বের উল্লেখিত ছয়টি সাধারণ বাহিনীকে যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য গঠিত। একে যৌথ যুদ্ধ কমান্ড (Unified Combatant Command) বলা হয়। আমেরিকার এই যৌথ কমান্ড দশটি কমান্ডের সমষ্টি। এই সমস্ত কমান্ড ভৌগলিক স্বার্থ ও নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। দশটির মধ্যে ছয়টির ভিত্তি ভৌগলিক এবং সেগুলো হচ্ছে :

১. আমেরিকার দক্ষিণ কমান্ড (United States Southern Command)

২. আমেরিকার উত্তর কমান্ড (United States Northern Command)

৩. আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ড (United States Pacific Command)

৪. আমেরিকার কেন্দ্রীয় কমান্ড (United States Central Command)

৫. আমেরিকার ইউরোপীয় কমান্ড[৬৮] (United States European Command)

৬. আমেরিকার আফ্রিকান কমান্ড (United States African Command)

---

৬৭. এখানের সব হিসাব ২০১০ সালের আমেরিকান অফিসিয়াল সোর্স থেকে প্রাপ্ত। আপডেট জানার জন্য ইন্টারনেটে সার্চ করুন।

৬৮. পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, সুদের অতিরিক্ততা এবং এগারো সেপ্টেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত জিহাদিদের হামলার ফলে আমেরিকার অর্থনীতি ধ্বংস হওয়া শুরু হয়েছে এবং এর প্রভাব বাহিনীর ওপরও পড়া শুরু করেছে। তারই একটি বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ২০১০ সালে আমেরিকা অর্থ বাঁচানোর জন্য তাদের ইউরোপীয় কমান্ড বিলুপ্ত করে দেয়। একেক করে আমেরিকার বাকি কমান্ডগুলোও একদিন খতম হবে ইনশাআল্লাহ।

এ ছাড়া বাকি চারটি কমান্ড নির্দিষ্ট কাজের জন্য। সেগুলো হলো :

১. আমেরিকার যৌথ বাহিনীর কমান্ড (United States Joint Forces Command)

২. আমেরিকার স্পেশাল অপারেশনের কমান্ড (United Special Operations Command)

৩. আমেরিকার স্ট্রাটেজিক কমান্ড (United States Strategic Command)

৪. আমেরিকার রসদ সরবরাহ কমান্ড (United States Transportation Command)

আমেরিকার এই যৌথ কমান্ডগুলোই মূলত বিশ্বের চতুষ্পার্শ্বের সেই অবরোধ, যা আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমেরিকার দক্ষিণ ও উত্তর কমান্ড

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ কমান্ড দুই অংশে বিভক্ত, উত্তর কমান্ড ও দক্ষিণ কমান্ড। আমেরিকার উত্তর কমান্ড কলোরাডো রাজ্যে, এই কমান্ড ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমান্ডের উদ্দেশ্য আমেরিকার উত্তর রাজ্যগুলো, কানাডা ও তার আশপাশের সমুদ্রের নয়শ কিলো অঞ্চল রক্ষা করা। দক্ষিণ কমান্ডের হেডকোয়ার্টার ফ্লোরিডার মিয়ামিতে। এর উদ্দেশ্য মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলোতে থাকা জাতিগুলোকে রক্ষা করা। সেই সাথে মেক্সিকো উপসাগরের ক্যারিবিয়ান সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু অংশ রক্ষা করা। এই কমান্ডের মধ্যে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ড

এটি আমেরিকার সবচেয়ে বড় কমান্ড। এর হেডকোয়ার্টার হাওয়াই দ্বীপে। ১৯৪৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫২ সালে ফিলিপাইন ও নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়া ও ১৯৬০ সালে জাপানের সাথে সংগঠিত সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা। এই কমান্ডের মধ্যে স্থল, নৌ, বিমান ও মেরিন বাহিনী অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় কমান্ড

এটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর হেডকোয়ার্টার আমেরিকার ফ্লোরিডার ম্যাকডিল এয়ার ফোর্স বেইসে অবস্থিত। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কাতারেও রয়েছে। এদের দায়িত্ব হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, জাজিরাতুল আরব, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও মিশরে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা। ইরাক ও আফগান যুদ্ধে লড়াই করাও এই কমান্ডের দায়িত্বে ছিল। এই কমান্ডে আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স, মেরিন স্পেশাল ফোর্স সবই অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার ইউরোপীয় কমান্ড

এর হেডকোয়ার্টার জার্মানিতে অবস্থিত। এই কমান্ড ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা এবং ন্যাটোর অংশ হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধে ইউরোপকে প্রতিরক্ষা করা। এই কমান্ডের এলাকা পুরো ইউরোপ, গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড। এদের দায়িত্বের মধ্যে ভূমধ্য সাগরে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার ছয়টি নৌ-বহর এই কাজে লিপ্ত রয়েছে। এর মধ্যে আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স, মেরিন স্পেশাল ফোর্স অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার আফ্রিকান কমান্ড

এটি আমেরিকার সবচেয়ে ছোট কমান্ড। এর হেডকোয়ার্টার জার্মানিতে। আফ্রিকাতে এর কেন্দ্র জিবুতিতে অবস্থিত। যেখানে প্রায় তিন হাজার সেনা নিয়োজিত রয়েছে। এদের উদ্দেশ্য আফ্রিকাতে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা। ১৫৩টি আফ্রিকান জাতির সাথে সামরিক সম্পর্ক রাখা, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানো, অবৈধ পণ্য স্মাগলিং-এর ওপর নজরদারি করা এবং আফ্রিকাতে চীনের স্বার্থের ওপর নজর রাখা।

আমেরিকার যৌথ বাহিনীর কমান্ড

এই কমান্ড ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য আমেরিকার সমস্ত বাহিনীকে সম্মিলিত পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত করা এবং যৌথ প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর হেডকোয়ার্টার ভার্জিনিয়া রাজ্যে অবস্থিত।

আমেরিকার স্পেশাল অপারেশন কমান্ড

এটি একটি কমান্ডো ধরনের বাহিনী। যারা পুরো বিশ্বে কমান্ডো অপারেশন চালায়। এর মধ্যে রেঞ্জার্স, ডেল্টাসহ ইত্যাদি ফোর্স অন্তর্ভুক্ত। এর হেডকোয়ার্টার ফ্লোরিডা রাজ্যে।

আমেরিকার স্ট্রাটেজিক কমান্ড

এই কমান্ড ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর হেডকোয়ার্টার আমেরিকার নেব্রাস্কা রাজ্যে। তাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে, সামরিক বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দেখভাল করা, মিসাইল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, তথ্য সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক স্ট্রাটেজি তৈরি করা, বৈশ্বিক ভীতি সৃষ্টি করা এবং ব্যাপক ধ্বংসের হাতিয়ারকে মোকাবিলা করা।

আমেরিকার রসদ সরবরাহ কমান্ড

এটি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর হেডকোয়ার্টার আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যে। এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে অন্য সমস্ত কমান্ডকে সহযোগিতা করা।

আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধপদ্ধতি

যদি আমরা ক্লজউইজ, মাহান, লিডল হার্ট ও বিউফারের থিউরিগুলো খুব গভীরভাবে লক্ষ করি, তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে যে, আমেরিকান বাহিনী দুটি লক্ষ্যে যুদ্ধ করে। প্রথম লক্ষ্য, বিশ্বের অন্য সমস্ত বাহিনীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা। এই কাজের জন্য তারা বৈশ্বিক অবরোধ প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এই অবরোধ তৈরির ক্ষেত্রে পুরো ইউরোপ ন্যাটোর অধীনে তাদের সাথে রয়েছে। এই অবরোধ বাস্তবায়ন তিন মাধ্যমে হয়ে থাকে।

প্রথমত, যদি শত্রু আক্রমণ চালাতে চায়, তাহলে তাকে এই বিশ্বাস করানো যে, তাদের এই আক্রমণের ফলে তাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অবরোধ। এর মধ্যে সেই রাষ্ট্রগুলো অন্তর্ভুক্ত, যাদের সীমানা শত্রু রাষ্ট্রের সাথে। এই দেশগুলোর কাজ হবে সেই শত্রুকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করে রাখা। যার ফলে সেই শত্রু আমেরিকার থিউরি অনুযায়ী দুর্বল হয়ে হাতিয়ার ফেলে দেবে। এর সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ পাকিস্তানের সেই কার্যক্রম, যা তারা আমেরিকার সাথে মিলে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানকে পতনের জন্য আঞ্জাম দিয়েছিল।

তৃতীয়ত, তাদের ওপর অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ তৈরি করা। যা আমেরিকা এমন রাষ্ট্রের ওপর দেয়, যাদের থেকে আমেরিকার এই আশঙ্কা রয়েছে যে, তারা যেকোনো সময় আমেরিকার জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। এটি হলো আমেরিকার দূরদর্শিতার স্ট্র্যাটেজি।

যখন শত্রু ওপরে বর্ণিত কোনো সুরতেই হাতিয়ার না ফেলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন আমেরিকা মেরিন ফোর্সকে আক্রমণের আদেশ দেবে। বহিরাগতভাবে ভীতি সৃষ্টিকারী অবরোধ ও রাজনৈতিক অবরোধ প্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে মেরিন ফোর্স শত্রু এলাকায় অবতরণ করে লড়াই শুরু করবে (যারা গতানুগতিক যুদ্ধ থেকে গেরিলা যুদ্ধ পর্যন্ত যেকোনো ধরনের আক্রমণ চালাতে সক্ষম)। এই যুদ্ধকে আমেরিকার সামরিক পরিভাষায় লিমিটেড ওয়ার বলা হয়। এর রণক্ষেত্রকে থিয়েটার অফ ওয়ার বলা হয়। আমেরিকা স্নায়ুযুদ্ধের সময় রাশিয়ার সাথে এমন সামরিক কার্যক্রম এবং এমন বাহিনী ব্যবহার করেছিল। বর্তমানে এই কার্যক্রমকে আমেরিকা ও ন্যাটো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।

স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল

আফগানে রাশিয়া পরাজিত হওয়ার পর ১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়ে আমেরিকা বিশ্বের সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়ে যায়। মোটকথা, এই যুগের সংঘটিত ঘটনাগুলো মুসলিম উম্মাহর সামনে শত্রুর আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ মূলত বিশ্বের চতুষ্পার্শ্বে সামরিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির নাম, যা প্রতিষ্ঠা করতে আমেরিকা সফল হয়েছে। এখন জায়োনিস্ট ইহুদিবাদী ক্রুসেডার জোট নিজেদের বিজয়কে পূর্ণ করার জন্য সর্বশেষ স্তরে প্রবেশ করেছে।
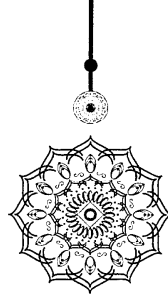
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চতুর্থ যুগ

বৈশ্বিক যুদ্ধ ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (১৯৯১-২০১১ খ্রি.)

১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়। যার ফলে সেভিয়েত ইউনিয়ন টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আর এর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোট, ইসরাইল, আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সামনে বাহ্যিক সব বাধা দূর হয়ে যায় এবং তাদের বৈশ্বিক হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সে সময় তাদের ধারণামতে এমন কোনো শক্তি ছিল না, যারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম। সমাজতন্ত্র পতনের পর বিশ্বের তিনটি বড় রাষ্ট্র রাশিয়া, চীন ও ভারত ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 'বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি'তে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারা সেই সময় ধাক্কা খায়, যখন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে তাদের তাবেদার শাসক থাকা সত্ত্বেও মুসলিম যুবকরা মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা আমেরিকা ও পশ্চিমাদের ক্রুসেড-জায়োনিস্ট জোটের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে। তারা পুরো বিশ্বে এই জোটকে নিশানা বানানো শুরু করে এবং আমেরিকা ও পশ্চিমাদের বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এর ফলে ক্রুসেড ও জায়োনিস্ট ইহুদিরা এক নতুন যুদ্ধে প্রবেশ করে এবং তাদের বৈশ্বিক হুকুমত এক নতুন বিপদে প্রকম্পিত হতে থাকে। যেই উম্মাহ ক্রুসেড-ইহুদি জোটের হাতে উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের পর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গোলাম হয়ে গিয়েছিল, সেই উম্মাহর যুবকরাই এক শতাব্দীর কম সময়ের ভেতর ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তার মোকাবিলায় ময়দানে বের হয়ে এসেছে। এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে বিশ্বের সমস্ত আন্তর্জাতিক শক্তি ও অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর সেই সমস্ত যুবক, যাদেরকে নিজ রাষ্ট্রও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমারা তাদের ব্যাপারে শুধু এই কারণেই ভীত ছিল যে, এই যুবকরা তাদের বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আর এই বিষয়টি পশ্চিমা ক্রুসেডারদের জন্য মৃত্যু সমতুল্য ছিল। এখানে আমরা এই যুগের বিশেষ ঘটনাগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আফগান জিহাদ

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদি আন্দোলন পুরো বিশ্বের মুসলিমদের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এই জিহাদে অংশ নেওয়ার জন্য আরব ও অনারব হাজারো যুবক আফগানে হিজরত করে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। মুজাদ্দিদে জিহাদ শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জামের চেষ্টা ছিল আরব-বিশ্বে জিহাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করা। যার ফলে মুসলিম যুবকদের মধ্যে উসমানি খিলাফত পতনের পৌনে শতাব্দীর ভেতরেই খিলাফত ফিরিয়ে আনার চেতনা সৃষ্টি হয়। তিনি তখন আফগানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত মুজাহিদদেরকে আন্দালুস বিজয় করা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার ফতোয়া দেন এবং তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেন যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাদের অধীনতা থেকে স্বাধীন না হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে।

এটাই সেই চিন্তাগত নির্দেশনা ছিল, যা মুজাহিদদেরকে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সামনে এনে দাঁড় করায়। সেই সময় আফগান যুদ্ধক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। সেখানে হাজারো যুবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং রাশিয়া চলে যাওয়ার পর তারা এই প্রশিক্ষণ-সহ নিজ নিজ রাষ্ট্রে ফিরে যায়। সেই সাথে এই জিহাদ আফগান, মিশর, শাম, ফিলিস্তিন ও জর্ডানসহ প্রায় ৬০-৭০টি অঞ্চলের জিহাদি অন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদ ও আলিমদের একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও ফায়দা অর্জনের সুযোগও তৈরি করে দেয়।[৬৯]

এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলিম উম্মাহ পায় উসামা বিন লাদেনের মতো মুজাহিদ নেতা, যিনি প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কায়েদাতুল জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার পরাজয়ের পর মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে তালিবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা আফগানে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করেন।

৬৯. স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ শুরুর আগেও আরব-দুনিয়া এবং বিশেষ করে মিশর ও শামে জিহাদি কার্যক্রম শুরু হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমাদের গোলাম শাসক ও বাহিনীর জুলুমের বিরুদ্ধে হাজারো জান কুরবান হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলো সমাজের মধ্যে তাদের দাওয়াতের রক্ষাকারী শ্রেণি তৈরি করেছিল, যুবকদের মধ্যেও যুদ্ধের জজবা জন্মিয়েছিল। কিন্তু শাসন-ক্ষমতার পতন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। এই সমস্ত আন্দোলন মুসলিমদেরকে গোলামে পরিণতকারী বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে এই ব্যবস্থার আঞ্চলিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অধিক ব্যস্ত ছিল।

উপসাগরীয় যুদ্ধ, হিজাজে আমেরিকার আগমন

আফগান থেকে রাশিয়া চলে যাওয়ার পর ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েতের ওপর হামলা করে, যার ফলে জাতিসংঘ ইরাকের ওপর অবরোধ চাপিয়ে দেয় এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র কুয়েত রক্ষার বাহানায় হিজাজের ভূমিতে আমেরিকান বাহিনী প্রবেশ করায়। এক বছরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং ইরাক কুয়েত থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু সেই সময় আমেরিকান বাহিনীর হিজাজ ভূমিতে প্রবেশ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ইন্ধন হিসেবে কাজ করে। উসামা বিন লাদেন তখন ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে সফর করে সৌদি প্রশাসনের এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আলিমদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন। সৌদি প্রশাসন এটাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা তার ওপর সৌদিতে প্রবেশের ব্যাপারে বাধা আরোপ করে। এই অবস্থায় তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করে দেন এবং পুরো উম্মাহকে আমেরিকার বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। সৌদিতে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি ও তার সাথিরা সুদানে চলে যান।

সোমালিয়ায় আমেরিকার আক্রমণ

১৯৯১ সালে সোমালিয়াতে আমেরিকার গোলাম সাইয়াদ বারির প্রশাসনকে সেখানের মুসলিমরা ক্ষমতাচ্যুত করে। এটা দেখে জাতিসংঘ আমেরিকার ইশারায় সোমালিয়াতে আমেরিকান বাহিনীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা বাহিনী (UNITAF)[৭০] পাঠায়। এই বাহিনী ১৯৯৩ সালে সোমালিয়াতে প্রবেশ করে; কিন্তু তাদের মুখে লাগাম লেগে যায়। শাইখ উসামা মুজাহিদদেরকে সুদান থেকে সোমালিয়াতে জিহাদের জন্য পাঠিয়ে দেন। তিনি সোমালিয়ার মুজাহিদদের সাথে মিলে মোগাদিসু যুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর ৩১ আমেরিকার সদস্যসহ ২৪ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেন এবং আমেরিকানদের লাশ সড়কে টাঙিয়ে দেন। এই অবস্থা দেখে সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে জাতিসংঘের এই মিশন ব্যর্থ হয়। বাস্তবিক ময়দানে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে আমেরিকার ওপর এটাই প্রথম বড় আঘাত ছিল।

৭০. (UNITAF) United Task Force

আল-জাজায়িরে জিহাদের সূচনা

মাগরিবে ইসলামির (আফ্রিকা) একদিকে সোমালিয়ার মুসলিমরা আমেরিকার গোলামদের মানতে অস্বীকার করে। অপরদিকে আল-জাজায়িরের মুসলিমরা ফ্রান্সের গোলামদের মানতে অস্বীকার করে বসে। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে ধর্মীয় দল আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া লিল-ইনকাজ বিজয়ী হয়। কিন্তু ফ্রান্সের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের গোলাম আল-জাজায়িরি বাহিনী হুকুমত দখল করে নেয় এবং আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া লিল-ইনকাজের অধিকাংশ নেতাকে গ্রেফতার করে। যাদের মধ্যে জামাআতের প্রধান শাইখ আব্বাসি মাদানি, শাইখ আলি বালহাজ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল-জাজায়িরের বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর মুসলিম নেতাদের গ্রেফতার করার ব্যাপারটি বারুদের মতো কাজ করে। ফলে সেখানের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালে জিহাদ শুরু হয়ে যায়। এই অন্দোলনের মধ্যে সেই সমস্ত আল-জাজায়িরি মুজাহিদরা অংশ নেয়, যারা ইতিপূর্বে আফগানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের শুরু পর্যন্ত আল-জাজায়িরের জিহাদ অনেক ভালোভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। মুজাহিদরা সেখানের নতুন শাসক ফ্রান্সের গোলাম বুজিয়াফকে হত্যা করে এবং জাজায়িরি বাহিনীকেও চরম আঘাত করে। সেই সময় ফ্রান্স ও আল-জাজায়িরের গোপন সংগঠনগুলো ধোঁকাবাজি করে মুজাহিদদের সারির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। যার ফলে ১৯৯৫ সালের পর এই আন্দোলন ক্ষমতালোভীদের হাতে চলে যায়, যারা সাধারণ জনগণ ও মুখলিস মুজাহিদদের শহিদ করে এবং অন্যান্যদের গ্রেফতার করে। এই অবস্থা ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে এবং একসময় এই ক্ষমতালোভীদের তাকফিরি টুলের শক্তি শেষ হয়ে যায়।

সেই সময় বাহ্যিকভাবে এমনটা বোঝা গিয়েছিল যে, আল-জাজায়িরে মুজাহিদদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক জিহাদি আন্দোলনে এর অনেক প্রভাব তৈরি হয়। মুজাহিদরা আল-জাজায়িরের এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু অর্জন করে এবং অপরাপর এলাকাতেও এই ত্রুটিগুলো দূর করে, যেগুলো তখনও সেখানে রয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং আল-জাজায়িরের মধ্যেও সঠিক চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ধারক মুজাহিদরা দ্বিতীয়বার সংগঠিত হয়।

ককেশাস, বসনিয়া ও কাশ্মীরে জিহাদি আন্দোলন

দুই শতাব্দী যাবৎ ককেশাসে চলমান রাশিয়ার আক্রমণের মোকাবিলার জন্য ৯০ দশকে মুজাহিদরা দ্বিতীয়বার সংগঠিত হওয়া শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে আমির শামিল ও কমান্ডার খাত্তাবের নেতৃত্বে মুজাহিদরা ককেশাসের গ্রজনি থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। দুই বছরের জিহাদের পর মুজাহিদরা রাশিয়ার বাহিনীকে গ্রজনি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এর পাশাপাশি ককেশাসের অন্যান্য এলাকাতেও মুজাহিদরা জিহাদ শুরু করেন।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ইউরোপের মুসলিম এলাকা বসনিয়ার ওপর ক্রুসেডার সার্বিয়া ও ক্রশিয়া হামলা করে এবং সেখানে মুসলিমদের ওপর বিশাল গণহত্যা চালায় এবং মুসলিমদের বোনদের সম্ভ্রমহানি করার ভয়ানক ধারা চালু করে। এই সময় যখন সব মুসলিম রাষ্ট্রের বাহিনী চুপ থেকে তামাশা দেখছিল অথবা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাথে মিলে বসনিয়া গিয়ে পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছিল, তখন এই জুলুমের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম উম্মাহর মুজাহিদরা আস্তে আস্তে বসনিয়া পৌঁছাতে শুরু করেন। সব ধরনের অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ সত্ত্বেও নিজেদের মাজলুম ভাইদের প্রতিরক্ষা শুরু করেন এবং তারা দ্রুত সার্বিয়ার বাহিনীকে অনেক এলাকা থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হন। পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রে মুজাহিদদের স্থান করে নিতে দেখে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো এগিয়ে আসে এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং বসনিয়ার আঞ্চলিক নেতৃত্বকে চুক্তির ধোঁকার জালে ফাঁসিয়ে এই জিহাদের ফল সফলভাবে অর্জন করার সুযোগ নষ্ট করে দেয়।

তৃতীয় দিকে আফগান জিহাদের শেষ যুগে কাশ্মীর অঞ্চলের জিহাদও মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে আসে। অনেক আরব ও পাকিস্তানি মুজাহিদ নিজেদের কাশ্মীরি ভাইদের মুক্তির জন্য ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কাশ্মীরে প্রবেশ করে। এই সময়টা কাশ্মীরের জিহাদি আন্দোলনের উত্থানের যুগ ছিল। ভারতীয় বাহিনী এই যুগে কঠিন আক্রমণের শিকার হয়। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী ও গোপন সংস্থাগুলোর চক্রান্ত এই আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয় এবং এটাকে শরয়ি জিহাদের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে পরিবর্তন করে দেয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে এই আন্দোলনের গলায় ঘণ্টা পরিয়ে দেয়; যাতে এই আন্দোলন কখনোই কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছাতে না পারে।

আফগানে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা

আফগান থেকে রাশিয়া চলে যাওয়ার পর যখন মুজাহিদরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার কিছু নির্বাচিত বান্দাকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা সম্মান বা ক্ষমতার প্রত্যাশী ছিল না। যাদের জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯১ সালে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে তালিবান আন্দোলন কান্দাহার থেকে শুরু হয় এবং পাঁচ বছরের ভেতর আফগানের অধিকাংশ এলাকা তাদের শরয়ি ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে এবং আমিরুল মুমিনিনের অধীনে সেখানে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইমারাতে ইসলামিয়ার মাধ্যমে আফগানে ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এবং দেশে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। খিলাফত পতনের পর এটাই ছিল প্রথম ঘটনা, যেখানে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মোকাবিলায় মুসলিমরা নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা ২০০১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ক্রুসেডার ও ইহুদি জোটকে মুসলিমদের ইমারাত কঠিন ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে ফেলে দেয়, যা তাদের বৈশ্বিক বিজয় ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ছিল। এই জন্য তারা এর বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা শুরু করে।

আক্রান্ত আমেরিকা

যখন আমেরিকা ইমারাতের ওপর হামলার জন্য পরিকল্পনা করছিল এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল, তখন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আরব মুজাহিদরা অগ্রগামী হয়ে আমেরিকার ওপর ঐতিহাসিক আক্রমণ করে বসে। তারা নতুন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে আমেরিকাকে তার ভূমিতেই আক্রমণ করে এবং তার অর্থনীতি ও সামরিক কেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনকে লক্ষ্য বানায়। এটি ছিল এমন এক আক্রমণ, যা ক্রুসেড-ইহুদি জোটের কল্পনাতেও সম্ভব ছিল না। এই হামলা ক্রুসেড-জায়োনিস্ট জোট এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে চলমান যুদ্ধে আরও অধিক উত্তপ্ততা সৃষ্টি করে। পশ্চিমারা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত করে দেয়। আধুনিক ইতিহাসে এই হামলাকে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটাই সেই মোড়, যেখান থেকে ক্রুসেড ও জায়োনিস্ট জোটের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন শুরু হয়।[৭১]

---

৭১. ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা দুনিয়াতে কী প্রভাব ফেলেছিল, তা আলোচনার জন্য তো পুরো এক কিতাব দরকার। তবে যেই ব্যক্তিই অন্তর্চক্ষু দ্বারা ২০০১ সালের পরের অবস্থাগুলো অনুধাবন করবে, সে নিশ্চিত এটা বুঝতে পারবে যে, এই হামলা দুনিয়ার অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর কী পরিমাণ গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যকে কী পরিমাণ প্রকম্পিত করেছিল। এ ছাড়াও যে ব্যক্তি আরও অধিক গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে, তার সামনে এটাও স্পষ্ট হবে যে, এই হামলা কত মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকেও পরিবর্তন করে দিয়েছে।

আফগানে আমেরিকার হামলা ও মুজাহিদদের প্রতিরক্ষা

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর আমেরিকা পাগলা হাতির মতো হয়ে যায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেড ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। পুরো বিশ্বের কাফিরদেরকে এই যুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করায়। এটি ছিল সেই যুদ্ধের সরাসরি ঘোষণা, যা আরও এক দশক পূর্ব থেকে চলে আসছিল। পূর্বে যার যুদ্ধক্ষেত্র সোমালিয়া, আল-জাজায়ির, বসনিয়া ও ককেশাসে সীমাবদ্ধ ছিল। এ ছাড়াও তখন কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়াতে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস ও সি.আই.এর ঘাঁটি এবং ইয়ামানের উপকূলের আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের ওপরও হামলা হয়েছিল।

আমেরিকা সব পশ্চিমা শক্তিকে সাথে নিয়ে আফগান ইসলামি ইমারাতের ওপর হামলা করে এবং পুরো দেশটাকে টমাহক মিসাইল নিক্ষেপ করে চুরমার করে দেয়। আমেরিকার ধারণা ছিল যে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই তারা আফগানের মুজাহিদদের শেষ করে দেবে। কিন্তু তারা নিজেদের ভুল সেই সময় অনুধাবন করে, যখন তারা কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও বাস্তবে এক ইঞ্চি ভূমিকেও পূর্ণ দখল করতে সক্ষম হয়নি। তালিবানরা কৌশল হিসেবে পিছু হটে এবং নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। আজ ১১ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রত্যেকটি নতুন সূর্য উদয়ের সাথে সাথে আফগানের ভূমিতে আমেরিকার পরাজয় এবং তালিবানদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৭২]

ইরাকে আমেরিকার হামলা

একদিকে আমেরিকা নিজের শক্তির অহংকারে ২০০১ সালে আফগানের ওপর হামলা করে, অপরদিকে ২০০৩ সালে ইরাকের ওপর হামলা করে। আফগানের ওপর হামলা যেমন আমেরিকাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তেমনই ইরাকের ওপর হামলাও তাদের জন্য চরম ক্ষতিকর হয়েছিল। সাদ্দামের প্রশাসন উলটে গিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু স্থানীয় মুজাহিদরা এমন হামলা শুরু করেন, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তারা আমেরিকা ও তাদের জোটের কঠিনভাবে জান ও মালের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষন হন। একসময় তারা সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। একেক করে সমস্ত জোটবদ্ধ বাহিনীর সেনা ইরাক থেকে বের হয়ে যায় এবং আমেরিকান বাহিনী একলা রয়ে যায়। এরপর পুরো বিশ্বে ও বিশেষ

---

৭২. উল্লেখ্য দীর্ঘ ১৯ বছর যুদ্ধের পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শনিবার, কাতারের রাজধানী দোহায় আমেরিকা ও ন্যাটো জোট আগামী ১৪ মাসের ভেতর আফগানিস্তান থেকে তাদের সকল সেনা প্রত্যাহারের শর্তে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একে আমেরিকার পরাজয় হিসেবেই গণ্য করছেন। (১৫ আগস্ট ২০২১, কাবুল বিজয়ের মাধ্যমে তালিবানরা দ্বিতীয়বারের মতো আফগানিস্তানে ক্ষমতা লাভ করে)

করে আমেরিকার মধ্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। এমনকি আমেরিকার রিটায়ার্ড জেনারেল উইলিয়াম বলেছিল, 'এই যুদ্ধ ছিল আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ানক স্ট্রাটেজিক ভুল।' অন্যদিকে মুজাহিদরা আল্লাহ তাআলার সাহায্যে ইরাকের উত্তর এলাকাতে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে বাকি এলাকাগুলোতে আমেরিকা তাদের গোলাম রাফিজিদের বসায় এবং প্রশাসন ও বাহিনীর হাতে দেশ ছেড়ে দিয়ে আসে। এই প্রশাসন ও বাহিনী আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা ও ইসলামের সাথে শত্রুতার ভিত্তিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নেমে আসে।

অন্যান্য ইসলামি অঞ্চলে ইউরোপীয় সন্ত্রাসের পরাজয়

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান জিহাদি আন্দোলনগুলোর মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়, কেমন যেন তাদের মধ্যে নতুন প্রাণ এসেছে। সেই অবস্থান থেকে উপমহাদেশের পর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে মাগরিবুল ইসলামিতে। যেখানে কয়েকটি রাষ্ট্রে মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা এক বিশাল শক্তি হয়ে সামনে আসে। সোমালিয়ার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা ওই অঞ্চলের মুজাহিদদের জামাআত সোমালিয়াতে প্রায় ৯০% অঞ্চল দখল করে সেখানে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকা ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো সোমালিয়ার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখনো চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও আল-জাজায়িরের মুজাহিদরা দ্বিতীয়বার সংগঠিত হয়ে ফ্রান্সের গোলাম আল-জাজায়িরি প্রশাসন ও বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছে। সেই সাথে এই জিহাদ মালিতেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুরো উত্তর মালি মুসলিমরা দখল করে নিয়েছে। আজ সেখানে মুজাহিদদের ও ফ্রান্স বাহিনীর মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ চলছে। নাইজেরিয়াতেও এ ধারা অব্যাহত আছে।

এ রকম আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের নাম হলো শাম ও ইয়েমেন। এখানে মুসলিমরা একই সাথে কয়েক শত্রুর সাথে লড়ে যাচ্ছে। এবং বেশকিছু এলাকা ইসলামি শরিয়াহর আলোকে পরিচালিত করছে।

পরিশিষ্ট

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : সমাধান কী?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কী? (বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা)

এই কিতাবের প্রথম অংশে আলোচনা হয়েছে যে, ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার গোত্র, জাতি ও বাদশাহর (মুসলিমদের জন্য খিলাফতের) মাধ্যমে গঠিত ছিল, যা ছিল তাদের নিজ নিজ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ধারাবাহিকভাবে এই সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে দুটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অপরটি কোম্পানি। অতঃপর পুরো বিশ্বের মানুষকে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়। যখন কোনো রাষ্ট্রের মানুষ বিশেষ ঐতিহাসিক কৌশলের মাধ্যমে কোম্পানি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে, তখন সেই রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাদেরকে বৈশ্বিক সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ, WTO, IMF ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে মিলিত করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে :

১. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : ব্যক্তি ও সামাজিক স্তর।

২. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রাষ্ট্রীয় স্তর।

৩. নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : আন্তর্জাতিক স্তর।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : ব্যক্তি ও সামাজিক স্তর

যেকোনো সমাজ মূলত দুই ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অপরটি পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্ক। এই চারটি পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা সমাজ অস্তিত্বে আসে। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে। যার ফলে সমাজের স্বাভাবিক ও স্বভাবজাত দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায়।

ব্যক্তি : ইনসান থেকে হিউম্যান ও হিউম্যান থেকে প্রফেশনাল

আসমানি ধর্মের অনুগত মানুষ নিজেকে 'আবদ' বা 'বান্দা' হিসেবে গণ্য করে। যার উদ্দেশ্য উত্তম কাজ ও ইবাদতের মাধ্যমে রবের সন্তুষ্টি অর্জন করা। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপেও এই আদর্শই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর মানুষ আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিবর্তে এমন হিউম্যান হয়ে যায়, যার লক্ষ্য শুধুই বস্তুগত উন্নতি করা। এই উন্নতির জন্য তার দরকার ছিল পুঁজি ও ধারাবাহিক পুঁজি বৃদ্ধি করা। যার জন্য এখন সে নিজের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করতে শুরু করে। পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সে কোনো ধর্মীয় নৈতিকতার প্রয়োজন বোধ করে না; বরং সে সর্বদার জন্য এক পেশাদারি চরিত্র গ্রহণ করে নেয়। পেশাদার মানুষের ইমান হয় তার পেশা অনুযায়ী, সে পেশার প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে হিউম্যানের সেবা করে, যার বিনিময়ে তার পুঁজি বৃদ্ধি পায়। এই সেবা সে কোনো ধর্ম, রং বা বংশের মাঝে পার্থক্য করা ব্যতীত নির্বিশেষে সমস্ত হিউম্যানের জন্য করে

থাকে; চাই তার এই সেবা কাফিরের জন্য হোক বা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হোক। প্রফেশনালিজম বা পেশাদারির দ্বারা মুসলিমদের বন্ধুত্ব-শত্রুতার বিশ্বাস বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়।

পুরুষ ও নারীর সমতা

যেহেতু এখন সমস্ত হিউম্যানের লক্ষ্য পুঁজি বৃদ্ধি করা এবং পুরুষ ও নারী উভয়েই হিউম্যান। আর যেহেতু স্বাধীনতা ও সমতা হিউম্যানের মৌলিক লক্ষ্য, তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষকে পুঁজি কামানোর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিউম্যানকে এই বিশ্বাস করানো হয় যে, পুঁজি বৃদ্ধির জন্য নারীকেও তার স্বভাবজাত গণ্ডি থেকে বের হতে হবে। কেননা ঘরে বসে থেকে পুঁজি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাকে বিশ্বাস করানো হয় যে, নারী-পুরুষ উভয়েরই নিজ নিজ কর্তব্য বাছাই করে নেওয়া উচিত। যেভাবে পুরুষ পেশাদার, তেমনই নারীকেও পেশাদার হওয়া উচিত। এমনকি ঘরের দায়িত্বও তাকে পেশাদারির মতো করা উচিত। শুরুতে দাবি করা হয় যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান দায়িত্ব আদায় করবে। যখন বাচ্চার বয়স সাড়ে তিন বছর হয়ে যাবে, তখন বাচ্চাকে নার্সারি বা ডে-কেয়ার চাইল্ড স্কুল নামক পেশাদার আস্তানাগুলোতে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। এবং এই বাচ্চাকেও পেশাদার হিউম্যান বানানোর জন্য আধুনিক শিক্ষা আবশ্যক করে দেওয়া হয়; যাতে ছোট বয়স থেকেই সে পেশাদারির শিক্ষা পেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

এভাবেই এই সমাজকে সোল সোসাইটি[৭৩] ও কর্পোরেট সমাজে পরিবর্তন করে ফেলা হয়। যেখানে সমস্ত হিউম্যান কোনো লিঙ্গের পার্থক্য ছাড়াই কোম্পানির ম্যানেজার, ডক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়া শুরু হয়। সোল সোসাইটি ও কর্পোরেট সমাজ প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

৭৩. আগেকার সমাজগুলোতে দ্বীন, বংশ এবং ঐতিহ্যগত একটি সামাজিক বন্ধন ও শক্তি ছিল। যেখানে ইচ্ছা করলেই কেউ কোনো অন্যায় কিংবা অপরাধ করতে পারত না। সামাজিক এই সংহতিকে নষ্ট করে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আমলাতান্ত্রিক যেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাকেই সোল সোসাইটি বলে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কাবায়িল ও গোত্রীয় ব্যবস্থার বিপরীত

অতীতকাল থেকেই পরিবার ও বংশ সমাজের মূল ও স্বাভাবিক শক্তি ছিল। যার ভিত্তি পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এই স্বাভাবিক শক্তিকে ধ্বংস করা এবং ঐক্যের দৃঢ়তা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এই শক্তি তিন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল :

১. বৈবাহিক সম্পর্ক
২. জন্ম নেওয়া সন্তান
৩. সন্তান ও এতিমদের লালনপালন

এই শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য নারী স্বাধীনতা ও সমতার নামে নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়। মহিলাদের জন্য অর্থ উপার্জনের বাধ্যতামূলক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং প্রশাসনের কার্যক্রমের মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয়, যার ফলে নারীরা তার মূল দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। চাকরির বাহানায় ঘর থেকে বের হয়ে সে বংশীয় সম্পর্ক ও সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষার বাহানায় কমবয়সী বাচ্চাদেরকে মায়ের ভালোবাসা ও ব্যক্তিগত পরিচর্যা থেকে বের করে নার্সারির অপ্রাকৃতিক পরিবেশে সোপর্দ করে দেওয়া হয়। পেশাদার শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে বংশ-সমাজ থেকেও বেশি পেশার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত বানিয়ে দেওয়া হয়। এতিমদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিপালনের মাধ্যমে মায়ের ঘাটতি পূরণের পরিবর্তে তাদের জন্য আলাদা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন প্রজন্ম থেকে ঘরের জ্ঞানী ও দ্বীনদার বৃদ্ধ পিতামাতাকে দূর করে পেশাদার সংস্থা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক বিবাহকে সর্বাবস্থায় অপরাধ সাব্যস্ত করে জিনা, ব্যভিচার ও চারিত্রিক অধঃপতনের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এই সবই গণতন্ত্রের সেই সব কার্যক্রম, যার দ্বারা বংশীয় ঐক্যকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক ঐক্যের বিলুপ্তি ও দায়িত্বহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

অতীত জমানার গোত্র ও বংশীয় সমাজে এমন স্বভাবজাত শক্তি থাকত, যা সমাজের সদস্যদের দেখাশুনার পাশাপাশি তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম ছিল। ইসলাম এই স্বাভাবিক শক্তিগুলোকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে তাদেরকে শরিয়াহর অনুগত করে সমাজকে পবিত্র করে নেয়। সেই শক্তিকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের দায়িত্ব আরোপ করে সমাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সেই সমাজের দায়িত্ব ছিল শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়ন, আল্লাহর হুদুদ প্রয়োগ এবং জিহাদের জন্য সদস্য ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করা। আর রাষ্ট্র সর্বদা এই কাজের ধারা চালু থাকার ব্যাপারে তদারকি করত।

পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন সামাজিক সিস্টেম বাস্তবায়ন করে, যেখানে সমাজের মূল শক্তি ও ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন গঠিত শক্তিকে জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়, যেগুলোর সাথে সমাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এরই অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল, পুলিশ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পার্টির কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের লাগাম কৃত্রিম শক্তির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে আসল শক্তিগুলো হয়তো হতাশ হয়ে পিছু হটে অথবা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কৃত্রিম শক্তির সাথে সম্পর্ক করা এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে সমাজের বাকি সদস্যদেরকে জীবিকা তালাশ ও পুঁজি বৃদ্ধি করার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ফলে সমাজ পরিচালনার সব দায়িত্ব এমন শ্রেণির হাতে দেওয়া হয়, যাদেরকে এই দায়িত্ব পালন নয়; বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোলামির জন্য গঠন করা হয়েছে। তারা পুরো সমাজকে দায়িত্বহীন সমাজে পরিণত করে। এর বাস্তবিক চিত্র মুসলিম সমাজে তখনই পরিলক্ষিত হয়, যখন কোনো শক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের চেষ্টা করে। কারণ তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ল এন্ড অর্ডার তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

অনুভূতিহীন সমাজ

সমাজের স্বভাবজাত শক্তিগুলোর ক্ষমতা নিঃশেষ করে ল এন্ড অর্ডার বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রীয় কর্তাদের দখলদারিত্বের স্বাভাবিক ফল ছিল সেই সমাজ, যা পূর্বে জিহাদের জন্য জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, এখন তারা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। তারা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও অশ্লীলতার সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রাষ্ট্র সমস্ত বাতিল আদর্শ ও অশ্লীলতা যখন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে শুরু করে।

কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত সমাজ

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক কর্পোরেট সমাজে মসজিদ, মাদরাসা ও দারুল ইফতার কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ ইসলামি রাষ্ট্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই মৌলিক গুরুত্ব ছিল। মসজিদে সমাজের মানুষের সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতো এবং শরিয়াহর বিধান বর্ণনা করা হতো। মাদরাসাতে মুসলিম বাচ্চাদেরকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হতো এবং দারুল ইফতা দ্বীনের আলোকে জীবন পরিচালনার বিধান ও নিত্যনতুন সংকটগুলোর সমাধান সমাজের সামনে পেশ করত। এই দায়িত্বগুলো সমাজের উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই আঞ্জাম দিত। কাজিদের অধীনে ফৌজদারি মামলাগুলোর সমাধানও এখান থেকে করা হতো। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো অতীতের স্মৃতিবিজড়িত বিল্ডিংয়ে পরিণত হয়েছে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রাষ্ট্রীয় স্তর

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সবচেয়ে বড় সফলতা। এই রাষ্ট্রের প্রথম কাজ মানুষকে কোনোভাবেই আল্লাহ তাআলার বান্দা হতে সুযোগ না দেওয়া এবং ব্যক্তিগত উন্নতিকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে দেওয়া। আইন প্রণয়ন করে ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তাবিত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও মানবিক ইচ্ছাকে হিফাজত করা এবং অস্ত্রের শক্তিতে তা বাস্তবায়ন করা। এর বিরুদ্ধে তোলা প্রতিটি মাথাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। আর এই কাজের জন্য 'ল এন্ড অর্ডার' ও ' রিট অফ দ্যা স্টেট'-এর মতো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বিতীয় কাজ, বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকদের থেকে তার ব্যবস্থাপনাগত সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাকে অস্ত্রহীন ও দুর্বল বানিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যার জন্য তাকে তৈরি করা হয়েছে, তা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা করা।

ল এন্ড অর্ডার

ব্যবস্থাপনাগতভাবে রাষ্ট্র আইনের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করে, যা মূলত মানুষের 'সাধারণ ইচ্ছা'-এর নাম। আইনকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে মানুষের বানানো নীতি মানুষের ওপরই বাস্তবায়ন করা হয়, যা 'গাইরুল্লাহর হুকুম' বা আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান ব্যতীত ফয়সালা করার বাস্তবিক রূপ। এই আইনগুলো বাস্তবায়নের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতি জেলাতে তিনটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় : আমলা, আদালত ও পুলিশ। এই তিন শক্তিকে সমাজের মূল শক্তিগুলো থেকেও অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়; যাতে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'ল এন্ড অর্ডার' অর্থাৎ নীতি-আদেশ সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় আদেশ (রিট অফ দ্যা স্টেট)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়, যা মুসলিমরা আল্লাহ তাআলার বিধানকে দিয়ে থাকে। যখন কোনো শক্তি হিউম্যানের সাধারণ ইচ্ছা বা আইনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করে, তখন রাষ্ট্রীয় রিটের নামে সমস্ত সরকারী সংস্থা এই আওয়াজকে বন্ধের জন্য এগিয়ে আসে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তার সাংবিধানিক ধারা-উপধারা

এই সিস্টেমের লাগাম নিজের হাতে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কঠোর মূলনীতি চালু করার পরিবর্তে বিভিন্ন ধারা তৈরি করা হয়। এই ধারা ও শর্তকে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এতটাই মর্যাদাপূর্ণ করে দেওয়া হয়, যার ফলে সেই সমাজের মূল লক্ষ্যই হয়ে

যায় এই আইন বাস্তবায়ন করা। অতঃপর ইনসাফ বাস্তবায়ন, মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব আদায়ের মতো বিষয়গুলো এই আইনের মোকাবিলায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানে চলে যায়। যার ফলে মানুষ ধারা-উপধারার ঘূর্ণিপাকে কঠিনভাবে আটকে যায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকড়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার নাম। গণতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদের জন্য প্রশাসনিক সাহায্যের ব্যবস্থা সহজ হয়ে যায়, যা তার স্বার্থ রক্ষা করবে। পুঁজিবাদের মধ্যে যেহেতু হিউম্যানের পারস্পরিক সম্পর্ককে ঠিক করার জন্য কোনো নীতি নেই, তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এভাবেই মধ্যযুগের অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো, যা পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে এবং মানবাধিকার আন্দোলন, যা গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, এগুলো রাষ্ট্রীয় স্তরে এসে একে অপরের সাথে একীভূত হয়ে যায়। ফরাসি বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের মৌলিক কাজ হচ্ছে, পুঁজিবাদকে রক্ষা করা ও আয়-ব্যয়কে সহজ করে দেওয়া।

গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছাকে 'সাধারণ ইচ্ছা'র অনুগত করায়। যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা মানুষের উন্নতি কামনা করে এবং তা পুঁজি ব্যতীত সম্ভব নয়, তাই গণতন্ত্র সাধারণ ইচ্ছার নামে পুরো সমাজকে পুঁজি বৃদ্ধিতে লিপ্ত করে দেয়। আর যারা এই লক্ষ্য থেকে ছুটে যায়, গণতন্ত্র তাদের পেছনে 'সাধারণ ইচ্ছা'র দোহাই দিয়ে লেগে যায়। হয়তো তাকে সকলের ইচ্ছার অনুগত হতে বাধ্য করে অথবা সমাজ থেকেই তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়; যার ফলে তার কোনো আশ্রয়ের জায়গা বাকি থাকে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করানো

যেমনটা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে, গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রে এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা, যেখানে শিক্ষা লাভের পর পুরুষ-নারী মানুষ হওয়ার পরিবর্তে পেশাদার হিউম্যানে পরিণত হবে এবং পেশাদার সমাজকে সেবা দেবে। তবে প্রত্যেক পেশাদারদের মধ্যেই (Entrepreneurship) উদ্যোক্তা হওয়ার গুণ থাকা আবশ্যক। উদ্যোক্তা হওয়ার অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পেশাদার অধিক পুঁজির জন্য নতুন নতুন ব্যবসার পদ্ধতি ও পথ খুঁজে বের করবে এবং এর জন্য রিস্ক (ঝুঁকি) নেবে। যে সমস্ত হিউম্যানের মধ্যে এই সক্ষমতা না থাকবে, সে এই সিস্টেমের মধ্যে অনেক পিছিয়ে যাবে।

রাষ্ট্রকে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে মিলিত করা

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এবং এই ধারাবাহিকতাতেই নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তাদের মূল দায়িত্ব, প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ দেশে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে এবং এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করবে।

প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, আধুনিক অর্থনৈতিক বাজার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, শেয়ার বাজার এবং কারেন্সির ওপেন মার্কেট থাকবে। অতঃপর সমস্ত বাধা দূর করে এমন নীতি প্রণয়ন করবে, যা অর্থনীতির গতিকে অনেক বৃদ্ধি করবে। অতঃপর ব্যক্তি মালিকানাধীন (প্রাইভেটাইজেশন) করার কাজ শুরু করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হবে। কৃষক ও শ্রমিকদেরকে দেওয়া সহায়তা ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ওপর কৃষি ও শিল্প ট্যাক্স বসিয়ে দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে IMF ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্য নেওয়া হবে। অতঃপর এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে, যা নারী-পুরুষ সবাইকে পেশাদার করে গড়ে তুলবে। এভাবেই ব্যক্তি, সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে এমন জালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুগত করে দেওয়া হবে; যাতে এই রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে এর থেকে বের হওয়ার চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : আন্তর্জাতিক স্তর

ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যকে বৈশ্বিক ব্যবস্থার অনুগত করা (বিশ্বায়ন)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজকে নিজের অনুগত করার পর সেই রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে জাতিসংঘ, IMF ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের মতো সংস্থাগুলোর অনুগত বানিয়ে নেয়। ইংরেজিতে এই কাজের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এটি একটি বাস্তবতা যে, অতীতকাল থেকেই মানুষ আন্তর্জাতিক স্তরে সম্পর্ক রাখত; চাই তা ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক হোক অথবা যুদ্ধ বা ব্যবসার। মক্কার কুরাইশের বাণিজ্য, ইসলামের দাওয়াহ ও সাহাবিদের বৈশ্বিক বিজয়গুলো এর সাক্ষী। শুধু মুসলিমরাই নয়; বরং দুনিয়ার সমস্ত জাতি যেকোনোভাবেই হোক বৈশ্বিক সম্পর্ক রাখত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্বের সমাজগুলোর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আর পশ্চিমাদের গ্লোবালাইজেশনের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী?

অতীত সমাজে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো স্বভাবজাত কর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো। যেখানে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে চিন্তা ও জ্ঞান আদান-প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যের ধারা জারি থাকত। মৌলিকভাবে প্রত্যেক দেশ ও জাতির লক্ষ্য নিজের অর্থনীতির দিকেই থাকত। যেসব আসবাবপত্র তাদের কাছে না থাকত, তা অপর জাতি থেকে ক্রয় করে নিত। তেমনিভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্র পণ্য উৎপাদনে স্বাধীন ও সামাজিকভাবে নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বশীল ছিল। কিন্তু নতুন পশ্চিমা গ্লোবালাইজেশনে রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে সবাইকে পরস্পরের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেওয়া হয়। মুখাপেক্ষী বানানোর জন্য দুটি মাধ্যম গ্রহণ করা হয়, একটি পুঁজি ও অপরটি উৎপাদন। অর্থাৎ এক দেশ অপর দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাদের মুখাপেক্ষী করে ফেলবে অথবা এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেওয়া হবে।

এই কাজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা WTO-এর মাধ্যমে করা হয়। সমস্ত রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমোদনের জন্য এই সংস্থার সদস্য হতে বাধ্য করা হয়। আর এভাবেই অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সদস্য হওয়ার পর এই সংস্থার নীতিগুলো মেনে নেয়। যার মধ্যে একটি নীতিকে ট্রিপ বলা হয়। সেই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের ওপর আবশ্যক যে, তারা নিজের কৃষি ও শিল্প পণ্যকে রেজিস্টার্ড করিয়ে নেবে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক বাজারে তারা তা বিক্রয় করতে পারবে না। অতঃপর যদি কোনো দেশ বা কোম্পানি কোনো পণ্যের রেজিস্টেশনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হয়ে যায়, তাহলে বাকি অন্য কোনো দেশ এই পণ্য তৈরি করতে পারবে না। যার ফলে অন্যান্য সকল দেশ সেই বিশেষ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দেশের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বাংলাদেশ বাসমতি চাউলের কোনো একটি প্রকার রেজিস্টেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো দেশ এই চাউল উৎপাদন করতে পারবে না এবং সবাই এই চাউলের জন্য বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য থাকবে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের যদি বড় কোনো কাজের জন্য পণ্য দরকার হয়, যা তারা ব্যবসার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবে না, তখন তারা আবশ্যিকভাবে অপর দেশের ঋণের অপেক্ষা করবে। মোটকথা, যেহেতু স্বাভাবিকভাবে এই রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক ইজারাদারির ফলে বাণিজ্য থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না, তাই আবশ্যিকভাবে তাদেরকে অপর রাষ্ট্রের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এটাই বর্তমান আন্তর্জাতিক গ্লোবালাইজেশন, যার দ্বারা ইহুদিদের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

এটি একদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেয় এবং অপরদিকে প্রত্যেক দেশ ও জাতিকে জাতিসংঘের নীতির অনুগত হতে বাধ্য করে। যদি কোনো প্রশাসন তা মান্য করতে অস্বীকার করে, তখন তাকে জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত আন্তর্জাতিক আদালতে জবাবদিহি করতে হয়। এ ছাড়াও শান্তিবিষয়ক কাউন্সিলের মাধ্যমে পশ্চিমারা যেকোনো দেশের ওপর হামলা করতে পারে, যারা তাদের দাজ্জালি হুকুমতের অনুগত হতে অস্বীকার করে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে ক্রুসেড-জায়োনিস্ট শাসনব্যবস্থা

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ফরাসি বিপ্লব থেকে নিয়ে ২০১০ সাল পর্যন্ত ২২১ বছরের মধ্যে কয়েকটি ধাপ পাড়ি দিয়ে আজ আমাদের সামনে তার বর্তমান রূপে উপস্থিত। এই ব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয় ধর্ম ও বাদশাহি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই ব্যবস্থা হচ্ছে 'মানবধর্ম'—যা আল্লাহ তাআলা থেকে কোনো প্রতিদানের আশা ব্যতীত মানবতার সেবা করার দাবিদার। তবে এই ধর্মের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার প্রতিদানের আশা রাখুক বা না রাখুক, সবাইকে এমন সিস্টেমের অধীনে নিয়ে আসা; যাতে দুই দলের কাজ এক প্লাটফর্মে একত্রিত হয়ে যায়। এখন যদি কেউ আল্লাহ তাআলা, দ্বীন, নবি ও ওহির সাথে বিদ্রোহ করতে চায়, তাহলে সে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করে এই ব্যবস্থার অধীনে উল্লেখিত সবই করতে পারবে। আর যদি কেউ জান্নাতে যেতে চায়, তাহলে সেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেন্টে মানুষের বানানো আইন ও বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির সুদি ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে সবই করতে পারবে (নাউজুবিল্লাহ)।

সমস্ত মানবজাতিকে এক ছাতার নিচে একত্রিত করার পর এবং ব্যক্তি, বংশ, সমাজ, উম্মাহ ও খিলাফতের শক্তি ধ্বংসের পর এখন ইহুদিদের চেষ্টা হচ্ছে, তারা নিজেদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাবে। তাদের ক্রুসেডার সাহায্যকারীরাও এই মিশনে তাদের সাথেই রয়েছে। এই ক্রুসেড-জায়োনিস্ট জোট খুব ভালোভাবেই জানে যে, এমন বৈশ্বিক ক্ষমতা তাদের পূর্বে কখনো অর্জিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা তাদের সমস্ত লক্ষ্য এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মাধ্যমেই অর্জন করতে চাচ্ছে। সুতরাং যদিও বাহ্যিকভাবে এটাকে ধর্মহীন সেক্যুলার ব্যবস্থার মতো মনে হয়; কিন্তু যখন ইসলামের প্রতি শত্রুতা সামনে আসে, তখন এর পেছনে সেই ক্রুসেডার যোদ্ধাদের ঘৃণা ও ইহুদিদের হিংসা দৃষ্টিগোচর হয়।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কি শেষ জমানার হাদিসে বর্ণিত ফিতনার অংশ?

বর্তমানে ইরতিদাদি (আদর্শিকভাবে দ্বীন ত্যাগ করার) ফিতনার ভয়াবহতা দেখে যেকোনো মুসলিম এই প্রশ্ন করতে পারে যে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কি সেই ফিতনা, যার আলোচনা শেষ জমানার হাদিসের মধ্যে এসেছে? বর্তমানের পুরো উম্মাহর আলিমগণ এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। যার মধ্যে মিশর, সৌদি, পাকিস্তান, হিন্দুস্থানের অনেক আলিম অন্তর্ভুক্ত। যেমন হিজাজের শাইখ সাফার আল-হাওয়ালি, মিশরের শাইখ আবু জাহরা, পাকিস্তানের মুফতি আবু লুবাবা হিন্দুস্থানের ইসরার আলম-সহ প্রমুখরা। যারা এই চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক অবস্থানকে শেষ জমানার ফিতনা বলেছেন। তবে অনেক আলিম এই ফিতনাগুলোকে সেই

হাদিসগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না; কিন্তু তারা এমন মত পেশকারীদের বিরোধিতাও করেন না। তাদের মতের সারাংশ হচ্ছে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার শেষ জমানার ফিতনা হোক বা না হোক, এটি ইসলামের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত ভয়ানক ফিতনা।

কিতাব থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বাস্তবতা বোঝার দ্বারা কী কী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদের সামনে আসে, সেই বিষয়গুলোই আমরা এখানে ছোট ছোট পয়েন্টে আলোচনা করব। এবং এগুলোই এই কিতাবের আসল মূল অর্জন হবে।

- আমরা উম্মাহ হিসেবে আজ স্বাধীন নই এবং নিজেকে স্বাধীন মনে করার অর্থ নিজেদের ধোঁকা দেওয়া। মূলত আমরা ইহুদিদের অধীন ও আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার গোলাম এবং উম্মাহ হিসেবে এর খাঁচায় আবদ্ধ।
- বর্তমান বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক আদর্শ ও থিউরিগুলো পূর্ণরূপে ধর্মহীন এবং তা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং নবিদের শিক্ষার সাথে বিদ্রোহ করে।
- আজ আমাদের মোকাবিলা পূর্বের জমানার মতো সাধারণ খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সাথে নয়; বরং আমরা আজ খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের এক চূড়ান্ত বিকৃত রূপের মোকাবিলা করছি। যারা ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতায় মিশ্রিত এক সেক্যুলার ব্যবস্থার অধীনে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে।
- গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, হিউম্যানিজম, মানবাধিকার, সেক্যুলারিজমের সাথে আমাদের দ্বীন ও ইতিহাসের বিন্দু পরিমাণ সম্পর্ক নেই। এগুলো পশ্চিমাদের অন্ধকার যুগের অভ্যন্তরীণ লড়াই এবং মানুষের বানানো খ্রিষ্টবাদ ও বুদ্ধিপূজার পারস্পরিক যুদ্ধের ফলে তৈরি হয়েছে। এই চিন্তাগুলো এতটাই নিকৃষ্ট কুফর ও শিরক যে, এগুলোকে ইসলামের সাথে যুক্ত করা অথবা এগুলোকে ইসলামিকরণের চেষ্টাকারীদের ব্যাপারে অবাক হওয়া ও আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার নেই।
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তার দখলদারিত্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ব্যক্তি, বংশ, সমাজ, রাষ্ট্রসহ প্রত্যেক স্তরেই নিজের শিকড়কে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই দখলদারিত্বকে শুধু তারগিব ও তাবলিগের মাধ্যমে পতন ঘটানোর কল্পনা করা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতার ফল।
- এই ব্যবস্থাকে বোঝার পর শরয়ি ও বুদ্ধিবৃত্তিক কোনোভাবেই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, এই উম্মাহর একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসা এবং একমাত্র মুক্তির পথ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বাস্তবায়ন করা। এটা

ব্যতীত এই উম্মাহ যেই রাস্তাই গ্রহণ করবে, তাতে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। কেননা, ইতিহাস আমাদের চিৎকার করে বলছে, এই উম্মাহর সমস্যা ও পতনের শুরু তখনই হয়েছে, যখন তারা দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছে।

- এই ব্যবস্থাকে বোঝার পর এই বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, এই ব্যবস্থার প্রণীত সীমা ও শিকলের ভেতর থেকে, তাদের শেখানো পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাদের নীতিমালা ও সংবিধান মান্য করে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার আদর্শ শরয়ি ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভুল। এটা হচ্ছে দ্বীনের বিধান পালনের জন্য মদ্যশালা বানানোর মতো, যেখানে সব ধরনের অশ্লীলতা ও বদদ্বীনি চলছে এবং শরাব পান করা হচ্ছে। সেটাকে ধ্বংসের পরিবর্তে এই অবস্থাতেই সেখানে প্রবেশ করে তার সব নোংরামি থেকে পবিত্র হয়ে সালাত আদায়ের চেষ্টা করা এবং এটাকেই মুসলিমদের মিরাজ ও দ্বীনের আসল চাহিদা ঘোষণা করা। মুসলিম অঞ্চলগুলোর ওপর অধিকৃত এই ব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এর সম্পূর্ণ ধ্বংসের মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে এবং এটাই আমাদের দ্বীনের তাকাজা।
- এই ব্যবস্থাকে বোঝার পর শরয়ি ও আকলি—কোনোভাবেই এই বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, সামরিক শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই নিকৃষ্ট ব্যবস্থাকে ধ্বংস ও এর পরিচালনাকারী অসৎ ব্যক্তিদের শক্তি নিঃশেষ করা দাওয়াহ এবং জিহাদ ব্যতীত অসম্ভব। অবশ্যই দ্বীনের সমস্ত বিধানের ওপর আমল করা এবং সমস্ত হুকুমকে তার অবস্থান অনুযায়ী গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু এমন যেকোনো আন্দোলন, যারা আজ উম্মাহকে কুফুরির গোলামি থেকে বের করার সংকল্প করেছে, তাদের জন্য এটা বোঝা জরুরি যে, সর্বশেষ লোহাই লোহাকে কাটে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য জিহাদ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।
- এই ব্যবস্থাকে বোঝার দ্বারা এই কথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, উম্মাহর আসল রক্ষক সেসব মুমিনরাই, যারা আজ পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধে লিপ্ত। যারা আজ প্রতিটি জায়গায় তাদের স্বার্থের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং তাদেরকে নাস্তানাবুদ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- এই ব্যবস্থাকে বোঝার ফলে এই কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে :
    - জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি উজ্জীবিত করা।
    - মানুষের বুদ্ধি ও জনগণকে বিধানদাতা বিশ্বাস না করে আল্লাহ তাআলার হাকিমিয়্যাতের আকিদাকে ব্যাপক করে দেওয়া।
    - গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে শুরায়ি খিলাফতের দিকে এগিয়ে যাওয়া।
    - মানুষকে হিউম্যান বানানোর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার বান্দা বানানো।
    - পশ্চিমা ও গ্রিক দর্শনের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে নবিদের পরিপূর্ণ আনুগত্যের

দিকে দাওয়াত দেওয়া।

- পুঁজি, লাভ ও লোভের মধ্যে বৃদ্ধির পরিবর্তে সৎ কাজ, প্রতিদান ও সাওয়াব বৃদ্ধিকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া।
- দেশ বা স্বার্থের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়ালা-বারার আকিদার শিক্ষাকে গ্রহণ করে নেওয়া।
- সিভিল সোসাইটির পরিবর্তে ইসলামের দেওয়া মুসলিম ব্যক্তি, মুসলিম বংশ ও বাস্তব ইসলামি সমাজ গড়ে তোলা।
- সমাজকে থানা-কাছারি ও গণতান্ত্রিক দলের রূপে সংঘবদ্ধ করার পরিবর্তে মসজিদ, মাদরাসা, দারুল ইফতা ও সত্যপন্থী আলিমদের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।
- অধিকৃত মুসলিম অঞ্চলগুলোর ওপর খ্রিষ্টান-ইহুদি জোটের দখলকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এগুলোই সেই মৌলিক বিষয় যেগুলোর ওপর উম্মাহকে উঠিয়ে আনা, সম্পৃক্ত করা, দাওয়াত দেওয়া, বাস্তবে নিজেদের চেষ্টার মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া আজকের প্রত্যেক আলিম, দায়ি, খতিব, লেখক, সাহিত্যিক, দ্বীনি আন্দোলন ও মুসলিম সমাজের সমস্ত সদস্য, যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ব্যক্তির জিম্মাদারি।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং একে দ্বীনের পথে উজ্জীবিত করা এবং উম্মাহর মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের লক্ষ্যের ব্যাপারে গভীর ও দৃঢ় বুঝ তৈরির মাধ্যম বানান, আমিন।